পরিচয়

অনেক কোন উপন্যাস বাহির হইলে কিম্বা প্রমোদশালায় নাট্য-রূপ পরিগ্রহ করিলে একশ্রেণীর পাঠককে তাহাদের শিকড় ধরিয়া টানাটানি করিতে দেখা যায়। সোৎসাহে তাঁহারা নির্ণয় করিতে প্রয়াস পান যে, গ্রন্থখানি সত্যই মৌলিক কিম্বা বৈদেশিক গ্রন্থ হইতে উপাদান সন্তর্পণে আহরণ করিয়া অজ্ঞ পাঠকমহলে মৌলিক বলিয়া চালাইবার অপচেষ্টা হইয়াছে। ব্যাপারটি একদিক দিয়া যেমন লজ্জা ও বিরক্তিকর, নীতির দিক দিয়া এই শ্রেণীর উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু শিক্ষিত পাঠকদের উদ্যমও তদ্রূপ প্রশংসার্হ। সাহিত্য-রসিক-সমাজ এজন্য ইঁহাদিগকে সাহিত্যের ব্যাপারে 'কষ্টি-পাথর' বলিয়া যদি অভিহিত করেন, বোধ হয় অশোভন হইবে না।

প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় এই উপন্যাসখানির প্রকৃতির উল্লেখ থাকিলেও প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হইতেছে যে, কোন বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকায় ইহার অংশ-বিশেষ গল্পাকারে প্রকাশিত হইবার পর কোন বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক পত্রের রবিবাসর-সংখ্যায় ইহা অনুকৃত হইয়া Wee meet to quit নামে বাহির হয়। কিন্তু প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা এপক্ষ হইতে আপত্তি উঠিলে সম্পাদক মহাশয় দুঃখপ্রকাশ করিয়া ব্যাপারটি চাপা দেন। পরে কোন চিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ গল্পটিকে তাঁহাদের প্রয়োজনানুরূপ আকারে সাজাইয়া দিবার অনুরোধ করিলেও তাহাকে নিজ পরিকল্পনানুযায়ী একখানি সুবৃহৎ উপন্যাসে পরিণত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারি নাই। ঘটনাক্রমে আমার অনুজ 'ফাইন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস'এর পরিচালক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস'এর পরিচালক প্রিয়বর শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাসের উৎসাহ ও সময়োপযোগী ব্যবস্থায় সেই পরিকল্পনাটি এতদিনে সার্থক হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে,—এজন্য উভয়কেই আশীর্ব্বাদ করিতেছি। ইতি, আশ্বিন, দেবীপক্ষ; ১৩৫০ সাল।

নাট্য-মন্দির
বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সমর্পণ

রবীন্দ্রনাথ যাঁহাকে ভাষাতত্ত্বের ব্যাপারে

'বাদশা' বলিতেন

বাঙ্গলার সেই শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ্

সুসাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

করকমলে

গুণমুগ্ধ গ্রন্থকারের

শ্রদ্ধা-উপহার

অপরিচিতা

(১)
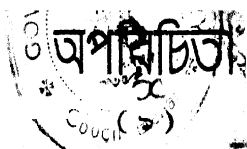
প্রয়াগ তীর্থে ত্রিবেণীর সুবিস্তীর্ণ বেলাভূমি ব্যাপিয়া বহু বাঞ্ছিত মহাকুম্ভের বিরাট মেলা বসিয়াছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি ধর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া যে সকল মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহাদের মধ্যে মাসাধিক-কাল স্থায়ী ভারতের কুম্ভ-মেলাই যে সর্ব্বাগ্রে প্রাধান্য পাইবার যোগ্য, বিদেশী পরিব্রাজকরাও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নানাদিক দিয়া মেলাটির বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যও অসাধারণ।

প্রায় ছয় ক্রোশ ব্যাপী বালুকাময় বেলাভূমি যেন কোন অদ্ভুত মায়াবীর যাদুদণ্ডপরশে বিশ্বমানবের এক মহামিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ীদের অসংখ্য বিপণি, যাবতীয় উপাসক সম্প্রদায় তথা গুহাবাসী ও আশ্রমিক সন্ন্যাসীদের আড়ম্বরপূর্ণ সমাবেশ, ভারতীয় ধর্ম্মার্থী ও বিদেশীয় কৌতূহলী পর্য্যটকবৃন্দের সমন্বয় একান্ত বিস্ময়াবহ ও চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাদের অন্তরালে বিভিন্ন প্রকৃতির প্রতিভাশালী সুবিধাবাদীদের প্রাদুর্ভাব এবং তাঁহাদের গতিবিধি ও কার্য্য-পদ্ধতির বৈচিত্র্য পঁচিশ লক্ষ লোকের মহামিলনী-বক্ষে চাঞ্চল্যের যে শিহরণ তুলিয়া থাকে তাহাও রীতিমত রোমাঞ্চকর। গতানুগতিক প্রথায় কর্ত্তৃপক্ষ যদিও ইহাদের সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণকে সতর্ক হইবার নির্দ্দেশ দিতে অবহেলা করেন না, কিন্তু ইহারাও ততোধিক সতর্কতার সহিত নবতম পরিকল্পনায় এমন কৌশলে কাজ

ওছাইয়া থাকে যে কর্তৃপক্ষকেও অবাক হইতে হয়। তজ্জন্য বর্তমান মেলার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে হইয়াছে এবং সন্দেহভাজনদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য কতিপয় যোগ্যতাসম্পন্ন বিচক্ষণ গোয়েন্দাকে মেলাস্থানে পাঠাইয়াছেন।

কুম্ভমেলায় সাধু সমাবেশই সর্ব্বাধিক বিস্ময়কর ব্যাপার। মেলা যে অংশে সাধুদের পটমণ্ডপ পড়িয়াছে, জনসাধারণের সশ্রদ্ধ দৃ সর্ব্বাগ্রে সেই দিকেই নিবদ্ধ হইয়া থাকে। বিচিত্র বর্ণের ধ্বজাপতাকায় সজ্জিত ও বিভিন্ন পরিভাষার দ্বারা চিহ্নিত মণ্ডপগুলির রূপশ্রী জনসাধারণকে চমৎকৃত করে। তাহারা স্থির করিতে পারে না যে বাহিরেই যেখানে এত আড়ম্বর, ভিতরে আরও কি অধিকতর ঐশ্বর্য্যের উৎস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে! অমনি অতীতযুগের তপোবনবাসী সাধুদের নৃপতিলাঞ্ছিত বিভূতির কাহিনী তাহাদের স্মৃতিপথে ছবির মত ফুটি উঠে, কাজেই সাধু দর্শনের আগ্রহ প্রত্যেককে অতিষ্ঠ করি তোলে।

কিন্তু এই সুবিস্তীর্ণ সাধু স্থানের প্রত্যন্ত অংশে ত্রিবেণী যেখানে বিপুল বালুর চাপে অপেক্ষাকৃত কৃশকায়া তথায় পুরাকালের এক জরা-জীর্ণ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষের মধ্যে সাধুস্থানের শেষ আশ্রমটি যেন আবর্জ্জনার মতই বিশ্রী ও বিসদৃশরূপে দর্শক চক্ষুতে পীড়া দিতেছে। হয়ত এই পীড়াদায়ক বাড়ীখানিই এককালে চক্ষু-চমৎকারী হইয়া শোভার সঞ্চার করিত; কিন্তু কালের কঠোর আঘাতে ইহার উর্দ্ধাংশ বিধ্বস্ত হওয়ায় অবশিষ্ট অংশটি যেন এক বিরাট কবন্ধের মত দুই বাহু মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর জীর্ণ দেউড়ীর দুই ধারে দুই প্রথিত বংশখণ্ড অবলম্বনে গৈরিকবর্ণের একটুকরা কাপড় সুরঞ্জিত তুলা

অক্ষরে সজ্জিত হইয়া সাধু-সংস্থানটির নাম ঘোষণা করিতেছে—
আনন্দস্বামীর সিদ্ধাশ্রম ; শ্রীবৃন্দাবনধাম।

অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন এবং এই ভীতিপ্রদস্থানে যদিও আশ্রমটির পটমণ্ডপ উঠিয়াছে, কিন্তু ভিতরে আশ্রমোচিত অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নাই, বরং আধুনিক যুগের যে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমের উপযুক্ত নিয়মকানুনগুলি এমনই সুষ্ঠুভাবে চালু আছে যে, আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং আশ্রমটির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কটাক্ষ করিবার কোন উপলক্ষই দেখা যায় না। যত বড় বিচক্ষণ পরিদর্শকই হউন না কেন, আশ্রমের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশস্তির সহিত সাধ্যমত সহায়তার প্রতিশ্রুতি না দিয়া তাঁহার নিষ্কৃতির উপায় থাকে না। অধিকন্তু সৌম্যমূর্ত্তি মিষ্টভাষী আশ্রম স্বামীর সংস্পর্শে একবার আসিলে অতিবড় কঠোর প্রকৃতি তার্কিকের অন্তর পর্য্যন্ত বিগলিত না হইয়া পারে না, এমনই অদ্ভুত ক্ষমতা এই আশ্রমটির পরিচালক শ্রীমৎ আনন্দস্বামীর।

সিদ্ধাশ্রমটির বিধি ব্যবস্থা বাঁধা-ধরা নিয়মাধীন হইলেও কার্য্য-পদ্ধতির ধারা কিন্তু স্বতন্ত্র। অন্যান্য সাধু সম্প্রদায়ের মত এই সিদ্ধাশ্রমের সাধুদিগকে আড়ম্বরপূর্ণ মিছিল করিয়া বাহির হইতে দেখা যায় নাই, এই সাধুস্থানটির হাতায় হাতী ঘোড়া উট বা চতুর্দ্দোলার বাহার লোক চক্ষুকে মুগ্ধ করে না, কতিপয় বলিবর্দ্দ এবং কানাৎ-ঘেরা কয়েকখানি অতিকায় গো-যান আশ্রম-স্বামীর প্রাচীন পন্থানুসরণের নিদর্শনরূপে আশ্রমের একাংশে বিরাজ করিয়া থাকে। আশ্রমটির উদ্দেশ্য হইতেছে—আশ্রমিকগণকে সকল বিষয়ে বিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও সিদ্ধ করিয়া তোলা। কিন্তু ইহার সাধনা খুবই কঠোর। মানব মনের যত কিছু সুকোমলবৃত্তি এবং মানব সমাজের যাহা কিছু প্রচলিত মতবাদ

প্রত্যেকটির সহিত সুপরিচিত ও প্রতি বিষয়ে শিক্ষিতপটু হইয়াও তাহাকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকিতে হইবে। পক্ষান্তরে, ঐ সকল সুকোমলবৃত্তি এবং প্রচলিত মতবাদ যে নিরর্থক—সুবিধাবাদীদের হাতের পাঁচ মাত্র, প্রয়োগ-কৌশলসহ তাহাতেও অভিজ্ঞ হওয়া চাই। আধ্যাত্মিক সুখের সমস্ত কাহিনী শুনিয়া এবং গভীরভাবে সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়াও চিত্তকে তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে এই ধারণাই দৃঢ় রাখা চাই যে, সুবিধাবাদীরাই আধ্যাত্মিক সুখের গল্প রচনা করিয়া আধ্যাত্মিকতার নামে দুনিয়ার নরনারীর অন্তরে বিষ ছড়াইতেছে। গুণ ও দোষ, পাপ ও পুণ্য—ইহাদের প্রকৃতি নির্ণয় করিবার মত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। গুণ বলিতে আধ্যাত্মিক মাপ-কাটিতে মাপা কতকগুলি কোমল বৃত্তি নয়—সব কিছু দুর্ব্বলতাকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতাই হইতেছে গুণ, পাপ-পুণ্যের উর্দ্ধে হইবে তাহার স্থান। যত কিছু দুর্ব্বলতাই হইতেছে পাপ, আর শক্তির আরাধনাই সত্যকার পুণ্য। স্বামীজির অভিপ্রেত 'সর্ব্বসিদ্ধ' দলকে এই সকল ব্যাপারে অভিজ্ঞ এবং কঠোর সাধনাগুলিতে সিদ্ধ হইতে হইবে। কিন্তু স্বামীজির একাগ্রতা ও তৎপরতা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত দল ত দূরের কথা—এমন একটি লোকও উল্লিখিত সাধনা বা পরীক্ষা-গুলিতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই যাহাকে তিনি 'সর্ব্বসিদ্ধ' বলিয়া 'সার্টিফিকেট' দিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীজি হাল ছাড়িয়া দেন নাই বা 'হাতের পাঁচ' ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার এই বিচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক খেলাটিকে ভাঙ্গিয়া দিবার দুর্ব্বলতাও প্রকাশ করেন নাই, বরং অকৃতকার্য্য শিষ্যদিগকে পরবর্ত্তী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার নির্দ্দেশ দেন। যাহারা বহুদিন ধরিয়া পুনঃপুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়া

আসিয়াছে, তাহাদিগকেও অপদার্থ বলিয়া বিদায় দেওয়া হয় নাই। এ সম্বন্ধে স্বামীজির সিদ্ধান্ত এই যে, চলার পথে অল্প লোকই আছাড় না খাইয়া বা পা-পিছলাইয়া না পড়িয়া সরাসরি নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানটিতে গিয়া পঁহুছাইতে পারে। কিন্তু যাহারা ক্রমাগতই হোঁচট খায়, বা পা-পিছলাইয়া পড়ে, তাহারা যদি নিরুৎসাহ না হইয়া লক্ষ্য স্থির রাখে—একদিন তাহারা বুড়ি ছুঁইবেই, আর উঠা-পড়া দুটি ব্যাপারের অভিজ্ঞতা তাহাদিগকে আরও পাকাপোক্ত করিয়া তুলিবে। শিষ্যদের অকৃতকার্য্যতা স্বামীজীকে ক্রমশঃই ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিলেও একেবারে নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই। নিজের অন্তরকে নিজেই আশ্বাস দিতেন—আছে, সে আছে; এদের মধ্যেই আছে—এদের মাঝখান থেকেই সে বেরুবে।

কিন্তু ঠিক এই সময়ই আশ্রমবাসী শিষ্যগণ একযোগে আশ্রম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় স্বামীজীর সংস্কার-শুষ্ক অন্তরটি মথিত করিয়া সর্ব্বপ্রথম নৈরাশ্যের স্বর সশব্দে বাহির হয়—হবে না, এরা সব অপদার্থের দল; আমি যাকে চাই, খুঁজছি—এদের মাঝখান থেকে সে বেরুবে না, তাকে খুঁজে বা'র করতে হবে। তার জন্য চাই নূতন স্থান, ভিন্ন আয়োজন।

কর্ম্ম-সচীব লালাজীর যুক্তি এই সময় স্বামীজীর চিত্তস্পর্শ করে এবং তদনুসারে সিদ্ধাশ্রম কাশীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে স্থানান্তরিত হয়। সিদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠার মূলে আগ্রাবাসী লালা লছমন দাসজীর সংশ্রবও নিবিড় হইয়া আছে। কতকটা এক যোগেই উভয়ে এই পথটি বাছিয়া লন। তবে বয়ঃক্রম বিদ্যা ও বিজ্ঞতার উৎকর্ষে স্বামীজিকেই আশ্রম-গুরুর পদ গ্রহণ করিতে হয় আর লালা লছমন দাস স্বামীজীর নির্দ্দেশ

মতই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং নূতন কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে সময়োপযোগী যুক্তিও দিয়া থাকেন। লালা লছমন দাসের যুক্তি অনুসারেই শ্রীবৃন্দাবন হইতে মহামেলায় সিদ্ধাশ্রমের অধিষ্ঠান হইয়াছে এবং সমাগত নানাদেশীয় বিভিন্ন বয়সের পঁচিশ লক্ষ নরনারীর ভিতর হইতে সিদ্ধাশ্রমের উপযুক্ত নব নব তরুণ শক্তি বাছিয়া লইবার আয়োজন চলিয়াছে। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে স্বামীজীর অন্তরভেদী দৃষ্টি, আর লালাজীর অপরাজেয় কূটবুদ্ধি।

(২)

পুরাকালের জীর্ণ বাড়ীখানিকে আশ্রমোপযোগী করিয়া সাজাইয়া লওয়া হইয়াছে। বাড়ীর মধ্যে এমন একখানি ঘর পাওয়া গিয়াছে যেখানে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাটুকুই আছে, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ করিলে বহির্জগতের সহিত কোন সম্বন্ধই তাহার থাকে না। সম্ভবতঃ গ্রীষ্মকালে অন্তঃপুরিকারাই ঘরখানি ব্যবহার করিতেন। বর্ত্তমানে তাহা লালাজীর খুব কাজে লাগিয়া গিয়াছে। সিদ্ধাশ্রমের জন্য সংগৃহীত শক্তির নব নব কণিকাগুলি এই রহস্যময় গৃহেই সংগোপনে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। এ-ব্যাপারে লালাজীর উপর স্বামীজী নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সমর্পণ করায় তিনি যে-সকল পন্থা ও পান্থের সাহায্য লইয়াছেন, সিদ্ধাশ্রমের বিধিতে সেগুলি বলিষ্ঠ ও সিদ্ধ হইলেও আইনের দৃষ্টিতে বৈধ বা নির্দ্দোষ নহে। সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি

রাখিয়া স্বর্ব্বসিদ্ধ শক্তি-সঙ্ঘের গঠন-ব্যাপারে লালাজী ও স্বামীজী উভয়কেই অতিরিক্ত সতর্ক এবং সচেতন থাকিতে হয়।

গুপ্ত গৃহটির আকৃতি অনেকটা গুহার মত, দেওয়ালগুলি পাথরে নির্ম্মিত, কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ। মেঝের উপর আগাগোড়া একখানি পুরু সতরঞ্চি বিছানো। বিভিন্ন বয়সের বারোটি মেয়ে তাহার উপর এলোমেলো ভাবে বসিয়া কাঁদিতেছে, প্রত্যেকের কান্নার ধারা আর কণ্ঠের ভাষার পার্থক্য এমন একটা দুর্ব্বোধ্য ঝঙ্কার তুলিয়াছে যাহা রোমাঞ্চকর। বারোটি মেয়ের মধ্যে অনুমান তিনটি পাঁচ ছয় বছরের, গুটি পাঁচেকের বয়স আটের মধ্যে, অবশিষ্ট চারিটি অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কা, তবে দশের সীমারেখা অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের মধ্যে খোঁট্টা আছে, নেপালী আছে, মাদ্রাজী আছে, গুজরাটি আছে, পাঞ্জাবী আছে। প্রত্যেকেই যে ভিন্ন প্রদেশ হইতে মেলা দেখিতে আসিয়াছে এবং অভিভাবকদের সঙ্গচ্যুত হইয়া সিদ্ধাশ্রমের ভাণ্ডার-জাত হইয়াছে, পরিজনদের উদ্দেশে তাহাদের আর্ত্তস্বরই তাহা ব্যক্ত করিতেছিল। মেয়েগুলির বয়সগত পার্থক্য থাকিলেও আকৃতিগত সামঞ্জস্য বিস্ময়াবহ। প্রত্যেকেই রূপসী, সুশ্রী ও দীর্ঘাঙ্গী।

লালা লছমন দাস শীষ দিতে দিতে রুদ্ধ ঘরখানির ভিতর পাইচারী করিতেছিলেন। রোরুদ্যমানা বালিকাদের আর্ত্তস্বরের তালে তালে তাঁহার এ ভাবে শীষ দেওয়াটা ব্যঙ্গের মতই দৃষ্টিকটু ও বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। কিন্তু লালাজীর সে দিকে লক্ষ্যই ছিল না। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি নবলব্ধ রত্নগুলির কমনীয় আকৃতি ও মনোরম সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য ক্ষমতা যাচাই করিয়া মনে মনে নিয়োযিত সেবকদের নির্ব্বাচন

শক্তির প্রশংসা করিতেছিলেন। চেহারা দেখিয়া লালা লছমন দাসকে চিনিতে হইলে মানুষ-চেনা-ব্যাপারে পাকা জহুরীদেরও ভুল হইবার সম্ভাবনা। কেননা, চেহারা দেখিয়া লালাজীর প্রকৃত বয়স কত তাহা ধরিবার উপায় নাই; চেহারার মালিক যদি জোর দিয়া বলেন যে, বয়স তাঁহার চৌত্রিশ চলিতেছে—তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু থাকে না। বিশেষতঃ, যে কোন ভাষার আঁকা-বাঁকা টানা লেখা চশমার সাহায্য না লইয়া লালাজী যখন গড় গড় করিয়া পড়িয়া যান, তখন মানিতেই হইবে যে তাঁহার চোখে এখনো চালশে ধরে নাই, অতএব চল্লিশের কোঠায় তিনি পড়েন নাই নিশ্চয়ই। ইহার উপর শ্মশ্রুগুম্ফ-হীন পুরন্ত মুখশ্রী এবং সেই মুখে একটা শিশু সুলভ সারল্য, বড় বড় দুটি স্বপ্নাতুর চোখ, ঘাড় পর্য্যন্ত লতানো ও ঈষৎ কোঁকড়ানো দীর্ঘ চুলের ছটা দেখিলে তাঁহাকে কবি প্রকৃতির মানুষ বলিয়া মনে হয় এবং বয়স তাঁহার যাহাই হউক না কেন, কবি-সুলভ তারুণ্য যে দেহ ও মনকে এখনো কাঁচা রাখিয়াছে—পাকিতে দেয় নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। সুশ্রী অঙ্গসজ্জাও এ বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করিয়া থাকে। যোগিয়া রঙের রেশমী ধুতি, পিরাণ ও চাদরের বর্ণ এবং শ্রেণীগত সমতা—বৈরাগী-বাঞ্ছিত গেরুয়ার অভিনব সংস্করণরূপে চোখে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয়। অবশ্য সিদ্ধাশ্রমের সাধকদের ইহাই সুনির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ। এই শুদ্ধ ও সুশ্রী পরিচ্ছদে দেহসজ্জা করিয়া লালাজী যখন নির্জ্জনে কূটবুদ্ধির চর্চ্চা করেন, তখন কিন্তু তাঁহার প্রকৃত রূপ ও বয়স সুস্পষ্ট হইয়া উঠে; এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন আয়নার উপর তাঁহার আলেখ্য পড়িতেই লালাজী একেবারে যেন মুসড়াইয়া পড়েন, নিজের মনেই বিড় বিড় করিয়া সেদিন তাঁহাকে বলিতে শোনা গিয়াছিল—

সর্ব্বনাশ ! বিশ বছরের গোঁজামিল লোকের চোখে ধরা পড়ল না, শেষে কি না আয়নার বুকেই ফুটে উঠল ! লালাজীর এই মর্ম্মবাণীই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া যেন জানাইয়া দিতেছে যে, চেহারা ও সাজসজ্জার চটকে বয়ঃক্রমকে তিনি কিরূপ রহস্যাবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

নানা ভাষায় দখল থাকায় নানাভাষী মানুষকে খুসি করিতেও লালাজীর ক্ষমতা অসাধারণ। মেয়েগুলি ত প্রথমে স্বামীজীকে দেখিয়া ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিয়াছিল। সিদ্ধাশ্রমের ভাবী সর্ব্বসিদ্ধ দলের কোরকগুলিকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতেই তিনি তাহাদের অন্তরদেশ তলাইয়া দেখিবার অভিপ্রায়ে যে দৃষ্টিতে তাকান এবং যে সুরে অট্টহাসির একটা ঝঙ্কার তুলেন, তাহাতেই মেয়েগুলির মূর্চ্ছা যাইবার মত অবস্থা হইয়াছিল। পরে লালাজী তাহাদিগকে এই কক্ষে আনিয়া এবং প্রয়োজন মত আশ্বাস দিয়া কতকটা শান্ত করিতে পারিয়াছেন। মেয়েগুলিও ক্রমশঃ এই সদাশয় প্রিয়দর্শন ও মিষ্টভাষী সাধুটিকে পরিজন হীন অপরিচিত স্থানে পরিচিতের মতই মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

নিরবচ্ছিন্ন রোদনে ইহাদের চোখগুলি আরক্ত হওয়ায় মুখের লাবণ্য যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। পাঁচ ছয় বছরের পাঞ্জাবী মেয়েটি গায়ের জরিদার ওড়নাখানির আঁচলে চোখ দুটি মুছিতে-ছিল। ফলে, চোখের পাতায় মাখানো সুর্ম্মার কালি তাহার সুন্দর মুখখানিতে লাগিয়া চাঁদের কলঙ্কের মত কয়েকটি কালো রেখা আঁকিয়া দিল। ওড়নাখানি নামাইতেই দৃশ্যটি লালাজীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। ফিক করিয়া হাসিয়া তিনি হিন্দীতে বলিলেন :—তোমার চোখের কালি মুখে লেগেছে খুকি, এগিয়ে এসো মুছিয়ে দিই।

মেয়েটি এতক্ষণ বসিয়াছিল, লালাজীর কথাগুলি [illegible] না বুঝিলেও 'কালি'র হিন্দী প্রতিশব্দ 'সেহাই' কথাটি শুনিয়াই সে আস্তে আস্তে উঠিল, কিন্তু লালাজীর কাছে না গিয়া পাঞ্জাবী ভাষায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল : —মাজী যাবো—আমার মা !

কথা কয়টি বলিয়াই সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল। লালাজীও পাঞ্জাবী ভাষায় কথাগুলি টানিয়া টানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : খুকী তোমার বাবা আছে ?

ঘাড় নাড়িয়া বালিকা জানাইল : আছে।

লালাজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন : কি কাজ তিনি করেন ?

বালিকা জানাইল : কারবার করেন, শাল বেচেন।

খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লালাজী বালিকার সম্বন্ধে এইটুকুই জানিলেন যে, তাহার বাবা শাল বিক্রী করিতে মেলায় আসেন। সঙ্গে তাহার মা, এক ভাই ও একটি বোন্ আসিয়াছে। বালিকাই সর্ব্ব কনিষ্ঠা। মায়ের জন্য, দাদা ও দিদির জন্য তাহার ভারি মন কেমন করিতেছে।

লালাজী তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন : তোমার বাবা এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন ; তোমার মা, দাদা, দিদি সবাই আসবেন।

নিজের ভাষায় এই ভাবে পরিজনদের প্রসঙ্গ শুনিয়া পাঞ্জাবী মেয়েটি অনেকটা আশ্বস্ত হইল। অন্যান্য বালিকাগুলি কাণ পাতিয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিল, কিন্তু তাহারা যে কিছুই বুঝিতে পারে নাই, তাহাদের মুখ দেখিয়াই বোধ হইতেছিল। এতগুলি মেয়ের মধ্যে এই বালিকাটিই একমাত্র পাঞ্জাবী। কিন্তু ইহার ভাষা লালাজী ভিন্ন অন্যের দুর্ব্বোধ্য ছিল। অন্যান্য বালিকাগুলিকে একে একে

বিভিন্ন ভাষায় প্রশ্ন তুলিয়া এবং অতিকষ্টে প্রত্যেক মেয়েটির প্রাদেশিকতা উপলব্ধি করিয়া লালাজী ইহাদের সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন যে, কোন কন্যাই প্রয়াগ বা সন্নিহিত অঞ্চলের বাসীন্দা নহে। ইহাদের অভিভাবকেরা পুণ্যার্থী হইয়া বহুদূরবর্ত্তী অঞ্চল হইতে এই মহামেলায় আসিয়া মিলিয়াছে এবং ফরমাসী ফুলের তোড়া রচনা করিবার জন্য মালাকর যেভাবে বিভিন্ন গাছ হইতে বাছিয়া বাছিয়া পছন্দমত একএকটি ফুল তুলিয়া তোড়ায় যোজনা করিয়া থাকে, তাঁহার নিয়োযিত কন্যারত্ন-সন্ধানীগণও রূপোদ্যানের এই কয়টি রত্ন-কোরক সতর্ক-নৈপুণ্যে চয়ন করিয়া সিদ্ধাশ্রমের জীবন্ত পণ্যভাণ্ডারটি ভরাইয়া দিয়াছে।

বিশ্বস্ত ও মূক আশ্রম-সেবক শম্ভু এই সময় একখানা বৃহৎ থালার উপর পানীয়পূর্ণ বারোটি পিয়ালা সাজাইয়া আস্তে আস্তে ঘরখানির ভিতর প্রবেশ করিল। লালাজী তাহার পানে তাকাইয়া মৃদুস্বরে বাঙ্গালা ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন: ওষুধ দাগ মত দিয়েছিস ত?

ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া শম্ভু থালাখানি লালাজীর সম্মুখে রাখিল। অমনি প্রফুল্ল মুখখানিতে স্নেহের একটা পূর্ণ আভা ফুটাইয়া লালাজী এক একটি পিয়ালা স্বহস্তে তুলিয়া প্রত্যেক মেয়েটির দিকে একে একে আগাইয়া দিলেন, সেই সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় দরদভরা স্বরের ধারা ছুটিল: মিষ্টি সরবত, খেয়ে ফেল খুকি, কেঁদে কেঁদে গলা শুকিয়ে গেছে, ভাবনা কিসের, বাবা এলেন বলে—ইত্যাদি। কোন্টি কোন্ প্রদেশের মেয়ে, কোন্ প্রাদেশিক ভাষায় কথা বলিলে বুঝিতে পারিবে, ইতিমধ্যে লালাজী তাহা মনে মনে ছকিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার এই প্রচেষ্টা সফলও হইল। রক্তবর্ণের কমনীয় পানীয়

বালিকাদের তৃষিত ওষ্ঠগুলিকে এরূপ আকৃষ্ট করিতেছিল যে, অনুরোধের মাত্রা বাড়াইবার আর প্রয়োজন হইল না।

প্রায় প্রত্যেকেই এক নিশ্বাসে স্ব স্ব পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিল এবং অনতিবিলম্বেই তাহাদের চোখের পাতাগুলির উপর ধীরে ধীরে ঘুমের ছায়া এমনভাবে ঘনাইয়া আসিল যে, কাহারও আর বসিয়া থাকিবার সামর্থ্য রহিল না।

লালাজীর ইঙ্গিতে শঙ্কু শূন্য পিয়লাগুলি থালায় তুলিয়া চলিয়া গেল। মুখখানি এবার গম্ভীর করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া এবং মুখে সুরের ঝঙ্কার তুলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পাশাপাশি শায়িতা কন্যাদের নিদ্রাচ্ছন্ন মুখগুলির পূর্ণ অংশ আলোর অভাবে অস্পষ্ট দেখাইতেছে বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ পিরাণের পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটি টর্চ্চ বাহির করিলেন এবং তাহার আলোক-রশ্মি একে একে প্রত্যেক কন্যাটির মুখে নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে উল্লাসের সুরে নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন :—Splendid ! In space comes a grace.

দরজাটি ঠেলিয়া শঙ্কু পুনরায় ঘরে ঢুকিল এবং ইসারায় জানাইল, স্বামীজী তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন। শঙ্কু যেন ঠিক কলের পুতুল। কাজটুকু তাহার সারিয়াই অদৃশ্য হইল। লালাজীর মুখখানি পুনরায় গম্ভীর হইয়া আসিল। যে বারোটি কন্যারত্নের এরূপ আশ্চর্য্য সমন্বয়ে তিনি ভবিষ্যৎসম্বন্ধে এতটা আশান্বিত, স্বামীজী এক নজরে তাহাদিগকে দেখিয়াই অনাবশ্যক আবর্জ্জনার সামিল বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আশ্রমের দুই চক্ষুষ্মান বিজ্ঞের মধ্যে এরূপ মতভেদ ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। স্বামীজীর আহ্বানের অর্থ আর কিছু নয়, অপহৃতা

কন্যাগুলির সম্পর্কেই লালাজীর সহিত তিনি আলোচনা করিতে চান। কিন্তু এই কন্যাগুলি আজ লালাজীর দৃষ্টি পথে আসিয়া তাঁহার চোখের সামনে অদূর ভবিষ্যতের যে দৃশ্যপট টাঙ্গাইয়া দিয়াছে তাঁহাকে এখন তাহার উপরেই রঙ তুলি চালাইতে হইবে। সঙ্কল্পের আভা চোখে মুখে ফুটাইয়া লালাজী স্বামীজীর উদ্দেশেই চলিলেন।

(৩)

বৃহৎ একখানি বাঘছালের উপর বসিয়া সিদ্ধাশ্রমের শিরোমণি শ্রীমৎ আনন্দস্বামী নিবিষ্ট মনে একখানি ইংরাজী দর্শনের বই পড়িতেছিলেন। বিচিত্র আসনখানির চারিদিকে বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত দুর্লভ গ্রন্থরাজির সমাবেশ আশ্রমস্বামীর অসাধারণ বিদ্যানুরাগের যেমন সুস্পষ্ট একটা পরিচয় দিতেছিল, তেমনই বিশাল দেহ, দীর্ঘবাহু, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, হস্তি-কর্ণ, নক্ষত্রের মত দীপ্ত চক্ষু, ভ্রমর-কৃষ্ণ স্থূল গুম্ফ ও দীর্ঘ শ্মশ্রুরছটা, আস্কন্ধ তরঙ্গায়িত কেশপাশ প্রভৃতির দুর্লভ সমন্বয়ে গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত তাঁহার অপরূপ মূর্ত্তিটি দেখিবামাত্রই দর্শক-মনে এই ধারণাই দৃঢ় হইয়া উঠে যে, এক বিরাট পুরুষ স্বকীয় ব্যক্তিত্বে সবার উর্দ্ধে অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অতিক্রম করা সহজসাধ্য নহে।

লালা ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: ডাকছিলেন দাদাজী?

স্বামীজীকে লালা দাদাজী বলিয়া সম্ভাষণ করেন এবং ইঁহাদের সাধারণ কথাবার্ত্তা বাঙ্গালা ভাষাতেই চলিয়া থাকে। লালার মাতৃভাষা হিন্দী হইলেও পাঠ্যজীবন হইতেই তিনি বাঙ্গালা ও উর্দ্দুর পক্ষপাতী। তৎকালীন যুক্তপ্রদেশবাসী শিক্ষিত-সমাজের আদর্শে তিনি হিন্দীকে উপেক্ষা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং কলিকাতার কলেজের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালাকে মাতৃভাষার মত আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন। পরে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটিলেও বাঙ্গালা-ভাষীর সহিত বাঙ্গালা ভাষাতেই আলাপ করিতে তিনি ভালবাসেন।

হাতের বইখানি মুড়িয়া রাখিয়া স্বামীজী লালার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্মশ্রুগুম্ফ মণ্ডিত সমগ্র মুখখানি যেন অকস্মাৎ বদলাইয়া গেল। এ দৃষ্টির সহিত লালাজী সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু আজ তিনিও প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন আদর্শ সম্বন্ধে একটা বোঝা পড়া করিবার জন্য, সুতরাং স্বামীজীর দৃষ্টিতে অভিভূত না হইয়া অসঙ্কোচে এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: বুঝতে পেরেছি, আপনি বিরক্ত হয়েছেন আমার উপর, তাই কৈফিয়ৎ চান।

স্বামীজীর দৃষ্টি একবার টর্চ্চের আলোক-রশ্মির মত লালার দুই চক্ষুতে নিবদ্ধ হইল। কিন্তু কণ্ঠ দিয়া যে স্বর বাহির হইল তাহা অতিশয় স্নিগ্ধ, কোমল, মর্ম্মস্পর্শী। প্রশ্নের সুরেই স্বামীজী বলিলেন: তোমার চোখে বিদ্রোহের শিখা দেখা যাচ্ছে যে লালা, তুমি কি আজ দাদাজীর সঙ্গে লড়াই করবার জন্য তৈরী হয়ে এসেছ ভাই?

লালার মুখ ও চক্ষুর ভাব সঙ্গে সঙ্গেই বদলাইয়া গেল। কণ্ঠ দিয়া

একটি কথাও বাহির হইল না, বিহ্বলের মতই তিনি এই অদ্ভুত মানুষটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

স্বামীজী এবার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন: দাঁড়িয়ে রইলে যে অবাক হ'য়ে, ব'স; কথা আছে। অতীত বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ—এই তিনটেরই আজ সমাধান করা চাই। ঝড় ওঠবার আগেই আমাদের উচিত যে যার ঘর সামলে নেওয়া।

খানিকটা তফাতে গেরুয়া রঙের একখানি বনাত বিছানো ছিল, সেইটিই এ-কক্ষে লালার নির্দ্দিষ্ট আসন। ধীরে ধীরে তিনি আসন গ্রহণ করিয়া চাহিতেই স্বামীজীর সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল। তিনি এ-পর্য্যন্ত একইভাবে নিবদ্ধদৃষ্টিতে লালাজীর পানেই চাহিয়াছিলেন। এখন বেশ সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে আন্তরিকতার সহিত প্রশ্ন করিলেন: আচ্ছা লালা, আমাদের পরিচয়টা কত দিনের হল?

মনে মনে হিসাব করিয়া লালাজী বলিলেন: আসছে আষাঢ়ে আট বছর পূর্ণ হবে।

স্বামীজী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন: ঠিক, ঠিক। আঁকের হিসেবে তুমি সাক্ষাৎ শুভঙ্কর; হিসেবের ভুল হবার জো নেই। আগ্রার সেণ্ট্রাল জেলে রথযাত্রার দিনেই আমাদের আলাপ হয়েছিল, সেটা আষাঢ় মাস, মনে পড়েছে। আচ্ছা, তার পরের ঘটনাগুলো এক নিশ্বেসে বলে যাও ত ভাই, মিলিয়ে নিই।

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীজীর মুখের পানে তাকাইয়া এবং পরক্ষণে একটা চাপা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া লালাজী বলিলেন: বেরিলির জেল থেকে আপনাকে তখন আগ্রার জেলখানায় আনা হয়েছে। ফিরিঙ্গী জেলারের সঙ্গে তার আগেই আমার খুব মাখামাখি হয়ে

গেছে ; সেই ত আমার নাম রাখে—মাষ্টার হরবোলা, যেহেতু আমি হরেক ভাষার বুলি কপচাতে পারি। জেলখানায় আমার কাজ ছিল ঘানি ঘরে তেলের টিনে মার্কা দেওয়া। জেলার সাহেব খুসি হয়ে সেখান থেকে সরিয়ে তাঁর মেয়েকে উর্দ্দু আর বাংলা শেখাবার ঘানিতে জুড়ে দিলেন। তিনিই ত আমাকে হাসতে হাসতে বললেন একদিন—মাষ্টার হরবোলা, তোমারই এক জুড়িদার এসেছে আমার জেলে। ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ, ল্যাটিন—সব ভাষাতেই ওস্তাদ, ওয়াণ্ডারফুল ম্যান।

স্বামীজী এই সময় বলিলেন ঃ ও! মনে পড়েছে—একটা কয়েদীকে নিয়ে জেলার সাহেব তখন হিমসিম খাচ্ছিলেন। তার কথা বুঝতে না পেরে সাহেব ত একবারে আগুন, আমি তখন সগু এসেছি, কোন্ কাজে লাগাবে ঠিক হয় নি, সাহেবের কাছে সবেমাত্র হাজির করেছে, এমন সময় ঐ কাণ্ড। আমি তখনি ওপরপড়া হয়ে বললুম—সাহেব, ও লোকটা আবল-তাবল বকছে না, ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলছে। সাহেব ত অবাক্! তখন আমাকেই দোভাষী হতে হল, গোল মিটে গেল। আমিও কাজ পেয়ে গেলুম, সাহেব হুকুম দিলেন—আমার কাজ আলাদা, সাহেবকে ফ্রেঞ্চ ভাষা শেখাতে হবে। সাহেবই ত তোমার সঙ্গে আলাপ করে দিলে গো! বলল না—Birds of feather flock together.

লালাজী পুনরায় আরম্ভ করিলেন ঃ তারপর রথ-যাত্রার দিন আপনার মুখের একটা কথা শুনেই আমি আপনাকে চিনে ফেললুম, সেই যে আপনি বললেন—'রথ টানবার জন্যে ছেলে ধরতে বেরিয়েছিলুম, তারই ফলে জেলখানায় এসে ঘানি টানতে হল।'

স্বামীজী বলিলেন : কথায় আছে যে গো, যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত। তোমারও হয়েছিল তাই। যেই শুনলে আমি ছেলে ধরা, অমনি মেয়ের পিছনে নিজের ঘোরাঘুরির ছবিটা চোখের সামনে ফুটে উঠল, আর, তখনি মনের দুয়ারটি খুট করে খুলে দিলে।

লালাজী কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যুত্তরের ভঙ্গিতে বলিলেন : শুধু মনের দুয়ার কেন দাদাজী, জেলখানার দুয়ারটি পর্য্যন্ত খুলে দিয়েছিল এই মেয়ে-ধরার ব্যাপারী, নয় কি ?

গম্ভীর মুখে স্বামীজী বলিলেন : তোমার সেই হিম্মতের কথা মনে হলেই আমি চমকে উঠি। আগ্রা তোমার জন্মভূমি ব'লে তার মাটির সঙ্গে তোমার নাড়ীর যে কতখানি মাখামাখি সংযোগ ছিল—সেদিনই জেনেছিলুম। 'রিলিজ' হতে তখনো আমার দিক দিয়ে আড়াই বছর বাকি ছিল···

লালাজী বলিলেন : ছেলে নিয়ে ছিল আপনার ব্যাপার, তাই তিনটি বছরের বরাদ্দ হয়েছিল। আর মেয়ে ব্যাপারী ব'লে আমাকে দেয় পাঁচ বছরের জন্যে ঘানি-ঘরে ঠেলে। কষ্টে-স্বষ্টে একটি বছরের অভিজ্ঞতা শুধু সঞ্চয় করা হয়েছিল।

স্বামীজীর পরিপুষ্ট গোঁফের ভিতর দিয়া হাসির আভা যেন ফুটিয়া উঠিল, গলার স্বরেও তাহার রেশ লাগিল। কহিলেন : তারপর চলল ভোল বদলাবার পালা। তোমার গোঁফ দাড়ী সব অদৃশ্য হয়ে গেল, আর যে নাস্তিক মানুষটিকে দেখলে সবাই মাকুন্দ-চোপা বলে মুখ ফিরিয়ে নিত ঘৃণায়, সেই মুখখানা চুলের জঙ্গলে ভরে উঠলো। নামও পাল্টাল, আশ্রম উঠল, কাজও চলল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি হল বলতে পার ?

লালাজীর কণ্ঠ দিয়া তিক্ত স্বর বাহির হইল : কিছুই । আত্ম-গোপন আর পান-ভোজন ছাড়া ভূতের বেগারই শুধু খা হয়েছে। আপনার মাথায় স্বরু থেকেই জেদ চাপল যে, ছেলেদের শিখিয়ে পড়িয়ে এমন কিছু করে তুলবেন এ পর্য্যন্ত যা হয় নি,—কোন 'একজ্যাম্পল' পর্য্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি! শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু একটা ছেলেও ধোপে টেঁকল না, আপনার পণ্ডশ্রমই সার হ'ল। তখন যদি আমার কথামত ছেলের বদলে মেয়ে পুষতেন, তাহলে দেখতেন তার ফল কি হ'ত।

শ্লেষের স্বরে স্বামীজী বলিলেন : ফল দেখতে হ'ত না, ভোগ করবার জন্যে জেলখানায় আবার সেঁধুতে হ'ত। 'পুনর্মূষিকোভব' গল্পের কথা মনে আছে ত?

লালাজী হাসিয়া বলিলেন : আপনি যে আজ পথ হারাচ্ছেন দাদাজী, দমিয়ে দেওয়া ত আপনার নীতি নয়। ওর চেয়ে আপনার দেবী চৌধুরাণীর 'একজ্যাম্পল' দিন, কাজে লাগবে। আমি ত জানি—ঐ মেয়েটাই আপনার আদর্শ, কিন্তু মেয়ের সম্পর্কটা অশ্লীল কি না, তাই আপনি ঐ আদর্শে একদল ছেলে তৈরী করতে দ্রোণাচার্য্যের মতন 'প্র্যাকটিস্' স্বরু করলেন।

লালাজীর শেষের কথাগুলি স্বামীজীর অচঞ্চল চিত্তটিও বুঝি ঈষৎ দুলাইয়া দিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লালার মুখে নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিলেন : কি ভেবে এ কথা বললে? দ্রোণাচার্য্যের তন 'প্র্যাকটিস্' করছি আমি—এ কথার মানে?

লালাজীর চোখে মুখে বিদ্যুতের আভার মত তীক্ষ্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বরও ঈষৎ বক্র করিয়া কথাটার উত্তর এই ভাবে

দিলেন : হদিশটি অবশ্য আপনার কাছেই পেয়েছিলুম। কথায় কথায় আপনিই একদিন বলেছিলেন—মহাভারতের দ্রোণাচার্য্য ছিলেন 'ইন্টেলিজেন্ট' পুরুষ, কাজ গুছবার মতলবে তাঁকে রীতিমত 'প্র্যাকটিস্' করতে হয়েছিল। নইলে পাড়াগাঁ থেকে হস্তিনা সহরে এসে বেছে বেছে রাজকুমারদের বল-খেলার ময়দানটির এক প্রান্তে, একটা এঁদো কুয়ার পাশে আস্তানা গাড়বেন কেন? 'প্র্যাকটিস্' থেকেই সুরু হ'ল 'পারফরমেন্স'—দিব্যি একটা 'সিন'ই তৈরী ক'রে ফেললেন। কুমারদের বলটি কুয়ার ভিতরে গড়িয়ে পড়ল, জল নেই তাতে, ভিতরটা অন্ধকার, বলের টিকিও দেখা গেল না। বেচারীরা মুসড়ে পড়ল। এমন সময় কুয়ার কিনারায় নল-খাগড়ার জঙ্গল থেকে মুখখানা তুলে তিনি দিলেন ছেলেগুলোকে ধিক্কার—'আরে ছ্যা, খেলার বলটা কুয়ার ভিতরে পড়ে গেল বলে, না তুলেই তোমরা কিনা হাল ছেড়ে চলে যাচ্ছ?' ছেলেরা চমকে উঠল, শীর্ণকায় রুক্ষমূর্ত্তি রক্তচক্ষু এই অদ্ভুত মানুষটিকে দেখে! ভয়ে ভয়ে তাই বল্‌ল—'কুয়ার ভিতরটা যেমন গভীর, তেমনি অন্ধকার; বলটির চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না, কি ক'রে তুলব?' আচার্য্য বললেন—'ধিক্ তোমাদের শৌর্য্যে, এটা কি এতই শক্ত কাজ?' বলতে বলতে হাতের আঙ্গুল থেকে খুব সরু একটি আংটি খুলে টুপ করে কুয়ার ভিতরে দিলেন ফেলে। তার পর গলায় জোর দিয়ে বলে উঠলেন—'ঐটেকে পর্য্যন্ত তুলতে পারা যায়।' রাজকুমাররা ভাবল, লোকটা নিশ্চয়ই পাগল। কিন্তু পাগল সেখানে বসে বসেই যে 'খেল্' দেখালেন—তাতে তাদের চোখগুলো কপালের দিকে ঠেলে উঠল। হাতের কাছ থেকে নল-খাগড়াগুলো পটপট করে ছিঁড়ে গায়ে গায়ে লাগিয়ে দিলেন কূপের

ভিতরে চালিয়ে। তার পরে সাপে যেমন ব্যাঙ্ ধরে আনে, তেমনি করেই নল-খাগড়ার মুখে উঠে এলো ছেলেদের হারানো বল আর আচার্য্যের হাতের আংটি। 'প্র্যাকটিসে'র ফলে এবার আচার্য্যের 'চান্স' খুলে গেল। যাকে বলে—আঙুল ফুলে কলাগাছ আর কি!

স্বামীজী নিবিষ্ট-চিত্তেই লালাজীর কথাগুলি শুনিতেছিলেন, প্রসঙ্গটি শেষ হইতেই আবেগের সুরে বলিলেন: এ গল্প আমি তোমাকে বলেছিলুম? আমি—আমি?

হাসিতে হাসিতে লালাজী উত্তর দিলেন: আপনি ছাড়া দ্রোণাচার্য্যের সত্যিকার রূপটি এমন করে কে ফোটাতে পারে বলুন? তবে আমি হয়ত জায়গায় জায়গায় একটু আধটু রসান দিয়ে থাকবো; যেমন—আপনি বলেছিলেন ছেলেরা কন্দুক-ক্রীড়া করছিল, আমি সেটাকে ঘুরিয়ে বলেছি—বল খেলছিল। এই রকম কিছু অদল-বদল করিছি আর কি? তবে এর পিছনে আচার্য্য ঠাকুরের যে আসল অভিসন্ধিটি চাপা ছিল, আপনিও সেটি চেপে গিয়েছিলেন দাদাজী!

সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে স্বামীজী বলিলেন: ছেলেদের সম্পর্কে যেটুকু বলা আবশ্যক ছিল তাই বলেছিলুম। দ্রোণাচার্য্য তখনকার ছেলেদের নিয়ে একটা খুব শক্তিশালী দল তৈরী করেছিলেন, এইটিই ছিল আমার বক্তব্য। আর যদি বল তাঁর আদর্শই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, আমি অস্বীকার করব না।

লালাজী অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে স্বামীজীর মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন: এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে দাদাজী, আদর্শের পিছনে উদ্দেশ্য একটা নিশ্চয়ই ছিল; দ্রোণাচার্য্যেরও, এবং আপনারও। তাছাড়া,

সেটি যে নিছক নিরামিষ ব্যাপার, অর্থাৎ অহিংস্র তাও নয়। দ্রোণাচার্য ঠাকুরের উদ্দেশ্য ছিল—দলটিকে দিয়ে দ্রুপদ রাজাকে 'জব্দ' ক'রে অপমানের শোধ তুলবেন, আর আপনার মনটিরও তলে তলে এই ধরণের কোন উদ্দেশ্য যদি ছাই চাপা থাকে দাদাজী—

স্বামীজীর মনের অন্তস্তলটি বোধ হয় মোচড় দিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সবলে তাহা দমন করিয়া তিনি ক্ষিপ্র ভাবে বলিয়া উঠিলেন : কথায় কথায় আমরা দূরে গিয়ে পড়েছি লালা, এখন মোড় ফেরাতে হবে। তোমার কি উদ্দেশ্য, অর্থাৎ তুমি কি করতে চাও, সেইটিই এখন স্পষ্ট ক'রে বল। আমি এই জন্যই তোমাকে ডেকেছি। আশ্রমের আদর্শ নিয়ে যখন আমাদের মধ্যে আজ গোল বাধছে, একটা বোঝা-পড়া হওয়াই ভাল।

লালাজী সপ্রতিভ ভাবেই বলিলেন : আমিও তাই চাই আর সেই কথাই বলছি ; আমাদের আদর্শ বদলাতে হবে দাদাজী!

স্বামীজী : বল, কি করতে চাও ?

লালাজী : দ্রোণাচার্য্যের যুগ চলে গেছে, ছেলে নিয়ে কিছু হবে না। এ-যুগে মেয়ে ছাড়া আর সবই অচল। মেয়ে নইলে সভা জমে না, ভিক্ষা মেলে না, আশ্রমের জন্যে সব খাটুনিই হয় পণ্ডশ্রম। আট বছর চেষ্টা ক'রে ত দেখলেন, একটা ছেলেও কাজে এল না, সবার তাক মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ চালাবার দিকে। কিন্তু মেয়েদের প্রকৃতি আলাদা।

স্বামীজী : ব'ল না তোমার মেয়েদের প্রকৃতির কথা! গাছে তুলে দিয়ে এরা মই কেড়ে নেয়, তারপর প'ড়ে দেহ চুর হলেও ফিরে তাকায় না।

লালাজী : মেয়েদের সম্বন্ধে এ-অভিজ্ঞতা কি [illegible] সঞ্চয় করেছেন দাদাজী ?

স্বামীজী : চোখে দেখেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায়। এক এক বার ইচ্ছাও হয়েছিল অন্ততঃ একটা মেয়েকে নিজের আদর্শে গ'ড়ে তুলি। কিন্তু গড়বার মত মেয়ে ত চোখেই পড়ল না এ পর্য্যন্ত।

লালাজী : বলেন কি ! চোখে পড়ে নি ?

স্বামীজী : না। কল্পনায় আঁকা মেয়ের সঙ্গে কেউ মেলেনি। এই ত এক পাল মেয়ে ধরে আনলে, মেয়ের মতন মেয়ে কেউ আছে ওদের মধ্যে ? সবাই রাঙা মূলো। কেঁদেই মুখ চোখ লাল ক'রে ফেলল সব। ওদের নিয়ে দল করতে চাও ?

লালাজী : আপনি কি-ধাতের মেয়ে চান, আমি তা বুঝেছি ; আর তার ব্যবস্থাও করেছি। কালই আপনাকে সেই মেয়ে দেখাবো। যদি মনে ধরে, তাকেই শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন।

স্বামীজী : আর এগুলোর গতি কি হবে ?

লালাজী : যখন এনেছি, কাউকে ছাড়ব না। [illegible] এগুলোকে নিয়ে আমি একটা আলাদা দল গড়তে চাই। আমারও [illegible]র মধ্যে একটা মতলব খেলছে।

স্বামীজী : মতলবটা শুনতে পাই না ?

লালাজী : এখন নয়। তবে সময় হ'লেই আ[illegible] জানতে পারবেন।

স্বামীজী : [illegible] কিছু করতে চাও ?

লালাজী : নিশ্চয়। আপনি যে রকম মেয়ে চান—তেমনি 'ফায়ার-প্রুফ' খুকি একটি আপনাকে এনে দেব, আপনি তাকে গ'ড়ে

পিটে তৈরী করুন নিজের আদর্শে। আর, আমি এই মেয়েগুলিকে আমার পরিকল্পনা মত শিখিয়ে পড়িয়ে নেব। কিন্তু এখন থেকে আমাদের আশ্রমে—শঙ্কু সহদেব কুবের আর মঙ্গল ছাড়া কোন পুরুষ থাকবে না, কাউকে আশ্রয় দেওয়া হবে না। এই ক'জন হচ্ছে আমাদের আশ্রমের ডালপালা, তিন কুলে কারুর কেউ নেই, এরা প্রাণ দেবে তবু এমন কাজ কিছু করবে না যাতে আপনার আমার অনিষ্ট হয়। এরা সবই জানে, তাই এদের চাই। এখন আপনি যদি এ সর্ত্তে সম্মত না থাকেন, আমাকে তাহলে আলাদা আশ্রম গড়তে হবে।

স্বামীজী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তাহার পর মৃদুস্বরে বলিলেন: তোমার সর্ত্তে সম্মতি না দিয়ে আমার উপায় নেই লালা। মাথা আমি খেলাতে পারি, কিন্তু মাথার রসদ জোগাচ্ছ তুমি। এ-যুগে প্রত্যেক ব্যাপারটির ভিত্তি হচ্ছে টাকা। আটটি বছর ধরে সেটা তুমিই সরবরাহ করে আসছ। কি ক'রে, কি ভাবে যে যোগাচ্ছ, তা জানি না, জিজ্ঞাসাও করি না। কাশীর মাঠ-কোটার আশ্রম ভেঙ্গে বৃন্দাবনের পাকাবাড়ীতে যখন তুলে নিয়ে গেলে আমি ত দেখেই অবাক! লাখ টাকার কমে অতবড় আশ্রমবাড়ী হতে পারে না, কি ক'রে যে হ'ল, তুমিই জান। আমি কোনদিন জানতেও চাই নি। কাজেই মতান্তর হ'লেও তোমাকে ত্যাগ করবার উপায় আমার নেই। বেশ, তোমার সর্ত্তই আমি মেনে নিলুম। তবে এর মধ্যে কিন্তু খিঁচ রইল ঐ মেয়েটি। আমার কল্পনার সঙ্গে খাপ খায় এমন একটি মেয়ে তুমি এনে দেবে। তার পর না হয় তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে লায়েক করে তুলতে আমার বিদ্যেবুদ্ধির ঝুলিটা খালি করাই যাবে গো! আচ্ছা ভায়া, তুমি এখন উঠতে পার। নতুন ঝঞ্ঝাট

যা ঘাড়ে চাপিয়েছ, তার জন্যে এখন দুধ-ঝিনুকের যোগাড় করগে।— কথাগুলি শেষ করিয়াই স্বামীজী পুনরায় দর্শনের বইখানিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

লালাজী উঠিবার সময় বক্র দৃষ্টিতে স্বামীজীর মুখের পানে চাহিয়া মুচকিয়া একটু হাসিলেন মাত্র, কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না।

(৪)

এলাহাবাদ ষ্টেশন হইতে সহরের দিকে যাইতে বড় রাস্তাটির পার্শ্বে বিস্তীর্ণ জমির উপর নবনির্ম্মিত অট্টালিকাখানি পথচারীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। হরপ্রসাদ ঘোষ নামে এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর তীর্থবাসের জন্য বহু ব্যয়ে এই নূতন বাড়ীখানি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মহাকুম্ভ উপলক্ষে গৃহস্বামী সম্প্রতি সপরিবার গৃহপ্রবেশ করিয়াছেন। বাড়ীখানির সর্ব্বাঙ্গে এখন পর্য্যন্ত উৎসবের অনেক নিদর্শন সুস্পষ্ট রহিয়াছে। হরপ্রসাদ বাবুর সুবিস্তৃত ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল হইতেছে বোম্বাই নগরী। বৎসরের অধিকাংশ সময় তাঁহাকে সপরিবার সেখানেই অবস্থিতি করিতে হয়। তদ্ভিন্ন দিল্লী, আগরা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ, মৃজাপুর, কাশী প্রভৃতি প্রাদেশিক প্রধান প্রধান সহরগুলিতেও তাঁহার বাণিজ্য-শাখা এক একখানি নিজস্ব বাটী অবলম্বন করিয়াই প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। এলাহাবাদে ইহার অভাব থাকায় সম্প্রতি তাহাও পূর্ণ হইয়াছে। গৃহিণী অনুপমার পীড়াপীড়িতে প্রয়াগের বাড়ীখানি মহাকুম্ভ সুরু হইবার পূর্ব্বেই শেষ করিবার জন্য

হরপ্রসাদ বাবু হিসাবের উপর অনেকগুলি টাকা বেশী ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন। যেমন—ভাড়া বাড়ীতে বাস করিতে অভ্যস্ত নহেন বলিয়া, ষ্টেশনের নিকট বাংলো-প্যাটার্ণের ছোটখাটো একখানি বাড়ীও তাঁহাকে তৈয়ারী করাইয়া লইতে হইয়াছে। সেই বাড়ীতে বাসা পাতিয়া নূতন বাড়ীর নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। কাজ কর্ম্ম চুকিয়া যাইবার পর উক্ত বাংলো বাড়ীখানি ভাড়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহার বারান্দায় এখন নোটিস টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে, তদুপলক্ষে দুই বেলাই বিভিন্ন ভাড়াটিয়ার আনাগোনা চলিয়াছে। কিন্তু প্রচুর অর্থশালী হইলেও, সকল বিষয়েই হরপ্রসাদ বাবুর হিসাবটি যেন চুল-চেরার ব্যবস্থার মত, এতটুকু এদিক-ওদিক হইবার জো নাই। একে মহামেলা, তাহাতে কত লোক কত রকমের ফন্দি লইয়াই ত প্রয়াগে মাথা মুড়াইতে আসিয়া থাকে, কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ ভাল করিয়া দেখাশুনার পর সন্তুষ্ট না হওয়াপর্য্যন্ত যাহাকে তাহাকে বাড়ী ভাড়া দিবার পাত্রই তিনি নহেন। তাই এ পর্য্যন্ত ঠিক মনের মত ভাড়াটিয়া না পাইয়া বাড়ীখানি তিনি খালি অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন তথাপি ভাড়া দেন নাই। অথচ দুই বেলাই তাঁহার নূতন বসতবাটীর বৈঠকখানায় নব নব প্রার্থীদের আনাগোনা চলিতেছে এবং তিনিও ইহা কর্ত্তব্যের সামিল ভাবিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থায় অবহিত আছেন। এই অবস্থায় একদা অপরাহ্ণে তাঁহার সুসজ্জিত বৈঠকখানায় এক অভিনব প্রার্থীর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব হইল।

বাহিরের সুপ্রশস্ত ঘরখানির মধ্যে দুই জোড়া তক্তপোষের উপর প্রসারিত ফরাসে একটা স্থূল তাকিয়ায় দেহভার ন্যস্ত করিয়া গৃহস্বামী সে-দিনের ‘লীডার’ পড়িতেছিলেন।

অপরিচিতা

হরপ্রসাদ বাবু যে সুপুরুষ লোক, তাঁহার সুশ্রী সুন্দর চেহারাখানি দেখিবামাত্রই তাহার আভাস পাওয়া যায়। গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ ব্যক্তি। মাথার চুলে এখনও পাক ধরে নাই, আগাগোড়া ছোট করিয়া ছাঁটা। মুখের নিম্নাংশ ক্ষৌরিত, ওষ্ঠের উপর সুপুষ্ট গোঁফ-জোড়াটি যেন তাঁহার পৌরুষের নিদর্শন দিতেছে। গায়ে সাদা কাপড়ের হাতকাটা জামা। গৃহখানি বিবিধ আসবাবপত্রে ও বিভিন্ন আলেখ্যে সজ্জিত হইলেও গৃহস্বামীর বেশভূষায় বিলাসিতার বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। চশমা লইবার বয়ঃক্রম হইলেও বিনা চশমাতেই তিনি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন।

ঘরের দেওয়ালে রক্ষিত সেথ-টমাসের সুবৃহৎ ঘড়িটি একটু আগেই পর পর-চারিবার সুমিষ্ট ঝঙ্কার তুলিয়া সময়টা ঘোষণা করিয়াছে। অপরাহ্নের ম্লান রৌদ্রালোকে ঘরের সম্মুখবর্ত্তী বিস্তীর্ণ অঙ্গণটি যেন তন্দ্রাতুর, মধ্যে মধ্যে অনুকূল বায়ু-তরঙ্গে দূরবর্ত্তী মহামেলায় সমবেত অসংখ্য কণ্ঠের কল্লোল ভাসিয়া আসিয়া মেঘগর্জ্জনের মত এই জন-বিরল পল্লীটির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

ভৃত্য কানাই এই সময় যে ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া প্রভুর সম্মুখীন হইল, তাঁহার পাদুকার কর্কশ শব্দে আকৃষ্ট হইয়া গৃহস্বামী কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, অদ্ভুত আকৃতি অপরিচিত এক ব্যক্তি দ্বারের কাছে দাড়াইয়া একান্ত পরিচিতের মতই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। চেহারা দেখিলে লোকটির বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর বলিয়া মনে হয়। মুখশ্রী সুন্দর ও নিখুঁত, ঘন গোঁফ-দাড়ী, দাড়ীর তলার দিকটা চৌকা করিয়া ছাঁটা, নাকের গড়নটি এমন চমৎকার এবং খড়্গের মত এমনই তীক্ষ্ণ ও উন্নত যে প্রথমেই তাহা

দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। সুন্দর মুখ ও টিকালো নাকটির তুলনায় চোখ দুটি ক্ষুদ্র হইলেও এত তীক্ষ্ণ যে, নীল চশমার পুরু কাচের ভিতর দিয়াও তাহার দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছিল। দেহ দীর্ঘ ও মজবুত। গায়ে কালো রঙ্গের আচকান, মাথায় পারসী প্যাটার্ণের উঁচু টুপি। হাতে চামড়ার একটা লম্বা ধরণের 'গ্লাডষ্টোন' ব্যাগ।

প্রভুর সমক্ষে আগন্তুককে পঁহুছাইয়া দিয়া এবং তিনি যে ষ্টেশন সন্নিহিত বাড়ীখানি ভাড়া লইতে আসিয়াছেন সংক্ষেপে সেটি জানাইয়া কানাই চলিয়া গেল। হরপ্রসাদ বাবুর সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র আগন্তুকই প্রথমে পরিষ্কার বাঙ্গালায় বলিয়া উঠিলেন: মিষ্টার এইচ পি ঘোষকে দেখেই আমি হরপ্রসাদ ঘোষ বলে চিনতে পেরেছি—এটা কি আশ্চর্য্য হবার মত নয়?

অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষ হইতে এরূপ সম্ভাষণ ধনাঢ্য গৃহস্বামীর পক্ষে প্রীতিকর হইল না। তিক্তকণ্ঠে তিনি উত্তর করিলেন: নিশ্চয়ই নয়; মিষ্টার এইচ পি ঘোষই যে হরপ্রসাদ ঘোষ—এ খবর অনেকেই জানে।

কৌতুকের সুরে আগন্তুক কহিলেন: আমি কিন্তু এ-ঘরে ঢোকবার আগে জানতুম না যে মিঃ এইচ পি ঘোষই আমার অতি পরিচিত বন্ধু হরপ্রসাদ ঘোষ ওরফে হরু।

সোজা হইয়া বসিয়া এবং দৃষ্টি উজ্জ্বলতর করিয়া হরপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনার নাম কি বলুন ত—কোথা থেকে আসছেন?

পরিহাসের ভঙ্গিতে আগন্তুক বলিলেন: আসছেন সোজা রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে। কিন্তু উত্তম পুরুষটা নাই বা ব্যবহার করলে! আমি সুরু থেকেই মধ্যম পুরুষ চালিয়েছি। তাছাড়া, মুখখানা এক

নজরে দেখেই চিনেছিলুম, এ হরু না হয়ে যায় না।—এ পর্যান্ত বলিয়াই চট করিয়া পিছনে ফিরিয়া হাত বাড়াইয়া খোলা দরজার কবাট দুটি বন্ধ করিয়া দিলেন। পরক্ষণেই ফরাসের প্রান্তদেশে হাতের ব্যাগটি রাখিয়া তাহারই সান্নিধ্যে রক্ষিত কেদারাখানির উপর বসিয়া হাসিমুখে কহিলেন: এ! এখনো আমাকে চিনতে পারলে না হরু? ধরে নিলুম মুখখানা না হয় চুলের জঙ্গলে ভরে গেছে; কিন্তু এটা ত ঠিক খাড়া হয়ে আছে—একে দেখেও চিনতে পারছ না এর মালিকটিকে?—কথার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক হাতের মোটা মোটা আঙুলে তাঁহার টিকালো নাকের ডগাটি জোরে টিপিয়া উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিলেন।

স্তব্ধ হরপ্রসাদের চোখের পরদাটিও যেন সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া গেল, ব্যগ্রকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন: তুমি কি তাহলে নাকু?

উচ্চ-হাসির সহিত হাতের তালি দিয়া আগন্তুক সুর করিয়া বলিলেন: একেই বলে—সালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! নাকুর বদলে নরণ পেলুম তাক-ডুমা-ডুম-ডুম!

হরপ্রসাদ বাবুর বুকের ভিতরে যেন আনন্দের ঝড় বহিয়া গেল। যে অপরিচিত মানুষটির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে চেনা-অচেনার দ্বন্দ্ব একটা চলিতেছিল, শেষের ব্যাপারে তাহার সমাধান ত হইলই, উপরন্তু পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের এক পরিচিত প্রিয়দর্শন মুখশ্রী তাহার নিবিড় শ্মশ্রু-গুম্ফের মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল সহর্ষে তিনি বলিলেন: থাম বন্ধু থাম, এখনি লোকজন সব ছুটে আসবে তামাসা দেখতে। আমি চিনিছি! তবে তোমার গলার স্বর পালটালেও নাকটি পালটায় নি, ঐটেই চিনিয়ে দিলে সত্যিই তুমি

নাকু। যাক, নাকু ওরফে শম্ভুনাথ বোসের কারবারটা মারা পড়লেও, সে তাহলে মরে নি। জয় জগদীশ!

শম্ভুনাথ: জাহাজ যখন ডুবেছে, ক্যাপ্টেনেরও উচিত ছিল সেই সঙ্গে ডুবে যাওয়া। ডুবেও ছিল, কিন্তু হঠাৎ ঠাঁই-জলে পা লাগতে আর তলিয়ে যায় নি—কিনারা পেয়ে গেছে।

হরপ্রসাদ: কিনারায় উঠেই কি প্রয়াগে পাড়ি দেওয়া হয়েছে—মাথা না মুড়োলেও অন্ততঃ গোঁফদাড়িগুলো মুড়োবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয়?

শম্ভুনাথ: না বন্ধু, সে ইচ্ছা আপাততঃ নেই। মসৃণ মুখখানার উপরে চুলের এই কেয়ারীর জন্যে অনেক প্রয়াস এবং পরিশ্রম করতে হয়েছে। জাহাজ ডুবি হবার মত উপলক্ষ কিছুই ঘটে নি, এক ধড়িবাজের পাল্লায় পড়ে একদিনেই সর্ব্বস্বান্ত হলুম।

হরপ্রসাদ: বল কি হে?

শম্ভুনাথ: সাড়ে সাত লাখ টাকা ক্যাসে মজুত, একটা লাভজনক স্পেকুলেশন ব্যাপারের জন্যে আনিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু রাতারাতি সে টাকা লুঠ হয়ে গেল। আমার স্ত্রীকে নিয়ে তখন যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে। সেও চোখ বুজালো আর আমারও ভরাডুবি হ'ল। মান মর্য্যাদা প্রভাব প্রতিপত্তি সহায়সম্পদ সমস্তই যেন ছায়াবাজীর মতন মিলিয়ে গেল।

উভয়েই ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হরপ্রসাদ আগন্তুকের শ্মশ্রুল মুখখানির পানে নীরবে চাহিয়া থাকিয়া জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার দৃষ্টি যেন ব্যথায় ভরিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইল। একটু পরে তিনি গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করিলেন: ছেলে পুলে কি?

শম্ভুনাথ কহিলেন : সবে ধন নীলমণি একটি ছেলে ; স্ত্রীর প্রথম আর শেষ দান। চাঁদেরকণার মতন ছ' বছরের ছেলেটিকে রেখে স্ত্রী ত শেষ নিশ্বাস ফেললেন, কিন্তু তার পানে চেয়ে তাকেই অবলম্বন করে দাঁড়াতে আর প্রবৃত্তি হয় নি, বুঝলে ! স্ত্রীর সঞ্চিত হাজার কয়েক টাকার সঙ্গে ছেলেটাকে তার মামাদের হাতে সঁপে দিয়ে হারাণো সৌভাগ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।

হরপ্রসাদ : বটে ? কিন্তু আত্মীয়রা ধরে রাখলে না তোমাকে ? আর ছেলেটার মায়া কাটিয়ে আলেয়ার পিছনে ঘুরে বেড়াতে প্রাণও চাইছে ? ছেলের জন্যে মন-কেমনও করে না ?

শম্ভুনাথ : আত্মীয়দের অপরাধ নেই, আর ছেলেটার মায়া যে একেবারে কাটাতে পেরেছি তাও নয়। তবে কি জান হরু, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের চোখের উপর বাপের অক্ষমতা সুস্পষ্ট হয়ে মুখখানা তার নিচু করে দেবে—এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না বলেই অনেক ভেবে-চিন্তে এই পথটা ধরা গেছে। আত্মীয়রা জেনেছে, ধনুর্ভঙ্গ পণ আমার—নিজের ভুলে যে ক্ষতি করে ফেলেছি, তার পূরণ না করে ফিরছি না। এতে তাঁরা অখুসিও নন ; তাছাড়া, ছেলেটাকে মানুষ করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে টাকাটা দিয়েছি, তাতে ভারটা একেবারে দুঃসহ হবার কথাও নয়।

হরপ্রসাদ : বুঝেছি, ওদিকের ঝঞ্ঝাট সব কাটিয়ে এসেছ। এখন এদিককার খবরটা শুনি—যে মতলব নিয়ে ষ্টেশন রোডের কাছে মিষ্টার এইচ পি ঘোষের পোড়া বাংলো ভাড়া নিতে আসা হয়েছে ?

শম্ভুনাথ : এর পিছনেও একটা কাহিনী আছে হরু। শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। ভরাডুবিটা আমার কাশীতেই হয়েছিল।

হরপ্রসাদ : কাশীতে ?

শম্ভুনাথ : বছর দুই আগেকার কথা, স্ত্রীর শরীর ভেঙ্গে পড়ায় কাশীতে তাঁকে হাওয়া বদলাতে আনি। আসবার পরই স্বাস্থ্যের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হল। শোনা গেল, এক সাধুর কৃপাতেই এটা সম্ভব হয়েছে। ফলে, সাধুদের 'মচ্ছব' স্বুরু হল কাশীর বাসায়। স্ত্রীটিও ছিলেন এমনি সাধু-বিশ্বাসী যে, গেরুয়া দেখলেই ভক্তিতে গদ-গদ হয়ে পড়তেন, ভিতরে তার যাই থাক। আর আমারো ছিল মস্ত একটা বাতিক নতুন কোন '[illegible]' পিছনে ধাওয়া করা—চোখ বুজিয়ে টাকা ছাড়া। বরাবর জিতে এসে বুকের পাটাটা শক্ত হয়েই গিয়েছিল বোধ হয়, নতুবা কাশীতে চেঞ্জে এসে ব্যাঙ্কের সমস্ত পুঁজি নিয়ে সাড়ে সাতলাখ টাকার গিনি কিনি !

হরপ্রসাদ : গিনির ব্যাপারে কি স্পেকুলেসানটা মাথায় সেঁধিয়েছিল ?

শম্ভুনাথ : জান বোধ হয়, বছর দুই আগে গিনি একেবার দুর্লভ হয়ে পড়ে। অথচ আজিমপুরের রাজার চাই দশ লাখ টাকার গিনি, চারদিকে দালাল ছোটা ছুটি করছে গিনির সন্ধানে। মুনফাও আশ্চর্য্য রকমের। সাড়ে সাত লাখ টাকার গিনিতে পুরো আট লাখ টাকা পাবার কথা। এ দাঁও কি কোন ব্যবসাদার ছাড়তে পারে বন্ধু ? এই অতি-লাভের লোভই হ'ল কাল। রাতারাতি সব গেল।

হরপ্রসাদ : স্পেকুলেসানের দশাই ত এই! যাক্, গেল কি ক'রে, আর এ ব্যাপারের 'হিরো' হলেন কে ?

শম্ভুনাথ : ঐ সাধু। আমার স্ত্রী-বেচারী যার তাকতুক বা বুজরুকিতে ব্যাধির প্রথম ধাক্কাটা সামলে ছিলেন। আমার ধারণা—

সমস্ত ব্যাপারটার কল-কাঠি সে-ই নেড়েছিল। সে সব অনেক কথা ভাই, পরে বলব। এখন শুধু এইটুকুই সংক্ষেপে শুনে রাখ—কিনারা কিছুই হয় নি, আর সেই দুঃসময়ে আমার পক্ষেও কোন তদ্বির করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু তাই বলে হালটিও একেবারে ছেড়ে দিই নি। ছেলেটার বিলি ব্যবস্থার পর আবার এই বয়সে নতুন লাইনে কেঁচে গণ্ডূষ করতে হয়েছে। অর্থাৎ কি না, রীতিমত তদ্বির আর শিক্ষা-নবিসীর পর ইউ, পি, পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে নাম লেখাতে পেরেছি। অদৃষ্টক্রমে ঠিক সেই সময় কুম্ভমেলায় পাঠাবার জন্য সরকার মাথাওয়ালা জনকতক গোয়েন্দা খুঁজছিলেন, সুপারিসের জোরে তাদের মধ্যেই 'প্লেস' পাওয়া গিয়েছে। উপরওয়ালার নির্দেশ হচ্ছে—সন্দেহভাজন লোকদের উপর লক্ষ্য রাখা, অপরাধের বীজাণুগুলির সন্ধান নেওয়া। এই সঙ্গে নিজের যে আসল উদ্দেশ্যটি চাপা আছে সেটি হচ্ছে—সাধুর মেলা থেকে কাশীর সেই গিনি-মার্কা সাধুটিকে খুঁজে বার করা। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে তোমার বাড়ীখানা দেখেই চট্ করে মনে লেগে যায়। ঐখানেই নিজের 'ডেরা' পাতব স্থির করে মিষ্টার এইচ পি ঘোষের সন্ধানে আসি। এক নিশ্বাসেই আমার ইতিহাস শুনিয়ে দিলুম তোমাকে। পালটা শোনাবার পালা এখন তোমার।

হরপ্রসাদ : সে ত পালাচ্ছে না হে, ধীরে সুস্থে শুনবে। জলে ত পড় নি, তা'ছাড়া বাড়ী ভাড়া করতে এসেই গোয়েন্দার দৃষ্টিতে বাড়ীর মালিককে যখন চিনে বা'র করেছ—ও সব হাঙ্গামায় যাবার দরকার না হতেও পারে।

শম্ভুনাথ : এ কথা বলবার মানে?

হরপ্রসাদ : মানে করতে হলে আরো পঁচিশ বছর পিছিয়ে যেতে হয় বন্ধু! মনে পড়ে, আমাদের বন্ধুত্ব আর সম্প্রতি দেখে তখন কলেজের ছেলেরা বন্ধু যুগলের কি নাম রেখেছিল?

শম্ভুনাথ : নোজ য়্যাণ্ড রোজ। পঁচিশ বছরের ঝড়-ঝাপটাতেও ভুলিনি। গোলাপ ফুলের মত তোমার মুখখানা সুন্দর ব'লে তুমি হলে—'রোজ', আর এই নাকের দৌলতে আমি হই—'নোজ', নাম দুটো আমাদের খুব পছন্দই হয়েছিল, নয় কি হরু?

হরপ্রসাদ : নিশ্চয়। তাইনা আমরা সকলকে শুনিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—ছাত্র-জীবনের সম্প্রীতি আমরা কর্ম্ম-জীবনেও সমানভাবে ধরে রাখবো। দুই বন্ধু মিলে নতুন কর্ম্ম ক্ষেত্র আমরা গড়ে তুলবো ছাড়াছাড়ি আমাদের হবে না। এই না?

শম্ভুনাথ : হ্যাঁ, ঠিক; তবে নব যৌবনের প্রতিজ্ঞার জোয়ারটা ভারি বেখাপ্পা; ভাঁটা পড়তে দেখা গেল, দুই বন্ধুর মাঝখান দিয়ে হাজার মাইলের খাদ পড়ে গেছে। একজন বসেছেন বোম্বায়ে জেঁকে, আর একজন আসামের বাঁকে। কমলার পদছায়া পড়েছে দু'জনেরই মুখে। শুনেই দুই বন্ধু সুখী হতেন, কাজের চাপে চিঠি-বাজির ফুরসদও কেউ পেতেন না।

হরপ্রসাদ : কিন্তু দুই বন্ধু অন্তরের সঙ্গেই সে দিন প্রতিজ্ঞা করেছিল বলেই পঁচিশ বছর পরে হাজার মাইলের খাদ তার ব্যবধান ঘুচিয়ে এভাবে যোগসূত্র রচে দিলে। পঁচিশ বছর পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞাই আজ সত্য আর সার্থক হচ্ছে হে,—এবার দুই বন্ধুতেই এক সঙ্গে পাড়ি দেওয়া যাবে। অর্থাৎ, তোমাকে আমার এখানকার কারবারের পার্টনার করে নিয়ে আমাদের প্রতিজ্ঞাটিকে সার্থক করব।

শম্ভুনাথ: দেখছি তোমার স্বভাব এখনো বদলায়নি, তেমনি খেয়ালীই আছ হরু।

হরপ্রসাদ: না, খেয়ালী হলে আমি কখনই ব্যবসায়ে এভাবে সাফল্যলাভ করতে পারতুম না। তবে আমাকে হিসিবি বলতে পার। কেননা, হিসাব না করে আমি কিছুই করি না।

শম্ভুনাথ: কিন্তু পঁচিশ বছর পূর্ব্বের একটা প্রতিজ্ঞার সূত্র ধরে—তুমি যে আমার মতন কর্ম্ম-জীবনে আন্-সাকসেসফুল এক বন্ধুকে তোমার বিজনেসের পার্টনার করবে বললে, একে খেয়াল ছাড়া কি বলব?

হরপ্রসাদ: তুমি ভাই নিজেই খেয়ালী মানুষ, তাই এরই মধ্যে আমি-যে হিসেব করেই কথাটা বলেছি, তুমি সেটা বুঝতে পারনি। কিন্তু বুঝতে বিলম্ব হবে না।

শম্ভুনাথ: ওসব বোঝা-বুঝির ব্যাপার এখন থাকুক, আগে তোমার সংসারের খবরটি দাও, শুনে আশ্বস্ত হই।

হরপ্রসাদ: তুমিত জান ভাই, ভগবান সব সুখ কাউকে সমান মেপে দেন না। ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন, কিন্তু ভোগ করবার লোক কই? তিনটি মেয়ে নিয়েই সংসার। ছেলে হয়নি ব'লে মেয়ে তিনটিকেই ছেলের মত করে স্বামি-স্ত্রী মানুষ করেছি। বড় আর মেঝটির বিয়ে হয়ে গেছে, জামাই দুটিকে কাছে রেখে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছি, তারাই এখন কারবার দেখে। ছোটটি বছর পাঁচেকের। আচ্ছা, তোমার ছেলেটিও এতদিনে আটে পড়েছে, নয়?

শম্ভুনাথ: কি করে জানলে?

হরপ্রসাদ: কেন, হিসেব করে। লোকের কথা শোনবার সময়

আমি যেমন হিসেব করে শুনি, তেমনি হিসেব করেই কথা বলি। এটা আমার অভ্যাসের মতন হয়ে গেছে। তুমি প্রথমেই বললে না, চাঁদের কণার মত দু'বছরের খোকাটিকে রেখে তোমার স্ত্রী শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন। তারপর দুটো বছর ধরে নাটা-ঝাপটা খাবার পর ত তুমি গোয়েন্দা হয়ে বেরিয়েছ হে! তাহলে তোমার ছেলের বয়স আটের কম কিছুতেই হতে পারে না।

শম্ভুনাথ : না, তুমি দেখছি সত্যিই হিসিবি লোক, আমি তোমাকে ভুল বুঝিছিলুম।

হরপ্রসাদ : আমাকে ভুল বুঝলেও, নিজে ত এখন বুঝতে পারছ যে, বয়সের দিক দিয়ে দুটিতে মিলবে ভাল?

শম্ভুনাথ : বছর তিনেক আগে হলে কথাটা বুঝতে চেষ্টা করতুম।

হরপ্রসাদ : তার মানে?

শম্ভুনাথ : এতবড় হিসিবি মানুষ হয়েও মানে বুঝছ না বন্ধু? আমার মত সর্ব্বহারার ছেলের সঙ্গে তোমার মত ধনপতির মেয়ের নামটা এভাবে তোলাটাই যে ঠাট্টার মত মনে হচ্ছে!

হরপ্রসাদ : বিলক্ষণ! দুনিয়ায় অর্থটাই কি সব চেয়ে বড় শম্ভু? তুমি শুনলে অবাক হবে, যে দুটি ছেলে আমার জামাই হয়েছে, তারা কেউ বড়লোকের ছেলে নয়। বেছে বেছে স্বভাব আর শিক্ষাটুকু যাচাই করে গরীবের ছেলেকেই আমি ধ'রে এনেছি। তাছাড়া, তোমারো এদিন থাকবে না, আমি বলছি—সম্বৎসরের মধ্যেই তুমিও লাল হয়ে যাবে হে! এখন আমার হিসেব মিলিয়ে নাও বন্ধু—শুধু খেয়ালের ঝোঁকেই তোমাকে পার্টনার করবার প্রতিশ্রুতি দিই নি।

আমার ছোট খুকিটিকে দেখনি ত, দেখলে কিন্তু তোমার চোখে পল্লব পড়বেনা, বলতেই হবে—সবদিক দিয়ে অপূর্ব্ব মেয়ে।

তখনই ভৃত্য কানাইয়ের ডাক পড়িল। কিন্তু তাহার আসিবার পূর্ব্বেই গৃহস্বামীর চিত্তে গার্হস্থ্যধর্ম্মের ত্রুটিটুকু প্রচণ্ড আঘাত দিল। অপরাধীর মত বিচলিত ও অনুতপ্ত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন: ছি, ছি, ছি, তোমাকে পেয়ে নানা কথায় আসল ব্যাপারটাই ভুলে গেছিহে, পরের মতন ঠায় বসিয়ে রেখেছি। ট্রেণে এসেছ, হাতমুখ ধো'য়া হল না, আমার নজরই পড়েনি এদিকে—

শম্ভুনাথ বাধা দিয়া বলিলেন: সে সব পরে হবে। আগে ত তোমার মেয়েকে আনাও দেখি। মুখ হাত ধোয়া, আর মুখে কিছু দেওয়া—সে সব বাড়ীর ভিতরে গিয়ে এক সঙ্গেই সারা হবে।

রুদ্ধ দরজা ঠেলিয়া কুণ্ঠিতভাবে ভৃত্য কানাই প্রবেশ করিতেই হরপ্রসাদ বলিলেন: ছোটদিদিমণিকে নিয়ে আয় এখনি, আর বাড়ীতে বল যে—রেণুর এক কাকাবাবু এসেছেন। আমাদের জলখাবার সাজাতে বল ওপরের ঘরে, এক সঙ্গেই আমরা খাব।

কানাই চলিয়া গেলে শম্ভুনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন: মেয়ের নাম বুঝি রেণু?

হরপ্রসাদ কহিলেন: ওর মা-ই পছন্দ করে ঐ নামটি রাখেন। এই যে তার ফটো, দিন কয়েক হল তোলা হয়েছে।

একটু ঝুঁকিয়া ফরাসের সন্নিহিত টিপয় হইতে ব্রোমাইড করা ফটো খানি তুলিয়া হরপ্রসাদবাবু বন্ধুর দিকে আগাইয়া দিয়া কহিলেন: আসলের আগে নকলটাই দেখ; কেমন, পছন্দ হয়? তোমার ছেলের সঙ্গে মানাবে ত?

শম্ভুনাথ মুগ্ধদৃষ্টিতে ফটোখানি দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে অস্ফুটস্বর নির্গত হইল: 'বা:!' পরক্ষণে জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া গাঢ় স্বরে তিনি বলিয়া ফেলিলেন: আজ যদি আমার স্ত্রী থাকতেন! খোকার রূপ দেখে প্রায়ই তিনি বলতেন—'ছেলে যেমন আমার সোনার চাঁদ, তেমনি চাঁদের কণাই একটি আনবো।' সত্যি, তোমার মেয়ে চাঁদের কণাই বটে!

মুগ্ধ বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া হরপ্রসাদ কহিলেন: তাহলে তোমার ছেলেও সোনার চাঁদ বল?

মৃদুস্বরে শম্ভুনাথ উত্তর করিলেন: মুখে কি বলব বল? হ্যাঁ, তবে অতীতের পাট সব ছেড়ে এলেও একটি নিদর্শন সঙ্গেই এনেছি, এই ব্যাগেই আছে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বে রক্ষিত চামড়ার ব্যাগটি খুলিয়া শম্ভুনাথ তাহার ভিতর হইতে পূর্ব্ব ফটোখানির অনুরূপ আকৃতির একখানি ফটো বাহির করিয়া বন্ধুর হাতে দিলেন।

পরমাগ্রহে ফটোখানির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চোখ না তুলিয়াই আশ্চর্য্য হইয়া হরপ্রসাদ কহিলেন: তোমার ছেলের ফটো? য়্যাঁ, এত সুন্দর! বোম্বাই ত রূপের সহর, সেখানেও এ-রকম চেহারার ছেলে কমই নজরে পড়ে। ছেলের নাম কি হে?

শম্ভুনাথ কহিলেন: নরনারায়ণ। নামকরণটি ছেলের মা-ই করেছিলেন।

হরপ্রসাদ বন্ধুর মুখের দিকে একবার কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন: খাসা নাম। নরনারায়ণই বটে! কিন্তু এ'খানি এখন ফেরৎ পাচ্ছ না বন্ধু, এই টিপয়েই পাশাপাশি আপাতত থাকুক।—

বলিয়াই দুইখানি ফটো হস্তগত করিয়া টিপয়টির উপর সাজাইতে বসিলেন।

শম্ভুনাথ সহাস্যে কহিলেন: কিন্তু এর পরে যেন 'রিটার্ণড্ উইথ থ্যাঙ্কস্' না হয়।

মুখখানি শক্ত করিয়া অথচ দৃঢ়কণ্ঠে হরপ্রসাদ কথাটার উত্তরে বলিলেন: মুখের কথা আমার কোনদিন পাল্টায় নি শম্ভু, তাহলে আমার কারবারের বনেদটা এমন শক্ত হত না। আমি জোর গলায় বলছি: এই ছেলেই রেণুর বর।

টিক—টিক—টিক! জানালার সার্সির উপর হইতে একটা টিকটিকি ডাকিয়া উঠিল। হর্ষ-বিস্ময়ে দুই বন্ধু দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। দুইটি অপূর্ব্ব বালক বালিকার সম-আয়তনের দুইখানি আলেখ্য টিপয়টির উপর পাশাপাশি রাখিয়া উল্লাসের সুরে হরপ্রসাদ কহিলেন: তোফা মানিয়েছে দু'টিটে, দেখ শম্ভু—চেয়ে দেখ!

পরক্ষণে কানাই সবেগে কক্ষমধ্যে আসিয়া সরোদনে সংবাদ দিল: সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবু, ছোট দিদিমণিকে পাওয়া যাচ্ছে না; গিন্নীমা কাঁদতে লেগেছেন, আপনি শীগ্‌গীর ভেতরে চলুন।

দুই বন্ধুই উদ্বিগ্নভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু উঠিবামাত্র শম্ভুনাথের মাথাটি হঠাৎ এমনি ঘুরিয়া গেল যে, টাল সামলাইতে না পারিয়া তিনি কাত হইয়া ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন। হরপ্রসাদের চীৎকারে তৎক্ষণাৎ লোক জন সব ছুটিয়া আসিল। তাহাদের সাহায্যে শম্ভুনাথের সংজ্ঞাহীন দেহটি তুলিয়া সেই ঘরেই আস্তৃত ফরাসের উপর সন্তর্পণে রাখা হইল। হরপ্রসাদ আর বাহিরে না গিয়া বন্ধুর শিয়রে বসিলেন। কানাইকে ডাকিয়া নির্দ্দেশ

দিলেন: গাড়ী নিয়ে মুখুজ্জ্যে সাহেবের বাঙলোয় যাও। বাংলোয় না থাকেন হাসপাতালে যাবে। তাঁকে আনা চাই-ই।

দরোয়ান আতরসিং ও রঘুসিংকে হুকুম দিলেন: খুকির সন্ধানে দু'জনে বেরোও, এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে খুঁজে আনা চাই।

বাড়ীর সর্ব্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্যের একটা রীতিমত সাড়া পড়িয়া গেল, চারিদিকে লোক ছুটিল। সবার মুখে এক কথা—রেণু, রেণু!

(৫)

হরপ্রসাদবাবুর বাড়ীতে যখন এই বিভ্রাট চলিয়াছে, সেই সময় সিদ্ধাশ্রমের সাধুজীর কক্ষে লালাজী অপূর্ব্ব এক বালিকার হাত ধরিয়া প্রবেশ করিলেন। শম্ভু আসিয়া পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়ায়, স্বামীজী গ্রন্থখানি মুড়িয়া রাখিয়া বোধ হয় প্রতীক্ষাই করিতেছিলেন। মেয়েটির মুখখানির উপর দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার সমস্ত দেহটি যেন মোচড় দিয়া উঠিল, বালিকার মুখখানির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: এই মেয়ে? এরই কথা বলেছিলে তুমি! কিন্তু এ যে···

স্বামীজীর ব্যগ্র কণ্ঠের চঞ্চল স্বর লালার চিত্তেও একটা প্রচণ্ড দোলা দিল। স্বামীজী সম্ভবত নিজের দুর্ব্বলতাটুকু উপলব্ধি করিয়া বাক্য সংযত করিলেন, দেহটিকে আরও সোজা করিয়া প্রতিমার মত দণ্ডায়মান মেয়েটির পানে বদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

লালাজী এই সময় জিজ্ঞাসা করিলেন : একি আপনার চেনা ?

চমকিয়া স্বামীজী বলিলেন : না-না-না, এ নয় ; তবে—এই মুখ, ঐ চোখ, ঐ নাক, ঐ চুল—এখনো আমার চোখের ওপর যেন ভাসছে। কোথা থেকে একে আনলে লালা ?

কিন্তু লালাকে কোন উত্তর দিবার অবসর না দিয়া মেয়েটি তাহার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়া বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল : কই, বাঘ ত দেখালে না ?

বালিকার মধুর কণ্ঠস্বরও বুঝি স্বামীজীর কাণে পুরাতন কোন পরিচিত কণ্ঠের সুরের মত মৃদু ঝঙ্কার দিল। কিন্তু এবার তিনি সবলে চিত্তকে সংযত করিয়া লালাজীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইতেই লালাজী তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন : বাঘ দেখাবে বলেই একে……

চোখের ইঙ্গিতে লালাকে এখানেই নিরস্ত করিয়া স্বামীজী মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন : বাঘ খুঁজছ খুকী, বাঘ ?

বালিকা এই গম্ভীর মূর্ত্তি দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফধারী মানুষটির দিকে মুখখানা ফিরাইয়া বলিল : হ্যাঁ। বাঘ দেখাবে বলেই ত সেই মিন্‌সেটা আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে।

লালাজী হাসিয়া কহিলেন : সে ঠিক এনেছে, বাঘের ঘরেই ত তুমি এসেছ।

বালিকা এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল : কেবলি ত বাঘ বাঘ করছ, কিন্তু বাঘ কোথায়।

কথাটা বলিয়াই সে স্বামীজীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল : তুমি দেখাবে আমাকে বাঘ ?

স্বামীজীর চোখ দুটি যেন জলিয়া উঠিল, শ্মশ্রুল মুখখানাতেও বুঝি তাহার আলো পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর স্বর বাহির হইল : দেখাবো। কিন্তু তুমি কি সত্যিই এখনো বাঘ দেখতে পাওনি ?

দৃঢ়স্বরে বালিকা কহিল : না।

স্বামাজী : দেখতে পাচ্ছ না ?

বালিকা : না। বাঘ কোথায় ?

স্বামীজী : ভয় পাবে না ?

বালিকা : না। তাহলে আসি ? বল না বাঘ কোথায়—আমি দেখবো ?

নিজের বড় বড় দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি যতদূর সম্ভব দীপ্ত করিয়া স্বামীজী বালিকার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর গম্ভীরস্বরে কহিলেন : বাঘ—আমি,—হুম !

শেষের শব্দটি যেন ব্যাঘ্র-গর্জ্জনের মতই ভীষণ শুনাইল। কিন্তু মুখে তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করিয়া বালিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার পর কহিল : দূর ! তুমি ত সাধু। বাঘের ছালের ওপর বসে আছ বলেই বাঘ হয়ে গেলে ! যাও, তোমাদের আর বাঘ দেখতে হবে না, আমি বাড়ী যাব, আমাকে নিয়ে চলো।

স্বামীজী বলিলেন : কি হবে বাড়ী গিয়ে, তুমি এখানেই থাকবে।

অনুপম ভুরু দুটি বাঁকাইয়া বালিকা কহিল : ব'য়ে গেছে আমার এখানে থাকতে। আমি বাড়ী যাবো ; কি সুখে এখানে থাকবো ?

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন : কেন, আমি কি মন্দ ?

মুখখানি বিকৃত করিয়া বালিকা উত্তর দিল : তুমি ত একটা সঙ! আচ্ছা, তোমার ঐ দাড়িটাও ঝুটো ত ?

স্বামীজীর বিস্ময় বুঝি ক্রমশঃই সীমা অতিক্রম করিতেছিল। প্রথম দর্শনেই যাহার আকৃতি তাঁহার চিত্ত-পটে অঙ্কিত কোন চিত্রের সাদৃশ্যে চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার কণ্ঠনিঃসৃত তীক্ষ্ণ-মধুর বাণী দূর অতীতের কোন অতিপরিচিত সুরের রেসটি নূতন করিয়া শ্রবণ-তন্ত্রিতে ঝঙ্কার দিয়াছিল, যাহার চমকপ্রদ ভঙ্গি পারিপার্শ্বিক বিসদৃশ অবস্থার মধ্যেও চিত্তগত স্বাভাবিক নির্ভীকতার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া তাঁহার অন্তর্নিবেশিত আলেখ্যটির প্রচ্ছদপট উদ্ঘাটিত করিতে চাহিতেছে, তাহাকে তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, কোন পর্য্যায়ে আনিয়া আলাপ করিবেন তাহার সঙ্গে ? এই সাদৃশ্যের মূলে কোন্ রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কে জানে !

বালিকা কণ্ঠস্বর আরো তীক্ষ্ণ করিয়া কহিল : চুপ করে রইলে যে ! তাহলে তোমার দাড়ীটাও ঝুটো ত ?

স্বামীজীকে এবার উত্তর দিতে হইল ; কহিলেন : ঝুটো কেন হবে, আসল।

আবার মুখখানা বিকৃত করিয়া বালিকা কহিল : আসল না ছাই !

লালাজী কহিলেন : দাড়ী কখন ছাই হয় ?

বালিকা তাহার অনিন্দ্যসুন্দর প্রতিভাদৃপ্ত মুখখানি তুলিয়া বলিল : পুড়িয়ে দিলেই ত ছাই হয়ে যায়। তা বুঝি জাননা, সেদিন একটা সাধু এসেছিল আমাদের বাড়ীতে ; দিব্যি ত খেলে দেলে, তার পরে করলে কি জান—চুপি চুপি দাড়িটা খুলে আবার মুখে বসিয়ে দিলে ; আমি যে ঘরের কোণটিতে বসে আছি

তা ত আর জানে না, তখুনি ধরা পড়ে গেল। তারপর যে খোয়ার তার কি আর বলবো। কানাই ত দাড়িটা কেড়ে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে। তার পর মাথার জটা ধরে টানাটানি—সেগুলোও ঝুটো। লোকটাকে মেরেই ফেলতো, মা এসে বাঁচিয়ে দিলে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চাহিয়া স্বামীজী তাহার কথাগুলি শুনিতেছিলেন। এই সময় সহসা প্রশ্ন করিলেন: তোমার মা আছে?

বালিকা তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া নিজেই প্রশ্ন করিল: তোমার দাড়িটাও ত সেই লোকটার মতন ঝুটো—আচ্ছা দেখি। কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিদ্যুদ্বেগে স্বামীজীর সম্মুখে গিয়া দুই হাতে তাঁহার দাঁড়ি ধরিয়া সজোরে টান দিল। স্বামীজী প্রত্যাশা করেন নাই যে মেয়েটি সত্যই এতটা বাড়াবাড়ি করিবে। এই বয়সের বালিকার হাতের টানে তাহার দৈহিক শক্তির যে সন্ধানটুকু ধরা পড়িল তাহাতে বিমুগ্ধ হইলেও তাঁহার অজ্ঞাতসারে আর্ত্তস্বর বাহির হইল: উঃ!

লালাজী তাড়াতাড়ি সজোরে বালিকার হাত দুটি চাপিয়া দাড়িটা ছাড়াইয়া দিলেন এবং পরক্ষণে তাহার এই স্পর্দ্ধার জন্য মুক্তাখচিত আভরণযুক্ত কানটি ধরিতেই বালিকা দুই চোখ পাকাইয়া তর্জ্জনের সুরে কহিল: খবরদার বলচি।

স্বামীজী উল্লাসের সুরে বলিয়া উঠিলেন: থামো লালা, থামো। আমি খুব খুসি হ'য়েছি, খাসা মেয়ে তুমি এনেছ। যা চেয়েছিলাম, তার চেয়ে অনেক—অনেক উঁচু, অপূর্ব্ব, অদ্ভুত

কথার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া স্বামীজী স্নেহের সুরে বলিলেন: দেখলে ত খুকী, দাড়ি আমার নকল নয়, আসল; আর আমি সঙ নই, মানুষ।

বালিকা পূর্ব্ববৎ নির্ভীক কণ্ঠেই কহিল: মানুষ হলেও সঙ। রামলীলার লোকেরা ত এমনি সঙ সাজে। আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার দাড়ির যা গন্ধ, মাগো!

স্বামীজী পুনরায় চমকাইয়া উঠিলেন। ঠিক এই ভাবে আর এক দিন আর একজন এমনই করিয়াই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে তাঁহার রুচির বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর দুইটি যুগ কালসমুদ্রে তলাইয়া গিয়াছে এতকাল পরে কে আসিল তাঁহার রুচির উপর পুনরায় সংস্কারের আঘাত দিতে? সেদিন গ্রাহ্য করেন নাই, আজ কিন্তু অগ্রাহ্য করিবার কোন শক্তি তাঁহার বিরাট বপুর কোন অংশে কি সচেতন আছে? ভাবাদ্রকণ্ঠে স্বামীজী কহিলেন: দাড়ি যদি তোমার পছন্দ না হয়, দাড়ি এর পর রাখবই না।

বালিকা তাঁহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অস্থির ভাবে কহিল: ছেড়ে দাও আমাকে, আমি বাড়ী যাব।

লালাজী এই সময় কহিলেন: বাঘ না দেখেই যাবে?

পটলচেরা দুটি অপূর্ব্ব আয়ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া লালাজীর পানে চাহিয়া বালিকা কহিল: তোমরা সবাই মিথ্যুক, বাঘ আছে না ছাই আছে, খালি খালি আমাকে ভুলিয়ে এনেছ, আমি বাঘ দেখতে চাই না।—বলিয়াই সে স্বামীজীর হাত ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু স্বামীজী তাহাকে সে সুযোগ না দিয়া অতিশয় কোমল সুরে

কহিলেন: ওরা মিথ্যুক হলেও আমি কিন্তু মিথ্যুক হব না, আমি বলছি, বাঘ দেখা ত ছোট কথা, তোমাকে বাঘের পীঠে চড়িয়ে তবে ছাড়ব।

বালিকা এবার হাসিয়া ফেলিল, তাহার এই বিচিত্র হাসির ঝলকটিও স্বামীজীকে বিহ্বল করিয়া দিল। বালিকা কহিল: আমি কি জগদ্ধাত্রী ঠাকুর যে বাঘের পীঠে চড়বো?

দৃঢ়স্বরে স্বামীজী কহিলেন: হ্যাঁ, আমি তোমাকে জগদ্ধাত্রীই তৈরী করব, দেখো।

বালিকা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু স্বামীজী তাহার বিস্ফারিত চোখ দুটির উপর নিজের বিচিত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন: তোমার সঙ্গে এত কথা হল, এমন ভাব হয়ে গেল, কিন্তু নামটি ত শোনা হল না! তোমার নামটি বলবে না?

বালিকা কহিল: কেন বলব না? তুমি কি নাম জিজ্ঞাসা করেছিলে? আমার নাম রেণু।

স্বামীজী: রেণু! বাঃ—মিলে যাচ্ছে ত, তার ছিল নাম—অনু!

বালিকা: কার কথা বলছ? ও নাম ত আমার মায়ের গো! জাননা বুঝি, আমার মায়ের নাম—শ্রীমতী অনুপমা।

স্বামীজী: অনুপমা! তুমি অনুপমার কন্যা? খুকি, খুকি, না-না—রেণু-রেণু, হ্যাঁ, আর তোমার বাবার নাম—বল বল, কি তার নাম?

বালিকা: কেন, আমার বাবার নাম শোননি, সবাই ত জানে। তাঁর নাম—শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ ঘোষ।

যে দুটি হাত দিয়া বালিকাকে নিবিড়ভাবে এতক্ষণ ধরিয়া

রাখিয়াছিলেন স্বামীজী, সেই দুইখানি হাত সবলে উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া গাঢ়স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন : যাদৃশী ভাবনা যস্য-সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। সিদ্ধাশ্রম এবার সিদ্ধপীঠ হবে লালা, আর চিন্তা নেই। সিদ্ধির বীজমন্ত্র আমি পেয়েছি তোমারই কল্যাণে।

পরক্ষণে বালিকাটির উদ্দেশে হাত বাড়াইতেই দেখিলেন, বালিকা ইতিমধ্যে মুক্তি পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং স্বামীজীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথাগুলির অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহাকে দেখিতেছে।

স্বামীজীকেও অগত্যা উঠিতে হইল এবং উঠিতে উঠিতেই দুই চোখ দিয়া হাসির একটা তীক্ষ্ণ ঝলক তুলিয়া কহিলেন : সঙ দেখ... ? কিন্তু এর পর তোমাকেও সঙ সাজতে হবে, সব যাবে উ... রেণু ব'লে পৃথিবীতে কেউ থাকবে না।

বালিকা মুখ ফিরাইয়া লালাজীর পানে তাকাইয়া কহিল : আমি বাড়ী যাব! যদি ভাল চাও ত, আমাকে বাড়ীতে নিয়ে চল বলছি।

স্বামীজী নিকটে আসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বিচিত্র স্বরে কহিলেন : কিছু ত খাও আগে, তার পরেই ঘুমুবে। ঘুম ভেঙ্গে গেল আর বাড়ীর কথা মনে থাকবে না।

বলিতে বলিতেই তিনি সহসা বালিকাকে সবলে ধরিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু বালিকা এজন্য প্রস্তুত ছিল না এবং তাঁহার স্নেহবন্ধনে ধরা দিতেও চাহিল না, হাত পা নাড়িয়া চীৎকার তুলিল : বাড়ী যাব, আমি বাড়ী যাবো।—ঠিক এই সময় হরপ্রসাদবাবুর অনুচরবর্গ প্রভুকন্যার অনুসন্ধানে সমগ্র প্রয়াগ সহর তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছিল।

(৬)

শ দিনের পর শম্ভুনাথ সংজ্ঞা পাইলেন, কিন্তু স্মৃতি ও বোধশক্তি রাইয়া মানুষ ও পশুর মাঝামাঝি এক অদ্ভুত জন্তুরূপে এই শোকার্ত্ত রিবারটিকে রীতিমত ভয়ার্ত্ত করিয়া তুলিলেন। দীর্ঘ নিদ্রার পর সা জাগ্রত হইয়া তিনি যেন এক অপরিচিত জগতে আসিয়া ড়িয়াছেন। সেখানে সবাই নূতন, পূর্ব্ব-স্মৃতির সহিত কোন কিছুরই ন কিছুমাত্র যোগাযোগ নাই। কাহারও কথা তিনি বুঝিতে ারেন না, নিজেও মুখভঙ্গি করিয়া যাহা বুঝাইতে চান, অন্যের ক্ষে তাহা দুর্ব্বোধ্য। এই দীর্ঘ একুশটি দিন ধরিয়া হরপ্রসাদের াস্তির সংসারে দুর্ভোগের যেন তাণ্ডব নৃত্য চলিয়াছে। যে মেয়েটির পূর্ব্ব রূপের আলোকে এবং তাহার অনন্য সাধারণ প্রতিভার ঝলকে মগ্র বাড়ীখানি ঝলমল করিত, তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। পাঁচ ছর বয়সেই অতিরিক্ত বাড়ন্ত ও দুরন্ত হইয়া এবং আশঙ্কার গণ্ডি াটাইয়া যে কিশোরীদের সহিত পাল্লা দিয়া খেলাধূলা করিত, গায়ের জোরে স্পষ্ট কথার তোড়ে প্রত্যেককে নাকাল করিয়া ছাড়িত, আর এইগুলিই প্রধান আকর্ষণরূপে পরিজনদিগকে সর্ব্বদা তটস্থ করিয়া রাখিত, তাহার অভাবে সমস্তই যেন মুসড়াইয়া পড়িয়াছে। আর সে কল-হাসির উচ্ছ্বাস উঠে না, রেণুকে সামলাইবার জন্য তাড়াহুড়াও নাই, বালক-বালিকাদের ভিতর হইতে রেণুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেও আর কেহ ছুটিয়া আসে না, সব নিস্তব্ধ। ছোট একটি বালিকার যে এতখানি প্রতাপ ও প্রভাব বাড়ীখানিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল,

তাহার উপস্থিতিতে কেহ বুঝি উপলব্ধি করিতে পারে নাই, আজ যেন সব ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

রেণুর মা অনুপমাও একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। কোলের এই মেয়েটির আশ্চর্য্য রকমের সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়া তাঁহার বুকের ভিতর যেন ছাঁৎ করিয়া উঠিত, মেয়েটির মুখের কথা তাঁহাকে যখন থ করিয়া দিত, তিনি তখন গালে হাত দিয়া ভাবিতেন—এ মেয়ে কি বাঁচবে ব'লে এসেছে, আমি কি ওকে ধরে রাখতে পারবো?

কাজেই, কিছুক্ষণ রেণুকে দেখিতে না পাইলে মায়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিত, তখনই চাকর-দাসীদের উপর তাড়া দিতেন, কখন বা নিজেই ছুটিতেন—রেণু কোথায় গিয়াছে, কি করিতেছে, তাহার খবর লইতে। মায়ের এই সতর্কতা দেখিয়া মেয়ে হাসিয়া বলিত,—মা যেন কি? একটু যদি চোখের আড়াল হয়েছি, আর রক্ষে নেই—অমনি রেণু, রেণু!

মা দুই হাতে মেয়েকে বুকে তুলিয়া আদর করিয়া বলিতেন—আগে বড় হ, তখন বুঝবি এর মর্ম্ম। তুই যখন মা হ'বি, কোলে তোর এমনি মেয়ে হবে, তুইও এমনি করেই হেদোবি।

মেয়ে অমনি মুখখানা মচকাইয়া ভুরু দুটি নাচাইয়া বলিত—হুঁ, আমি সেই মেয়ে কি না? ও-সব বাজে কথা ব'ল না বাপু!

এইভাবে যখন-তখন মায়ের সঙ্গে মেয়ের কত কথাই হইত। মেয়ের কচি মুখের পাকা কথায় মায়ের মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠিত, আর সেই সঙ্গে একটা অজানা আশঙ্কাও যেন আস্তে আস্তে উঁকি দিত।

সেই মেয়েকে হারাইয়া অনুপমার অবস্থা যে কি রকম শোচনীয় হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। একুশ দিনেই তাঁহার বয়স যেন একুশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। নিখুঁত রূপ ও অপরূপ সৌন্দর্য্য অবিশ্রান্ত বারিপাতে বিপর্য্যস্ত স্থলপদ্মের মত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। সময়ে আহার নাই, চোখের পাতায় নিদ্রার ছায়া পড়েনা, সমাধানহীন একটা দুশ্চিন্তা তাহাদের স্থান পূরণ করিয়াছে।—কোথায় গেল তাঁহার চোখের মানিকটি, কে লইয়া গেল, কোথায় গিয়া লুকাইয়া আছে, কি করিতেছে, আর কি তাহাকে চোখেও দেখিতে পাইবেন না, কি পাপে এত বড় শাস্তি তিনি পাইলেন? এমনই কত প্রশ্নই পর পর মনের মধ্যে উঠিতে থাকে, সেই সঙ্গে তীব্র একটা বেদনায় সারা দেহ যেন মোচড় দিয়া উঠে।

গৃহস্বামী হরপ্রসাদ বাবু সংযমী পুরুষ, মরণাপন্ন বন্ধুর দিকে চাহিয়া তিনি এ বেদনা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের পরিচিত বন্ধুর জন্য তিনি চিকিৎসার যে রাজসূয় আয়োজন করিলেন তাহা পরিচিত ও অপরিচিত সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিল।

শম্ভুনাথ যেদিন প্রথম চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, হরপ্রসাদের মনে হইল তাঁহার বিপুল অর্থব্যয় এবং চিকিৎসকদের প্রচুর প্রয়াস সার্থক হইয়াছে। নিরুদ্দিষ্টা কন্যার সন্ধান পাইলেও তিনি বোধ হয় এতটা তৃপ্তি পাইতেন না। কিন্তু পরে যখন প্রকাশ পাইল যে, বন্ধুর স্বাভাবিক বোধশক্তির সহিত পূর্ব্বস্মৃতি সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া প্রাণশক্তিটুকু শুধু তাঁহার জড়দেহটিকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং চিকিৎসকগণও যখন এক বাক্যে জানাইলেন যে, এই ভাবেই তাঁহাকে জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে, তখন হরপ্রসাদ আর্ত্তস্বরে না বলিয়া পারিলেন না—'তার চেয়ে কেন একে তুলে নিলে না, ভগবান!'

তথাপি তিনি একেবারে হাল ছাড়িয়া না দিয়া বন্ধুর আরোগ্যের আশায় বহুব্যয়সাধ্য বৈদ্যুতিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। অল্পদিনেই তাহাতে আশ্চর্য্যরকম ফলও দেখা গেল। শম্ভুনাথের মুখে বাণী ফুটিল, তবে তাহা সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ নহে, একটি মাত্র একারযুক্ত শব্দ তাঁহার মুখ দিয়া যেন আর্ত্তনাদের মত বাহির হইল ; শব্দটি হইতেছে— রে !

হরপ্রসাদ ভাবিলেন, মুখ দিয়া কিছু যখন বাহির হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে তাঁর স্বাভাবিক অবস্থাই ফিরিয়া আসিবে। মুখ ক্রমশঃ মুখর হইল বটে, কিন্তু মুখের ঐ শব্দটির কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না, অর্থাৎ 'রে' ভিন্ন অন্য কোন শব্দ যে আছে—সে সম্বন্ধে শম্ভুনাথ যেন একেবারে অজ্ঞ। তাঁহার কণ্ঠের শক্তি যতই বাড়িতে লাগিল, এই একই শব্দটি সেই অনুপাতে পুষ্ট হইয়া সকলকেই যেন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। প্রায় সর্ব্বক্ষণই তাঁহার কণ্ঠ দিয়া ধ্বনি বাহির হইতে থাকিল—রে—রে—রে !

ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকৃতিও যেন অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যে, তিনি যেন কি একটা হারানো জিনিস খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন—সে জিনিসটি যেন গৃহমধ্যেই কোথাও প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এখন এই মানুষটিকে দেখিলেও যেন কষ্ট হয়। পূর্ব্বের সেই মূর্ত্তির কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই হইয়াছে ! চৌকোভাবে সন্তর্পণে ছাঁটা মুখের সুদৃশ্য দাড়ি উপযুক্ত প্রসাধনের অভাবে কদর্য্য ও বিশ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে,মাথার ঘন ঘন কোমল চুলগুলি রুক্ষ ও ঝাঁকড়া হইয়া মুখের শোভা নষ্ট করিয়া দিয়াছে, চোখের যে স্নিগ্ধ দৃষ্টি অপরিচিতকেও আকৃষ্ট করিত, এখন তাহা সুপরিচিতের মুখেও নিবদ্ধ হইলে তাহাকে যেন শঙ্কিত ও আড়ষ্ট করিয়া তুলে। মনে হয়—রক্তাভ তারা দুটি যেন অগ্নিগোলকের মত ছুটিয়া আসিতেছে। চোখে এখন চশমারও কোন বালাই নাই।

পরিচারকদের কেহই এ অবস্থায় এই অপ্রকৃতিস্থ ভয়াবহ মানুষটির ত্রিসীমায় ঘেঁসিতে সাহস করে না। ঘরে কাহাকেও ঢুকিতে দেখিলেই শম্ভুনাথের চাঞ্চল্য প্রবল হইয়া উঠে, বিছানার উপর বসিয়া দুই চক্ষু পাকাইয়া আগন্তুকের পানে তাকাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠেন—রে-রে-রে ?

মুখের এই শব্দের অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন—কি বলছেন ? কাকে চান ? অমনই তাঁহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠে, মুখখানাও সেই সঙ্গে এমনই বিকৃত ও বীভৎস হইয়া উঠে যে, প্রশ্ন শুনিয়া পলাইবার পথ পায় না। কিন্তু হরপ্রসাদ বন্ধুর মুখের এই শব্দটির অর্থ একদিন আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন।

উত্থানশক্তি পাইলেও প্রকৃতিস্থ না হওয়ায় শম্ভুনাথকে বাহিরের ঘর-খানির ভিতরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। লৌহ-খাঁচার ভিতরে এক একটা বাঘকে যেভাবে অবিশ্রান্ত গতিতে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরা ফিরা করিতে দেখা যায়,ঠিক সেইভাবেই শম্ভুনাথ রুদ্ধ বৃহৎ ঘরখানির ভিতর অস্থিরভাবে ক্রমাগত পায়চারী করেন। অথচ ঘরের বাহিরে আসিবার কোন আগ্রহ তাঁহার আচরণে প্রকাশ পাইত না। আহারের সময় হরপ্রসাদ নিজে আসিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দিতেন, কাছে বসিয়া বন্ধুর ভোজনে সাহায্য করিতেন, তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য নানা প্রসঙ্গ তুলেন, কিন্তু বন্ধুর তরফ হইতে—রে-রে— শব্দ ছাড়া কোন উত্তরই পান না।

ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া বন্ধুর ভোজনাদি যাহাতে সম্পন্ন হয় হরপ্রসাদ সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন এবং স্বয়ং নিকটে বসিয়া তাঁহাকে খাওয়াই-তেন। বেলা ঠিক তিনটার সময় জলযোগে বিবিধ ফলের ব্যবস্থা থাকিত।

সেদিন শম্ভুনাথ যথারীতি জলযোগে বসিয়াছেন, হরপ্রসাদ তাঁহার সম্মুখে বসিয়া সে সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিতেছিলেন। আহারে শম্ভুনাথের কোনরূপ আগ্রহ নাই, নানাভাবে অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছিলেন, আর হরপ্রসাদ বিপুল ধৈর্য্যের সহিত এই অস্থির ও অপ্রকৃতিস্থ মানুষটির জীবনরক্ষার উপাদানগুলি যোগাইবার ব্যবস্থায় অবহিত ছিলেন। এমন সময় অন্দরমহল হইতে গৃহিণীর আর্ত্তস্বর সমস্ত বাড়ীখানাকে কাঁপাইয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল: আর যে স্থির হয়ে থাকতে পারছি না গো—রণুরে···

হাতের ফলটি ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিলেন শম্ভুনাথ, মুখখানা বিকৃত করিয়া এবং দুই চক্ষুর প্রখর দৃষ্টিতে প্রশ্ন ভরিয়া বলিয়া উঠিলেন: রে রে রে?

হরপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং বন্ধুর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন: তবে কি তুমি এমনি করে রেণুকেই খোঁজ শম্ভু? তোমার মনের হাহাকার কি ঐ কথাটার ভিতর দিয়েই ফুটে বেরুচ্ছে ভাই?

শম্ভুনাথ এবার নীরবে বন্ধুর পানে চাহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি এখন শান্ত, স্থির, মর্ম্মস্পর্শী। হরপ্রসাদের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, আর্ত্তস্বরে তিনি বলিলেন: রেণু হারিয়ে গেছে। সমস্ত সহর তোলপাড় করেও তাকে পাইনি। দেশের সমস্ত কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি—সন্ধান দিলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেব। কিন্তু কোন খবরই এ পর্য্যন্ত আসেনি। কে জানে, সে আছে কি নেই!

স্থির হইয়া শম্ভুনাথ বন্ধুর পানে এতক্ষণ চাহিয়াছিলেন। এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে এরূপ স্থিরতা তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় এই বোধ হয় প্রথম দেখা গেল। হরপ্রসাদ বুঝিলেন যে, সংজ্ঞাশূন্য হইবার পূর্ব্বক্ষণেই

শম্ভুনাথ রেণুর নিরুদ্দেশবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন, সংজ্ঞালাভের পর সেই চিন্তাটিই তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে একটা আলোড়ন তুলিয়াছিল, তাহার ফলেই রেণুর নামের আদ্যক্ষরটি তাঁহার মর্ম্মদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া মুখ দিয়া ঐভাবে পুনঃ পুনঃ নির্গত হইয়া থাকে।

কিন্তু হরপ্রসাদের কথাগুলি শম্ভুনাথ উপলব্ধি করিলেন কিনা তাহা ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া তিনি ঘরের প্রান্তভাগে রক্ষিত ক্ষুদ্র টিপয়টি লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া গেলেন। এখন আর মুখে সেই—রে—রে শব্দ নাই। তবে বিস্ফারিত দুটি চক্ষুর ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, তিনি যেন শূন্য টিপয়ের উপরে কোন কিছু বাঞ্ছিত বস্তুর অন্বেষণ করিতেছেন।

ঝাঁ করিয়া অমনি হরপ্রসাদের স্মৃতিদ্বার যেন খুলিয়া গেল। এই টিপয়টির উপরেই ত তিনি সেই সাংঘাতিক দিনে তাঁহার কন্যা রেণু ও শম্ভুনাথের পুত্র নরনারায়ণের আলেখ্যদ্বয় পাশাপাশি সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শম্ভুনাথের অসুখের সময় ঘরের অতিরিক্ত কতকগুলি জিনিসপত্রের সহিত ছবি দুইখানিও স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সংজ্ঞালাভের পর প্রথম উত্থানশক্তি পাইয়া শম্ভুনাথ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন। একটা ফুলদানি তিনি কক্ষতলে আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন, রূপার একটা ডিবা গবাক্ষপথে বাহিরে নিক্ষেপ করেন। অতিকষ্টে হরপ্রসাদ তাঁহাকে শান্ত করেন, পরে ঔষধের সাহায্যে কোনরূপে নিদ্রাচ্ছন্ন করা হয়। খুচরা জিনিসগুলির সহিত ছবি দুইখানি হরপ্রসাদ বাবু তাঁহার শয়ন কক্ষে স্থানান্তরিত করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। সেগুলি এই কক্ষে যথাস্থানে আনিয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আজ প্রায় একই সময়ে শম্ভুনাথের মুখের বাণী 'রে' শব্দটির অর্থ

বোধের সঙ্গে সঙ্গে টিপয়টির উপর ঝুঁকিয়া তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির রহস্য-টুকুও হরপ্রসাদবাবুর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, সংজ্ঞালাভের সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুনাথের বিশৃঙ্খল মস্তিকের মধ্যে টিপয়ের উপর পাশাপাশি রক্ষিত সেদিনের সেই ছবি দুইখানির চিন্তাই জট পাকাইয়াছে এবং মানস-পটে রূপায়িত ছবির দুইখানি মুখ দৃষ্টির পরিধিমধ্যে পাইবার জন্যই তাঁহার এই চাঞ্চল্য, আকুলি-ব্যাকুলি এবং অস্থিরতা।

এই সঙ্গে সহসা হরপ্রসাদের মনে পড়িয়া গেল যে, শম্ভুনাথ সুদৃশ্য একটি গ্লাডষ্টোন ব্যাগ সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সেটিও কক্ষ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ব্যাগের মধ্যে আবশ্যক কাগজপত্রের মধ্যে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের ঠিকানা থাকা সম্ভব এবং এ সময় তাহার প্রয়োজনও যথেষ্ট ইহা উপলব্ধি করিয়া তিনি ভৃত্য কানাইকে ডাকিয়া ব্যাগটি আনিবার আদেশ করিলেন। একটু পরেই কানাই ব্যাগটি আনিয়া বিছানার উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

ব্যাগটির দিকে শম্ভুনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে হরপ্রসাদ কহিলেন: তোমার ব্যাগ এসেছে শম্ভু। এর চাবিটি কলেই লাগানো ছিল, আমি বন্ধ করে কাছেই রেখেছি।

বলিয়াই তিনি ফতুয়ার পকেট হইতে ছোট চাবিটি বাহির করিয়া ব্যাগের কলে লাগাইয়া দিলেন।

টিপয়টি ধরিয়া শম্ভুনাথ দাঁড়াইয়াছিলেন। হরপ্রসাদের কথাগুলি শুনিয়া তাঁহার দিকে ফিরিলেন, কিন্তু বিছানার উপর রক্ষিত ব্যাগটি যে তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে তাহার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

হরপ্রসাদ প্রশ্ন করিলেন : ব্যাগটি খোলবার দরকার হয়েছে, তোমার ছেলে আর তার মামার ঠিকানা আমি চাই। ব্যাগের মধ্যে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে—কি বল? তুমি কি নিজেই খুলতে চাও, না আমি খুলব হে?

শম্ভুনাথের উদাস দৃষ্টি এবার প্রখর হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে টলিতে টলিতে তিনি প্রসারিত ফরাসের উপর হরপ্রসাদের পার্শ্বেই আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। পরক্ষণে ব্যাগটি বন্ধুর হাত হইতে সজোরে ছিনাইয়া লইলেন। তাঁহার দুই চক্ষুর দীপ্তি অস্বাভাবিকভাবে যেন জ্বলিয়া উঠিল, বহুক্ষণ পরে কণ্ঠস্বর পুনরায় সরবে বাহির হইল—রে-রে-রে?

হরপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ ফরাস হইতে উঠিয়া সহাস্যে কহিলেন : বেশ, তুমিই ব্যাগটি খুলে তোমার ছেলের ঠিকানাটি খুঁজে দেখ; আমি তাকে এখানে আনবো স্থির করেছি। শীগ্‌গীর সেটা বা'র ক'রে ফেল ভাই, আমি আসছি।

ছবি দুইখানির কথা হরপ্রসাদের মনে যেন খোঁচা দিল এই সময়, উপরের ঘর হইতে স্বহস্তে আনিয়া বন্ধুর মুখে হাসি ফুটাইবার অভিপ্রায়ে তিনি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেলেন। ঘরের দরজা খোলাই পড়িয়া রহিল।

হরপ্রসাদের প্রস্থানের পরই শম্ভুনাথ এক কাণ্ড বাধাইয়া বসিলেন। নিজের ব্যাগটির ভিতর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও যখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর কোন সন্ধান পাইলেন না তখন তাঁহার মাথায় খুন চাপিয়া গেল। সারা দেহটির ভিতর দিয়া চাঞ্চল্যের একটা প্রবাহ বহিল এবং তাহার আবেগে তিনি ক্ষিপ্তের মত লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার দুই চক্ষুর অস্বাভাবিক দৃষ্টি অত্যুগ্র হইয়া যেন উপযুক্ত ইন্ধন খুঁজিতে লাগিল। হাতের কাছে গ্রহণ যোগ্য অপর কিছু না পাইয়া ব্যাগটিই শুভ্র

আস্তরণ-মণ্ডিত বিছানাটির উপর উপুড় করিয়া দিলেন। কাপড়, জামা, কেতাব, খাতা ও কাগজ-পত্রের একটা ক্ষুদ্র স্তূপ বিছানাটির উপর মাথা তুলিয়া কিঞ্চিৎ উচুঁ হইয়া উঠিল। এই সময় পার্শ্বের শ্বেতপাথরের আধারটির উপর রক্ষিত সিগারেটের সুদৃশ্য টিন এবং দিয়াশালাইয়ের বাক্সটির উপর পাগলের দৃষ্টি পড়িল। আর যায় কোথায়, এই ক্ষুদ্র বাক্সটির ভিতরে সুরক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালোমুখ কাঠিগুলির অগ্ন্যুৎপাদনের শক্তি তাঁহার চিত্তবৃত্তিকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে টেবিল হইতে ম্যাচ বাক্সটি বুভুক্ষু চীলের মত ছোঁ মারিয়া লইলেন, তাহার পর পরমোল্লাসে কাঠির পর কাঠি জালিয়া বিছানায় স্থাপিত সেই ক্ষুদ্র স্তূপটির উপর ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কাঠিগুলি দাহিকাশক্তির বিকাশ করিয়া স্তূপটিকে আলোকিত করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে তাহার চারি পাশ দিয়া অগ্নির লেলিহান শিখার সহিত ধূম্রজাল বিস্তৃত হইয়া সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত ঘরখানিকে ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিল। শম্ভুনাথের উল্লাস তখন দেখে কে! অগ্নিশিখার নৃত্যের তালে তালে তিনিও নৃত্য-ভঙ্গিতে চীৎকার তুলিলেন : রে-রে-রে ?

বাড়ীর ভিতর—দ্বিতলের দরদালানে রেণুর অপূর্ব্ব ফটোখানি আঁকড়াইয়া ধরিয়া অনুপমা অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। দুই মেয়ে রাণু ও বেণু শোকাতুরা জননীকে প্রবোধ দিতেছিল।

হরপ্রসাদকে দেখিয়া অনুপমার শোক উথলিয়া উঠিল। আর্ত্তকণ্ঠে তিনি কহিলেন: কি করে তুমি স্থির হয়ে আছ গো রেণুকে হারিয়ে, বন্ধুই কি তোমার এত বড় হ'ল?

হরপ্রসাদের গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। রোরুদ্যমানা স্ত্রীর দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি কহিলেন: কি করতে বল আমাকে? এতগুলো ঝি চাকর, বাইরে সহিস দরোয়ান, লোকজন বাড়ীতে গিস্‌গিস্ করছে, এর ভেতর থেকে সে হারিয়ে গেল, কেউ খোঁজ রাখেনি মেয়ের; এখন আমার উপর তম্বী ক'রে কি লাভ! আমি খুঁজতে হেলা করেছি মনে কর? বন্ধুকে ঠেস দিয়ে কথাটা বলবার মানে?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অনুপমা কহিলেন: লোকে কুলো ধুচুনীরও আয়-পয় দেখে। ঐ অপয়া মিনসেটা এসেই ত কাল ঘটালে! কি ক্ষণেই যে রেণুকে দেখতে চাইলে, ডাকলে, খোঁজাখুঁজি করলে, আর এলো না। উঃ! কি সর্ব্বনেশে মানুষ গো, অ-মা, রেণুরে!

হরপ্রসাদ ভ্রূকুটী করিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিলেন। বড় মেয়ে রাণু মিনতির সুরে পিতাকে অনুরোধ করিল: মা'র কি এখন মাথার ঠিক আছে বাবা, আপনি ওঁর কথায় কান দেবেন না।

রেণু বলিল : মা স্বপ্নে দেখেছেন, রেণু কোথায় গিয়ে যেন পড়েছে, সেখানে সব অচেনা লোক, রেণু খালি বলছে—'মা কোথায়? বাবা কোথায়? আমাকে এখানে আনলে কেন?' তাই মা'র মনে হচ্ছে—ভালো ক'রে খুঁজলে তাকে পাওয়া যাবে।

হরপ্রসাদ কহিলেন : খোঁজবার কোন ক্রটিই হয়নি। তার ছবি থেকে ব্লক ক'রে ছেপে খবরের কাগজে ছাপতে দেওয়া হয়েছে। পুলিস থানায় থানায় ইস্তাহার পাঠিয়েছে। কত লোক যে রেণুর সন্ধানে উঠে পড়ে লেগেছে—তার সংখ্যা নেই। সবাই জেনেছে, এই হারানো মেয়েকে খুঁজে বা'র করতে পারলে কিম্বা তার সন্ধান দিলে অবস্থা ফিরে যাবে। সন্ধান দিলে পঞ্চাশ হাজার টাকা, আর আনতে পারলে লাখ টাকা দেওয়া হবে ব'লে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এর বেশী আমাকে আর কি করতে বল?

ঘরের ভিতর গিয়া হরপ্রসাদ বন্ধু-পুত্রের ব্রোমাইড ফটো খানার অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কক্ষমধ্যে যে টিপয়টির উপর বালক বালিকার তুইখানি ফটো পাশাপাশি সাজানো ছিল, সেখানে শুধু রেণুর ফটো-খানিই রহিয়াছে দেখা গেল, অপরখানির কোন চিহ্নই নাই।

হরপ্রসাদের হাঁক ডাকে তুই কন্যা কক্ষমধ্যে ছুটিয়া আসিল। হরপ্রসাদ তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন : শম্ভুনাথের ছেলের ফটো কোথায় গেল?

কন্যা বেণু জানাইল : ফটোখানা অলুক্ষণে ব'লে মা সেখানা উনুন ধরাবার জন্যে মুক্কীকে দিয়েছেন।

হরপ্রসাদের মাথায় বুঝি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ মুক্কী ওরফে মোক্ষদা নাম্নী পাকশালার পরিচারিকাকে তলব হইল। সে আসিয়া সভয়ে জানাইল : যদিও মা-ঠাকুরোণ আমারে 'চিত্তির' খানা

উনানে দেবার লেগে কয়েছ্যালো, কিন্তু সোণা-হেন খোকা দেখে মনে ভারি মায়া লাগে, তাই না অগ্নি-দেবতার কোলে না দিয়ে তেনারে পেঁটরার ভেতরে থুয়ে রেখেছি।

অবিলম্বে ছবিখানি আনিয়া সে মনিবের হাতে সমর্পণ করিল, তাহার পর চাপা গলায় কহিল : ভাগ্যিস্ খোকারে আগুনে থো করিনি বাপু!

হরপ্রসাদ কহিলেন : ক'রনি তাই বেঁচে গেলে, নইলে তোমাকেও আগুনে থো করতুম।

বড় মেয়ে রাণুর দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন : একে পাঁচটি টাকা এর জন্যে বখসিস্ করলুম। টাকাটা দিয়ে খাতায় দাতব্যখাতে খরচ লিখিয়ে দিও।

পরক্ষণে ছবি দুইখানি লইয়া তিনি দ্রুতপদে বহির্ব্বাটিতে বন্ধুর উদ্দেশে চলিলেন।

(৮)

ধোঁয়ার একটা বিশ্রী গন্ধ বায়ুর সহিত মিশিয়া বাড়ীর বাহির মহলটাকে তখন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বাহিরের ঘরের ভিতরকার ব্যাপারটি অনেকটা বিলম্বেই অসতর্ক ভৃত্যদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। তখন অগ্ন্যুৎপাতের ভয়াবহ কাণ্ডটি তাহাদিগকে এমনই বিহ্বল করিয়া ফেলিল যে, আগুন নিবাইবার কোনরূপ উপায় স্থির করিতে না পারিয়া তাহারা সমবেতকণ্ঠে চীৎকার তুলিয়া শুধু লম্ফঝম্ফই সুরু করিয়া দিল। ঠিক এই সময় ফটো দুইখানি লইয়া হরপ্রসাদ বাহিরে আসিতেছিলেন। ভৃত্যদের

আর্ত্তনাদে তাঁহার হৃদ্‌কম্প হইল। কুড়ি মিনিটেরও অধিক হইবে না তিনি বাটীর ভিতরে ছিলেন, ইহার মধ্যেই বাহিরের বসিবার ঘরে আগুন লাগিয়া গেল।

দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সুসজ্জিত বৈঠকখানাটির যে অবস্থা তিনি দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। প্রসারিত দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যার উপর অগ্নির একটি স্তূপ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, ফরাসের চাদর ও তোষকের তুলান্তরের ভিতর দিয়া অগ্নির সধূম্র শিখা নির্গত হইতেছে। আর, তাঁহার অদ্ভুত বন্ধুটি সুবৃহৎ ফরাসটিকে পরিবেষ্টন করিয়া উন্মত্ত-আবেগে ঘুরিতেছেন এবং চক্ষুর উপর সহজ দাহ্য যাহা কিছু পড়িতেছে, টানিয়া টানিয়া সেগুলি এই বিচিত্র অগ্নিকুণ্ডটির উপর ইন্ধনের মত আহুতি দিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কারের স্বরে তাঁহার মুখ দিয়া চীৎকার উঠিতেছে: রে-রে-রে!

এই কাণ্ড দেখিয়া ভৃত্যগণ এমনই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে যে, শুধু আগুন আগুন শব্দ তুলিয়া আর্ত্তনাদ ব্যতীত আগুন নিবাইবার কোন প্রচেষ্টাই করে নাই। হরপ্রসাদ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্থির ও উপস্থিত-বুদ্ধির সাহায্যে সর্ব্বাগ্রে অগ্নির বিস্তার-পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে আগুন নিবিল, কিন্তু বন্ধু শম্ভুনাথের উৎসাহ বাধা পাইয়া উগ্র হইয়া উঠিল। ধূম্রলিপ্ত ঝলসিত চর্ম্মময় ব্যাগটি হরপ্রসাদের উপর নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দুইহাতে তুলিতেই হরপ্রসাদ তাঁহার হাতের দুইখানি ফটো হইতে বালক নরনারায়ণের ফটোখানি উন্মত্ত বন্ধুর মুখের সামনে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন। অহি-তুণ্ডিকের হস্তোত্থত বস্তুবিশেষ দেখিবামাত্র দংশনোদ্যত সাপের ফণা যেমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, হরপ্রসাদের হাতের সেই ফটোখানি শম্ভুনাথের দুই চক্ষুর হিংস্র দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিতেই

তাঁহার হাত দুইখানিও তেমনই শিথিল হইয়া পড়িল, মুখ চক্ষুর ভঙ্গি এক মুহূর্তে যেন একেবারে বদলাইয়া গেল। পরক্ষণেই হাতের ব্যাগটি ফেলিয়া হাত দুইখানি বাড়াইয়া তিনি হরপ্রসাদের দিকে ছুটিলেন ফটোখানি ধরিবার জন্য।

ফটোখানি বন্ধুর হাতে সমর্পণ করিয়া হরপ্রসাদ কহিলেন : তোমার ছেলের ছবি। এখানি আনবার জন্যেই আমি ভিতরে গিয়েছিলুম, আর তুমি অমনি এরই মধ্যে এই কাণ্ড এখানে বাধিয়ে বসেছ! দেখ দেখি, কি করেছ! ব্যাগটির ভিতরে যা-কিছু কাগজ-পত্র তোমার ছিল, পুড়িয়ে সমস্ত ছাই করে ফেলেছ; দরকারি কাগজ-পত্র কিছু যদি থাকে ত সব গোল্লায় গেল।

বন্ধুর কথাগুলি শম্ভুনাথের কানেও ঢুকিল না, তিনি ছবিখানি সন্নিহিত টেবিলটির উপর রাখিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া সুন্দর মুখখানির দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

আস্তে আস্তে বন্ধুর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন হরপ্রসাদ। তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার পীঠের দিকে হাতখানি রাখিয়া কহিলেন : ছবির খোকাকে এখানে আনবো ব'লেই ফটোখানি আনতে গিয়েছিলুম—যাতে ছেলের কথা তোমার মনে পড়ে। ঠিকানাটা যদি বল ত আজই আমি সেখানে লোক পাঠাই। কানে ঢুকেছে কথাটা?—বলিয়াই তিনি বন্ধুর পৃষ্ঠে মৃদুভাবে একটু চাপ দিলেন।

ফটোখানি দুইহাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া শম্ভুনাথ তৎক্ষণাৎ হরপ্রসাদের পানে ফিরিয়া তাকাইলেন। তাঁহার মুখ ও চক্ষুর ভঙ্গি দেখিয়া হরপ্রসাদ বুঝিলেন যে, ছবিখানি পাছে পুনরায় হাতছাড়া হয়, এই আশঙ্কাই তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

হরপ্রসাদ হাসিয়া কহিলেন: ভয় নেই, ও ছবি আমি নেব না, তোমার কাছেই থাক। কিন্তু আমার কথা কি তুমি বুঝতে পারছ না শম্ভু, তোমার ছেলেকে আমি আনতে চাই—সে এখানে এসে তোমার কাছেই থাকবে।

শম্ভুনাথের হিংস্র মুখভঙ্গি তৎক্ষণাৎ একেবারে বদলাইয়া গেল। ছেলের ছবিখানি দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া গভীর দৃষ্টিতে তিনি মুহূর্ত্তের জন্ম হরপ্রসাদের মুখের পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টি কি মর্ম্মস্পর্শী! হরপ্রসাদের মনে হইল তীক্ষ্ণোজ্জ্বল দুইটি চক্ষুতারার মধ্য দিয়া সন্তান-স্নেহের একটা স্নিগ্ধধারা যেন সবেগে নিঃসৃত হইতেছে। পরক্ষণেই শম্ভুনাথ আলিঙ্গনাবদ্ধ ছবিখানির মুখের উপর নিজের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। বিস্মিত হরপ্রসাদ দেখিলেন—ছবির সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া অশ্রুর বন্যা নামিয়াছে।

চকিতে হরপ্রসাদের চোখের উপর একটা ঐতিহাসিক স্মৃতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল:—

নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে ভাগ্যহারা সম্রাট নেপোলিয়ন যখন সমুদ্র বেষ্টিত সেন্টহেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত জীবনের নিঃসঙ্গ দিনগুলি কোন-ক্রমে অতিবাহিত করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁর এক অন্তরঙ্গ চিকিৎসক-বন্ধু অনেক কাঠ-খড় পুড়াইয়া নির্ব্বাসিত সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগটুকু প্রাপ্ত হন। সম্রাট তাঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করেন—আমার জন্য কি এনেছ, ডাক্তার?

এই ডাক্তারটি একদা নেপোলিয়নের নাড়ীর খবর পর্য্যন্ত রাখিতেন। তিনি জানিতেন; একান্ত অবসরকালে পুস্তকই ছিল তাঁহার প্রধান সাথী। তাই কতকগুলি নূতন প্রকাশিত ভাল ভাল বই তিনি পারিস হইতে

তাঁহার প্রিয়তম সম্রাটের জন্ম লইয়া গিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের প্রশ্ন শুনিয়াই তিনি সেই বইগুলি তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন।

নেপোলিয়নের ওষ্ঠপ্রান্তে ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। মুখখানি ঈষৎ বিকৃত করিয়া তিনি কহিলেন—এঃ, ডাক্তার! তোমার বস্তু নির্ব্বাচনে ভুল হয়েছে। ছেলের বাবা কি এ অবস্থায় সর্ব্বাগ্রে বইয়ের দিকে হাত বাড়াতে পারে ডাক্তার? তোমার কাছে আমি আরো কিছু বেশী প্রত্যাশা করেছিলুম।—কথাগুলি বলিয়াই তিনি জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

সম্রাটের শেষের কথাগুলি ডাক্তারের ভুল ভাঙ্গিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে এই অতিমানুষটির মনের দরজা তাঁহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যাগটি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে নেপোলিয়নের বালক পুত্রের আলেখ্যখানি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলেন।

শিশু যেরূপ আকাঙ্ক্ষিত খেলানাটি পাইয়া বিপুল আনন্দে বুকে চাপিয়া ধরে, ঠিক সেইভাবে সে-যুগের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষটি ছেলের ছবিখানি দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ছবির মুখে মুখ রাখিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—আঃ, ডাক্তার! ছেলের বাপ এ-অবস্থায় আগে চায় ছেলে! নেপোলিয়নের দুই চক্ষুরপ্রান্ত দিয়া তখন অশ্রুর ধারা বহিয়াছে!

ঐতিহাসিক মহামানুষটির সহিত এই অতি সাধারণ বাস্তব মানুষটির তুলনা করিতে বসিয়া হরপ্রসাদ দেখিলেন—মনোরাজ্যে ইঁহাদের কোন পার্থক্য নাই, তারতম্য নাই, স্নেহ মন্দাকিনী অন্তঃসলিলার মত অন্তরদেশে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

অনুচরগণের তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরখানি পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইল। কিন্তু তক্তপোষের উপর পুনরায় পূর্ব্ববৎ সুদৃশ্য ফরাস পাতা হইল। শম্ভুনাথকে কোন প্রকারে ফরাসের এক প্রান্তে বসানো হইল বটে, কিন্তু তাঁহার বাহুপাশে আবদ্ধ ছবিখানিকে মুক্ত করা হরপ্রসাদের পক্ষে তখন আর সম্ভবপর হইল না। শম্ভুনাথ কিছুতেই ছবিখানি ছাড়িবেন না। বিড়ালের ক্রোড় হইতে তাহার শাবকটিকে ধরিবার জন্য অতি পরিচিত পালকও হাত বাড়াইলে সে যেরূপ হিংস্র-ভাবে গজ্জন করিতে থাকে, ছবিখানিকে শম্ভুনাথের আলিঙ্গনমুক্ত করিতে যতবারই হরপ্রসাদ চেষ্টা করিলেন, তিনিও ঠিক সেই ভাবে মুখখানি বিকৃত করিয়া তর্জ্জনের সুরে বাধা দিলেন : য়্যাও !

এই সময় হরপ্রসাদ মাথা খেলাইয়া রেণুর ফটোখানি ফরাস-সন্নিহিত টেবিলটির উপর রাখিতেই তদ্দৃষ্টে শম্ভুনাথের মুখভঙ্গি পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইল। এবার তিনি নিজেই ছেলের ছবিখানিকে আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া রেণুর ছবির পার্শ্বে অতি সন্তর্পণে রাখিলেন। হরপ্রসাদ চাহিয়া দেখিলেন, উন্মত্ত বন্ধুর স্বচ্ছ সরল দৃষ্টি এখন ছবিযুগলে আবদ্ধ, মুখখানি প্রসন্ন। অতঃপর তিনি আস্তে আস্তে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন ; দুই চক্ষুর দৃষ্টি কিন্তু ছবি দুইখানির উপরেই নিবদ্ধ রহিল। হরপ্রসাদ যে নিকটে রহিয়াছেন, অথবা কক্ষদ্বারের সম্মুখে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া অনেকেই যে তাঁহার আচরণ লক্ষ্য করিতেছে, সে সম্বন্ধে শম্ভুনাথকে কিছুমাত্র সচেতন দেখা গেল না।

হরপ্রসাদ স্থির করিলেন, বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার অধিকারীকে আনাইয়া বন্ধুকে দেখাইবেন, তিনি যদি আশ্বাস দেন, তাঁহার চিকিৎসা-ধীনেই রোগীকে রাখিবেন। মনের সঙ্কল্পটি তৎক্ষণাৎ কাজে লাগাইবার

জন্য তিনি বন্ধুকে সেই অবস্থায় কক্ষ মধ্যে একা রাখিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে আসিলেন এবং শম্ভুনাথের উপর সতর্ক নজর রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়া কোচয়ানকে গাড়ী বাহির করিতে বলিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া হরপ্রসাদ যখন বাহিরে আসিলেন, তখনও শম্ভুনাথ একই ভাবে ছবি দুইখানির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। দ্বারপ্রান্ত হইতে সে দৃশ্য দেখিয়া জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া হরপ্রসাদ এই অদ্ভুত রোগীর চিকিৎসার আশায় চিকিৎসকের সন্ধানে চলিলেন।

কিন্তু রোগীর চিকিৎসার আর প্রয়োজন হইল না।

প্রায় দুইঘণ্টা পরে হরপ্রসাদের গাড়ী যখন দেউড়ীতে আসিয়া থামিল, বাহিরে কাহারও সাড়া শব্দ বা নিদর্শন পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারাচ্ছন্ন পথে বিরক্ত গৃহস্বামী ডাক্তার অধিকারীকে লইয়া গভীর একটা নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া বৈঠকখানার প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার অধিকারী পথেই তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, কোনরূপ সাড়া শব্দ না করিয়া খুব সন্তর্পণেই তিনি রোগীর গৃহে প্রবেশ করিবেন। তাহাতে রোগীর সাময়িক ভাবভঙ্গি প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগটুকু ঘটিবে। কিন্তু বিনাড়ম্বরে ও সন্তর্পণে উভয়ে উন্মুক্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়াই স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখিলেন, কক্ষ নির্জ্জন; জিনিষপত্র আর সবই ঠিক আছে শুধু রোগী নাই। সেই সঙ্গে তাঁহার অগ্নিঝলসিত ব্যাগটি এবং টিপয়ে রক্ষিত ছবি দুইখানিও অদৃশ্য হইয়াছে। রোগীর বর্ত্তমান ব্যাধি এবং তাহার পূর্ব্বের কাহিনী সমস্তই হরপ্রসাদ ডাক্তার অধিকারীকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়া ছিলেন।

গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে হরপ্রসাদ হাঁকিলেন: আত্তরসিং, কানাই, মল্জী—পাজি, উল্লু সব......

গৃহস্বামীর তর্জ্জনের সঙ্গে সমগ্র নিদ্রিত পুরী যেন সহসা সশব্দে জাগিয়া উঠিল। ব্যাপারটি আর কিছুই নয়, অসময়ে শম্ভুনাথ বৈঠক-ঘরে যে হাঙ্গামা বাধাইয়াছিলেন, পরিচারকদের দিবানিদ্রায় তাহা রীতিমত বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছিল। উপরন্তু তাহারা ছুটাছুটিতে এরূপ শ্রান্ত হইয়া পড়ে যে, অভ্যস্ত দিবানিদ্রার তীব্র আকর্ষণ বাহিরের কক্ষবাসী সাংঘাতিক মানুষটির সম্বন্ধে প্রভুর সতর্ক নির্দ্দেশটুকু পর্যান্ত ভুলাইয়া দেয়। কর্ত্তাবাচুাভির গ্লানি এখন তাহাদিগকে অতিষ্ট করিয়া [illegible]ভই উঠি-পড়ি অবস্থায় তাহারা প্রভুর মনোরঞ্জনে ছুটিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সুবৃহৎ বাড়ীখানি আলোকোজ্জ্বল হইল বটে, কিন্তু গৃহস্বামীর মনের অন্ধকার কাটিল না। ডাক্তার অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিতেছিলেন: দেখছেন ত ডাক্তার অধিকারী, সব থাকতেও কত বড় অভাগা আমি! অপরাধ আমার, ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে বেরুইনি। আজ ঘটনাচক্রে পূর্ব্ব স্মৃতি তার অনেকটা ফিরেছে দেখে, ইচ্ছা করেই আমি আর স্বাধীনতায় বাধা দিইনি; কিন্তু তার ওপর নজর রাখতে পই পই করে বলে গেছি। আর, হতভাগারা কি না নিশ্চিন্ত হয়ে এমনি ঘুম দিল যে মানুষটা সটান বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল, হুঁস পর্য্যন্ত তাদের হল না! এখন কি করি বলুন ত?

ডাক্তার অধিকারীর বিচিত্র পেশাটির মত তাঁহার চেহারাখানিও এরূপ অদ্ভুত যে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। পক্ষান্তরে, চেহারা দেখিয়া বুঝিবার উপায় থাকে না যে তিনি কোন্ দেশের মানুষ। গায়ের রঙ তাঁহার এত বেশী ধপধপে ফরসা যে কোন বাঙ্গালীর গায়ের রঙ এতটা ফরসা হইলে তাহা ধবল রোগের পর্য্যায়ে আসিয়া পড়ে। দেহের গঠন দিব্য পুরন্ত এবং বলিষ্ঠ হইলেও দীর্ঘতার দিকে হ্রাস পাইয়া

প্রস্থের দিকটা যে ভাবে পুষ্ট করিয়াছে, তাহাতে আকৃতিগত খর্ব্বতাই প্রকাশ পায়। পরিচ্ছদ দেখিয়াও ধরিবার যো নাই যে তিনি কোন্ সমাজের লোক। সাদা কাপড়ের ঢিলা পায়জামার উপর কালো রঙের আলপাকার চাইনিজ প্যাটানের কোর্ট এবং গলার উপর পালিস করা শক্ত কলারটি তাঁহার স্থূল গর্দ্দানটিকে যেন খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। কালো রেশমী টুপিটি বৃহৎ একটি নারিকেলের অর্দ্ধমালার মত ডাক্তার অধিকারীর মাথার চাকির ইন্দ্রলুপ্ত অংশটুকু আবৃত করিয়া এবং চারি পাশের ঝুমকো চুলগুলির সহিত মিশিয়া এমন ভাবে বসিয়াছে যে, সহসা দেখিলে কবরীবদ্ধ ঝুঁটি বা চূড়া বলিয়া ভ্রম হয়। মুখখানি গোলগাল ও গম্ভীর, তাহাতে প্রতিভা ও বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। মুখের মত কপাল-খানাও প্রশস্ত ও উচ্চ। চক্ষুর তারা দুটি ঘোলাটে হইলেও দৃষ্টি অসাধারণ তীক্ষ্ণ। নাসাটি কিন্তু চোখের সম্পূর্ণ বিপরীত; অর্থাৎ তীক্ষ্ণ ত নয়ই, বরং অনেকটা বসা। খর্ব্ব দেহের তুলনায় হাত দুখানি অতিরিক্ত দীর্ঘ ও দৃঢ়। এই বাহু এবং দেহের বাঁধুনিই যেন সাক্ষ্য দিতেছে—লোকটি রীতিমত শ্রমশীল এবং বলিষ্ঠ। কিন্তু আকৃতি ও পরিচ্ছদ মানুষটির জাতি-গত পরিচয় প্রচ্ছন্ন রাখিলেও মুখের কথা প্রকাশ করিয়া দেয় যে তিনি চীনা জাপানী সিংহলী বা বর্ম্মী মার্কা মানুষ নন—খাঁটি বাঙ্গালী। এই চেহারা ও বিচিত্র পোষাক পরা মানুষটি যখন দিব্য ঘরোয়া বাঙলায় কথা বলেন, আলাপ করেন, তখন সত্যই চমৎকৃত হইতে হয়।

ডাক্তার অধিকারীর পেশাটি সত্য অভিনব। মানব মনের বিভিন্ন অবস্থা এবং মানবকৃত অপরাধের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া কর্ম্মজীবনের প্রায় অপরাহ্নে এই পরীক্ষাসিদ্ধ দক্ষতাকে ইনি পেশারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বহুক্ষেত্রেই মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে ইঁহার

সাফল্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহার ফলে যুক্ত প্রদেশের সরকার ইঁহাকে উচ্চবেতনে মানসিক ব্যাধি চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ছাড়া, অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধেও ইংরাজী সাময়িক পত্রিকাগুলিতে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া ডাক্তার অধিকারী শাসক-সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

হরপ্রসাদ যখন ডাক্তার অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া অপ্রীতিকর ঘটনাটির আভাস দিতেছিলেন, তিনি তখন নীরবে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘরের জিনিষ পত্রগুলি একটি একটি করিয়া দেখিতেছিলেন। গৃহস্বামীর শেষের কথাটি প্রশ্নের মত বোধ হয় তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল; তৎক্ষণাৎ সন্ধানী দৃষ্টি প্রশ্নকারীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন: আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, কি করতে চান? কিন্তু আমি যা বলব, করতে পারবেন?

হরপ্রসাদ চাহিয়া দেখিলেন, ডাক্তার অধিকারীর মুখখানি যেন সহসা বদলাইয়া গিয়াছে, ঘোলাটে দুটি চক্ষু মার্জ্জারের চক্ষুর মত জ্বলিতেছে। তিনি উত্তর করিলেন: দেখুন, আমার মেয়েটিকে হারানো আর অতীতের এই বন্ধুটিকে পাওয়া সম্বন্ধে সমস্ত কথাই আপনাকে বলেছি। আপনার চিকিৎসার তাকে সারিয়ে তুলব, তার ছেলেটিকে এনে কাছে রেখে মানুষ করব, আমার মেয়ের জায়গায় বন্ধুর ছেলেকেই বসাবো—এইগুলো ছিল আমার শেষের সাধ। কিন্তু হতভাগা সে পাটও ঘুচিয়ে দিয়ে গেল। এখন আমি নিজেই ভেবে পাচ্ছিনা—*কি করি? মেয়েটার সন্ধানে সমস্ত সহর তোলপাড় করেছিলুম, এর জন্তেও কি তেমনি ক'রে—*

ভৃত্য কানাই এই সময় কক্ষদ্বার হইতে কুণ্ঠিত কণ্ঠে জানাইল: বাবা, তাঁর তল্লাসে চারদিকে চার চারটে মানুষ ছুটেছে। মজ্জী

সাইকিলিন চেপে ইষ্টিশানে গেছে, আতর সিং, নিবারণ, গদাই—এরাও বেরিয়েছে।

ডাক্তার অধিকারী বলিলেন : বাস্, তবে ত কাজ চুকে গেছে! আপনার চাকররা গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালতে খুব ওস্তাদ দেখছি! তাহলে আমাকে কি এখানে অপেক্ষা করতে বলছেন—পলাতক রোগীকে ধরে আনলে তাঁকে দেখে তবে ছুটি মিলবে?

ডাক্তারের কথায় অন্তরে আঘাত পাইয়া হরপ্রসাদ কহিলেন : দেখুন, এই অপ্রীতিকর ব্যাপারে আপনার এতখানি সময় অনর্থক নষ্ট করে আমি খুবই ব্যথা পাচ্ছি। কিন্তু তাই ব'লে, আপনাকে আটকে রাখবার দুঃসাহস আমার নেই। তবে রোগীর অভাবে পারিশ্রমিক সম্বন্ধে......

হরপ্রসাদের কথায় এইখানে বাধা দিয়া ডাক্তার অধিকারী বলিয়া উঠিলেন : তার মানে? রোগীর অভাবে—আসবার দরুণ মেহনতানা দিয়ে আমাকে খুসি করতে চান নাকি? এঃ—

লজ্জিতভাবে হরপ্রসাদ কহিলেন : তাহলে আপনিই বলুন, এখন আমি কি করব? যে অবস্থাটা এখন দাঁড়িয়েছে, তাতে ব্যবস্থার ভার আমি আপনার ওপরেই দিতে চাই; 'অবশ্য দয়া করে' যদি গ্রহণ করতে রাজী থাকেন।

গম্ভীর মুখে ডাক্তার অধিকারী কহিলেন : বেশ কথা; আমি তাতে রাজি। কিন্তু যে ব্যবস্থা আমি দেব, পারবেন করতে?

হরপ্রসাদ : অন্ততঃ, আপনাকে খুসি করবার জন্যে আমার পক্ষ থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না ডাক্তার অধিকারী।

ডাক্তার অধিকারী : আপনার চেষ্টা শুধু আমাকে খুসি করবে না; সম্ভবত, আপনিও খুসি হতে পারবেন। যাক্, কথাটা তাহলে খুলেই

বলি শুনুন।...আপনি বোধ হয় জানেন না যে, এবারকার মেলায় কিডনাপিং সম্পর্কে যে সব অনাচার হয়েছে, তার ওপর গবরমেণ্টের লক্ষ্য প'ড়েছে, আর এর ভিত্তি-স্বরূপ হয়েছে আপনার মেয়ে হারানো ব্যাপারটি। কেননা, অজস্র টাকা খরচ করে আপনিই ব্যাপারটাকে প্রমিনেন্ট করে তুলেছেন !

হরপ্রসাদ: তা হবে। কিন্তু এ-ব্যাপারে গবরমেণ্টের [illegible]রে সাড়া পড়েছে—এমন কোন খবর আমি পাইনি।

ডাক্তার অধিকারী: কিন্তু আমি পেয়েছি। গবর[illegible] এ সম্বন্ধে যে-সব রিপোর্ট পেয়েছেন, তাতে তাঁদের ধারণা, এর [illegible]ন একটা সঙ্ঘবদ্ধ 'গ্যাং' আছে, আর কোন একটা লাভজনক উদ্দে[illegible] বসবর্ত্তী হয়েই তারা এ কাজে নেমেছে। এখন এই অপরাধ-[illegible] রহস্য আমাকেই আবিষ্কার করতে হবে। আপনি হয় ত শুনে বি[illegible] হবেন যে, ভারটি পুরোপুরি আমার হাতেই এসে পড়েছে।

হরপ্রসাদ: বিস্মিত হবার ত এতে কিছু নেই ডাক্তার [illegible]কারী, বরং আমি একে সুসংবাদ বলেই মনে করছি। আর আপ[illegible] মত যোগ্য লোকের হাতে যখন এ-ভার পড়েছে তখন যে এর সু[illegible] হবে, এ আশা করতে পারি। কেন না, ইউপি শুদ্ধ সকলেই জানে আপনি শুধু মনের ডাক্তার নন, ভূত ধরবারও রোজা।

ডাক্তার অধিকারী: কিন্তু আশ্চর্য্য এইখানেই মিষ্টার ঘোষ, কাজটারও ভার সবে মাত্র পেয়েছি, আর আপনিও গিয়ে হাজির হয়েছেন ! অথচ, আমিই তখন ভাবছিলুম, কি সূত্রে আপনার কাছে এসে ব্যাপারটা আগা গোড়া শুনি !

হরপ্রসাদ: এখন বুঝতে পারছি, আমি যেতেই ঘর থেকে আর

সকলকে সরিয়ে দিয়ে আপনি আমার কথাগুলো আগাগোড়া শোনবার জন্যে অতটা সময় কেন দিয়েছিলেন। এখন যদি অনুমতি করেন, একটি কথা বলি।

ডাক্তার অধিকারী: স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। আমাদের উভয়ের মধ্যে এখন থেকে আর কোন আবরণ থাকা ঠিক নয়।

হরপ্রসাদ নীরবে ক্ষণকাল কি ভাবিয়া তাহার পর মৃদুস্বরে বলিলেন: আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমি গবরমেণ্টকে জানিয়েছি যে, আমার মেয়েকে যিনি উদ্ধার করে আনতে পারবেন, আমি তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা 'রিওয়ার্ড' দেব?

ডাক্তার অধিকারীর গম্ভীর মুখে এতক্ষণ পরে হাসির একটু ক্ষীণরেখা পড়িল। মুখখানা তুলিয়া তিনি কহিলেন: খবরের কাগজেও খবরটা বেরিয়েছে, কাজেই সবার জানা বলেই ধরে নেওয়া চলে। গবরমেণ্টও আমাকে খবরটা জানিয়েছেন আর সরকার থেকেও একটা আলাদা 'রিওয়ার্ড' ঘোষণা করা হয়েছে—মেলায় হারানো প্রত্যেক মেয়েটির সম্পর্কে।

হরপ্রসাদ: এখন এ-সম্পর্কে আমি আর একটা প্রতিশ্রুতি দিতে চাই।

ডাক্তার অধিকারী: কি বলুন ত?

হরপ্রসাদ: আমার বন্ধু শম্ভুনাথ বসুকে যদি খুঁজে পাওয়া যায়, আর আপনি তাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করে তুলতে পারেন, আমি তার জন্য আলাদা পঁচিশ হাজার টাকা আপনাকে দেব।

ডাক্তার অধিকারী: বলেন কি মিষ্টার ঘোষ, ঐ হতভাগা পাগলটার পিছনে এখনো আপনি এত টাকা ঢালতে চান?

গম্ভীর মুখে হরপ্রসাদ কহিলেন: এটা আমার কর্তব্য ডাক্তার অধিকারি! তা ছাড়া, বন্ধুর ছেলেটির জন্যে তাকে ফিরে পাওয়া এবং সারিয়ে তোলা আমি জরুরী প্রয়োজন বলে মনে করি। নতুবা ছেলেটি শেষ পর্যান্ত চোখের আড়ালেই থেকে যাবে।

ডাক্তার অধিকারী জিজ্ঞাসা করিলেন: ছেলেটিকে কাছে আনাই যদি আপনার ইচ্ছা হয়ে থাকে, বন্ধু এখানে থাকতেই সে চেষ্টা করেন নি কেন?

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হরপ্রসাদ কথাটার উত্তর দিলেন: আগাগোড়াই যে ভুল করে এসেছি, এ কথা ত আগেই আপনাকে বলেছি ডাক্তার অধিকারী! ব্যাগের কাগজপত্রগুলো নষ্ট হবার পর আমার হুঁস হয়—আগেই ছেলেটার সন্ধান নেওয়া উচিৎ ছিল। তবে আমার মনে হয়, কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে ছেলেটার সন্ধান পাওয়া কঠিন হবে না।

ডাক্তার অধিকারী দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করিলেন: একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মিষ্টার ঘোষ, ধরুন, বন্ধুকে যদি পাওয়া না যায় কিম্বা পেলেও যদি তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসে, তখনও কি ছেলেটির সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ বজায় থাকবে?

দৃঢ়স্বরে হরপ্রসাদ উত্তর দিলেন: আমার কথা কোন দিন পাল্টায়নি ডাক্তার অধিকারী। বন্ধুর কাছে যে কথা বলেছি, বন্ধুর অবর্ত্তমানে বা ঘটনার পরিবর্ত্তনেও তা বদলাবে না। এখন থেকে আমি নিজেকেই বন্ধুপুত্র নরনারায়ণের অভিভাবক মনে করছি। তাকে খুঁজে বা'র করবার ভার আমাকেই নিতে হবে। রেণুকে যদি ফিরে পাই, কথা আমার ষোল আনাই পূর্ণ হবে; না পাই ত—ঐ ছেলেটাই রেণুর স্থান পূর্ণ ক'রে আমার মুখ রক্ষা করবে।

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ এই দৃঢ়চেতা মানুষটির মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া এবং মনে মনে একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া ডাক্তার অধিকারী কৃত্রিম সহানুভূতির সুরে কহিলেন: ধন্যবাদ, মিষ্টার ঘোষ! অদ্ভুত আপনার বন্ধুপ্রীতি, আপনি দেখছি, এ যুগের আদর্শ-বন্ধু। বেশ, আমি আপনার 'কেশ'টি নিলুম। আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনার কন্যা, বন্ধু আর বন্ধুপুত্র—এদের খুঁজে বা'র করাই হবে আমার শেষ জীবনের একটা স্মরণীয় কার্য্য।

গাঢ়স্বরে গৃহস্বামী কহিলেন: আমিও এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি ডাক্তার অধিকারী! আর এই সঙ্গে একথাও বলে রাখছি, তদন্ত ব্যাপারে টাকা পয়সার প্রয়োজন হলে আপনি যেন কুণ্ঠিত না হন, অসঙ্কোচেই জানিয়ে আমাকে ধন্য করেন।

ডাক্তার অধিকারীর গম্ভীর মুখখানিতে আর একবার হাসির রেখা পড়িল এবং একটু গভীর হইয়াই পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধকণ্ঠের স্বর বাহির হইল: বেশ, তাই হবে মিষ্টার ঘোষ!

(৯)

ডাক্তার অধিকারীর সহিত হরপ্রসাদের যখন পূর্ব্বোক্ত আলোচনা চলিতেছিল, তখন কি তাঁহারা কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন যে, মাইল দুই তফাতে ইণ্টার ন্যাশনাল ফিলিম কোম্পানীর কর্ণেলগঞ্জের অস্থায়ী ষ্টুডিও সংলগ্ন হাসপাতালের পরিচ্ছন্ন কক্ষমধ্যে তাঁহাদের আলোচ্য মানুষটিকে উপলক্ষ করিয়া তৎকালে নূতন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছিল ?

হরপ্রসাদের প্রস্থানের পর শম্ভুনাথ একইভাবে কিছুক্ষণ বা[illegible]র কক্ষে ছবি দুইখানির পানে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বসিয়া রহি[illegible]। তাহার পর কি ভাবিয়া হঠাৎ উঠিয়া পড়িলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে [illegible] বালিসের ওয়াড় খুলিয়া তাহার মধ্যে দুইখানি ছবি ভরিয়া ওয়াড়[illegible] রেশমী ফিতা দিয়া দপ্তরের আকারে বাঁধিয়া ফেলিলেন। ব্যাগটি বিছ[illegible] উপরেই পড়িয়া ছিল। অতঃপর দপ্তরটি ব্যাগের মধ্যে ভরিয়া চা[illegible] বন্ধ করিয়া গায়ে যে ফতুয়াটি ছিল তাহার পকেটে রাখিলেন। [illegible] বাড়ীখানা তখন নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে শুধু বায়ু প্রবাহে গভীর নিদ্র[illegible] ভৃত্যদের নাসিকাধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। ক্ষণকাল কান পা[illegible] শম্ভুনাথ যেন সেই বিচিত্র শব্দটির রহস্যানুসন্ধানে প্রয়াস পাইয়াই [illegible] সচকিত হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই বৃহৎ ঘর খানির মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধানী দৃষ্টিতে কোন বাঞ্ছিত বস্তুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দরজার বাহিরে একটা টানা তারের উপর একখানা কালো রঙ্গের রেশমী চাদর ঝুলিতেছে দেখিয়া সবেগে গিয়া সেটি টানিয়া আনিলেন। তাহার পর সেটি গায়ে জড়াইয়া যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। এবার বিছানার দিকে

ঝুঁকিয়া ব্যাগটি টানিয়া লইলেন। তাহার পর পা টিপিয়া টিপিয়া বারান্দার উপর দিয়া ফটকের দিকে চলিলেন। বাহিরের অঙ্গন এবং দেউড়ী তখন জনশূন্য। রাস্তায় প্রচুর ধূলা উড়াইয়া পর পর দুইখানি এক্কা কেবল ছুটিতেছিল। সেই ধূলার মধ্যে গৃহবাসী ও পথচারীদের চক্ষুতে ধূলা দিয়া পাগল তাহার নূতন যাত্রাপথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

আমেরিকার কোন প্রসিদ্ধ চিত্র প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদিত মহাকুম্ভের দৃশ্য ফিলিমে তুলিবার অভিপ্রায়ে কর্ণেলগঞ্জের এক বিস্তীর্ণ উদ্যান বাটিকায় তাঁহাদের অস্থায়ী চিত্রশালা স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই অভিযাত্রীদলটির সুখ সুবিধা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের সুব্যবস্থা এবং ব্যয়বাহুল্যের ঘটা এদেশবাসীর পক্ষে যেন কল্পনাতীত ব্যাপার। অস্থায়ী চিত্রশালাটির সম্পর্কে যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম ও উপাদানের সহিত শিল্পীদের স্বাস্থ্যরক্ষার অনুরোধে চলন্ত একটি হাসপাতাল পর্য্যন্ত সমুদ্রপথে এদেশের কর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছে। ইহাতেই উপলব্ধি হইবে যে, মার্কিনদেশের এই ভ্রামামান ফিলিম প্রতিষ্ঠানটি কিরূপ সমৃদ্ধ ও প্রতিপত্তিশালী। ভারতের এই মহামেলার ছবি ফিলিমে তুলিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ নিরস্ত হন নাই, এই মেলাটিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা একখানি ভারতীয় চিত্রনাট্য তুলিবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। এই সম্পর্কে অস্থিরচিত্ত বিকৃত মস্তিষ্ক এক প্রৌঢ়ের ভূমিকা অভিনয়ের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় কোন ভারতীয়ের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। শম্ভুনাথ যখন হরপ্রসাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কর্ণেলগঞ্জের জনবিরল ফাঁকা রাস্তাটি ধরিয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে টলিতে টলিতে একইভাবে চলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় বৃহৎ একখানি আধুনিক মটরগাড়ী নিঃশব্দে বিপরীত দিক হইতে একেবারে শম্ভুনাথের সম্মুখে আসিয়া থামিল।

ফিলিম প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মিষ্টার জিম আর্থার দলের কতিপয়

তরুণী চিত্রাভিনেত্রীকে লইয়া এই পথে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। শোফারের আসনে বসিয়া তিনি স্বয়ং মোটর চালাইতেছিলেন, তাঁহার সহকর্মী জ্যাক উইলিয়ম পার্শ্বে বসিয়া ক্ষুদ্র ক্যামেরাটির সাহায্যে বৃক্ষবহুল বিস্তীর্ণ পথটির সায়াহ্নের ছবি তুলিতে সচেষ্ট ছিলেন।

মিষ্টার আর্থার ক্ষিপ্রহস্তে সহসা মোটরের গতিবেগ কিঞ্চিৎ লঘু করিবার উদ্দেশ্যে ষ্টিয়ারিং ঘুরাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কণ্ঠ দিয়া বিস্ময়ের সুর বাহির হইল: ভারি আশ্চর্য্য ত?

জ্যাক উইলিয়ম সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন: ব্যাপার কি সার?

পকেট হইতে দূরবীনটি বাহির করিয়া এবং চোখে লাগাইয়া মিষ্টার আর্থার কহিলেন: সাত দিন ধরে আমরা যে অদ্ভুত চেহারাটির সন্ধান করে বেড়াচ্ছি, হুবহু সেই বস্তুটি আমাদের ঠিক সামনে অর্থাৎ এক ফার্লংএর মধ্যে—এই দেখ?

বলিয়াই তিনি দূরবীনটি জ্যাক উইলিয়মের হাতে দিলেন এবং উইলিয়ম সেটি চোখে লাগাইয়া উল্লাসের সুরে কহিয়া উঠিলেন: সার! আপনার অনুমান ঠিক, আমরা যেমনটি খুঁজছিলাম—এক মাথা রুক্ষ চুল, মুখময় দাড়ি গোঁফ, খালি পা, হাতে ব্যাগ, গায়ে একটা কালো রঙের র‍্যাপার, এলো মেলো চলন—ঠিক এমনি একটি লোককেই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দিকেই আসছে। সত্যিই অদ্ভুত!

ষ্টিয়ারিং ঘুরাইয়া মোটরের বেগ বাড়াইয়া মিষ্টার আর্থার বলিলেন: ঐ লোকটিকে এখনি পথ থেকে কুড়িয়ে একেবারে ষ্টুডিয়োয় নিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে বোঝা পড়া করতে হবে।

উভয়ের সংলাপ গাড়ীর ভিতরে বসিয়া মেয়েগুলিও উৎকর্ণ হইয়া

শুনিতেছিল। একটি মেয়ে হাসিয়া মন্তব্য করিল: মিষ্টার ডাইরেক্টরের নজরে যখন বেচারী পড়েছে ওর বরাতও খুলে গেছে!

গাড়ী তখন তীব্র বেগে ছুটিয়াছে এবং সকলের দৃষ্টি সামনের অদ্ভুত মানুষটির দিকে। কিন্তু কাছাকাছি আসিতেই সহসা আর এক বিভ্রাট ঘটিয়া গেল।

পিচঢালা পথে গাড়ীখানি নিঃশব্দে আসিলেও থামিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হর্ণের সুরটি এমনই তীক্ষ্ণ-কর্কশ ঝঙ্কার তুলিল যে, পথচারী মানুষটি চমকিত হইয়া সবেগে মোটরের মডগার্ডের উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টার আর্থার ও তাঁহার সঙ্গী নিচে নামিয়া লোকটিকে তুলিতে গিয়া দেখিলেন, আকস্মিক আতঙ্ক এবং প্রচণ্ড আঘাতের ফলে তাঁহার চৈতন্য লুপ্ত হইয়াছে। এ অবস্থায় কাল বিলম্ব না করিয়া সময়োচিত তৎপরতায় সহযোগীর সাহায্যে আকাঙ্ক্ষিত অপরিচিত লোকটিকে ভিতরে তুলিয়া মিষ্টার আর্থার ষ্টুডিও অভিমুখে পূর্ণগতিতে মোটর চালাইয়া দিলেন।

ষ্টুডিওর হাসপাতালে চিকিৎসার এবং শুশ্রূষা সম্বন্ধে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার কোনরূপ ত্রুটি ছিলনা। সুতরাং শম্ভুনাথ শীঘ্রই চৈতন্যলাভ করিয়া সুস্থ হইলেন। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এ অবস্থায় রোগীকে অব্যাহতি দিলেন না। তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতির নিদর্শন পাইয়া সে সম্বন্ধে সতর্কতার সহিত চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। কর্তৃপক্ষ বুঝিলেন, আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া পথে পাওয়া এই মানুষটি তাঁহাদের চিত্রসম্ভারের এক অমূল্য সম্পদে পরিণত হইবার উপযুক্ত।

ইহাকে আরোগ্য করিয়া তুলিলে তাঁহাদের অর্থব্যয় এবং প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে না।

পরিচ্ছন্ন অঙ্গ বস্ত্র, সুকোমল শয্যা, বলকারক পথ্য, গীতবাদ্য এবং সুদর্শনা শুশ্রূষাকারিণীদের সঙ্গ দ্বারা রোগীকে প্রফুল্ল রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার স্নায়ুগত দুর্ব্বলতার চিকিৎসা যখন পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে, সেই সময় বন্ধুবৎসল হরপ্রসাদ তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া ডাক্তার অধিকারীর হস্তে তাঁহার কন্যা বন্ধু এবং বন্ধুপুত্রের অনুসন্ধান সম্পর্কে সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছিলেন।

(১০)

পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনার পর স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়াই হরপ্রসাদকে সপরিবার বোম্বায়ের কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইল। এলাহাবাদের এই অলুক্ষণে বাড়ীখানি কন্যা-শোকাতুরা অনুপমা যেন কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু ডাক্তার অধিকারী যখন জানাইলেন, গৃহস্বামী এলাহাবাদ ছাড়িয়া বাহিরে গেলেও নিরুদ্দিষ্টদের সন্ধান-সম্পর্কে বাড়ীখানি এমন ভাবে রাখা চাই যাহাতে তদন্তসূত্রে তাঁহার আসা-যাওয়ার ব্যাঘাত না ঘটে, তখন হরপ্রসাদ ডাক্তার অধিকারীর হাতেই কতিপয় সর্ত্তে বাড়ীখানি রক্ষণাবেক্ষনের সম্পূর্ণ ভার না দিয়া পারেন নাই।

এই ডাক্তারটির পুরা নাম গঙ্গাধর অধিকারী। জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু ধর্ম্মে বা আচার ব্যবহারে ইনি যে কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত তাহা জানিবার উপায়

নাই। ইঁহার পিতা এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেরেস্তায় চাকুরী করিতেন। এবং তিনিই সহরের প্রায় প্রান্তভাগে সুবিধায় একখানি বাগানবাড়ী ক্রয় করিয়া স্থায়ী বাসীন্দা হন। গঙ্গাধর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তিনি অনেক চেষ্টা যত্ন করিয়া পুত্রকে রুড়কীর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। পুত্র সেখানে প্রায় একবৎসর পড়িয়া পিতার অনিচ্ছায় লক্ষ্ণৌর মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতে সুরু করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি মিস্ সোনানাম্নী এক বাঙ্গালী খৃষ্টান তরুণীর প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করেন এবং তাহার পর উভয়ে আমেরিকায় 'হনিমুন' করিতে যান। তাঁহার প্রণয়িনীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী নোরা তৎকালে স্বামীর সহিত নিউইয়র্কে বাস করিতেছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, নোরার স্বামীর পদবী এবং নামের আদ্যক্ষরের সহিত গঙ্গাধরের নাম ও পদবীর আশ্চর্য্য রকম সাদৃশ্য ছিল। তবে নোরার স্বামী গণপতির পদবী 'অধিকারী' হইলেও জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। পঠদ্দশায় লক্ষ্ণৌর ইংরেজ সিভিলসার্জ্জনের সুনজরে পড়িয়া তিনি উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পান এবং সেই সূত্রে মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা-কল্পে নিউইয়র্কে গমন করেন। নোরাও তৎকালে আমেরিকান কনসলের পীড়িতা পত্নীর নার্স-রূপে মোটা বেতনে লক্ষ্ণৌ হইতে নিউইয়র্কে উপস্থিত হয়। মেডিকেল কলেজের সংশ্রবে উভয়ের মধ্যে যে স্বল্প পরিচয় ছিল, নিউইয়র্কে অবস্থান কালে তাহা নিবিড় হইয়া উঠে। নোরার সুপারিসের জোরে গণপতি নিউইয়র্কে মেণ্ট্যাল কলেজের সম্পর্কে একটি চাকরী পাইয়া মানসিক ব্যাধি চিকিৎসা বিদ্যার অনুশীলনের সুযোগ পান। দুই বৎসরের মধ্যেই এই বিদ্যায় তিনি এরূপ কৃতিত্ব লাভ করেন যে, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে উচ্চ বেতনে

বিশিষ্ট অধ্যাপকের পদে নিয়োগপত্র লাভ তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া উঠে। অতঃপর নোরাকে বিবাহ করিয়া তিনি নিয়ইয়র্কেই বসবাস করিতে থাকেন।

নোরা যখন আমেরিকায় চলিয়া যায়, সে সময় সোনা তাহার মায়ের নিকট লক্ষ্ণৌএ থাকিয়া ধাত্রী বিদ্যা শিখিতেছিল। নিউইয়র্ক হইতে নোরা এই পরিবারটির খরচ পাঠাইত। কালক্রমে যখন সে সংবাদ পাইল যে সোনাও এক কৃতবিদ্য বাঙ্গালীকে বিবাহ করিতেছে এবং তাহার স্বামীর পদবীও অধিকারী, তখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নোরা নবদম্পতিকে নিউইয়র্কে আমন্ত্রণ করিয়া বসে, এমন কি উভয়ের কেবিন ভাড়ার টাকা পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দেয়। সোনা প্রথমে ইতঃস্তত করিয়াছিল, কিন্তু সুবিধা-বাদী গঙ্গাধর সস্তায় কিস্তি মারিবার এমন সুযোগ ত্যাগ করা সমীচীন মনে করেন নাই। ফলে নোরার অর্থে তাঁহাদের নিউইয়র্ক যাত্রা সম্ভব হইয়া উঠে।

ডাক্তার গণপতি নিউইয়র্কে রাজার হালে বাস করিতেন। নবদম্পতি তাঁহার আলয়ে সাদরে গৃহীত হন এবং গণপতি কৃতবিদ্য আত্মীয়টীকে নিজের প্রাইভেট সেক্রেটারী করিয়া লন। গঙ্গাধর লক্ষ্য করেন, মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে ডাক্তার গণপতির কৃতিত্ব অসাধারণ এবং তিনি এ সম্পর্কে বিস্তর গবেষণাপূর্ব্বক যে সকল অপূর্ব্ব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাদের গুরুত্বও প্রচুর। কিন্তু গণপতি সেগুলি কলেজের শিক্ষার্থীদিগকে শুনাইয়াই নিরস্ত থাকিতেন, ছাপার অক্ষরে রূপায়িত করিবার কোন আগ্রহই তাঁহার ছিল না। সুবিধাবাদী গঙ্গাধরের কূটবুদ্ধি অমনই খুলিয়া যায়। তিনি সেই সকল গবেষণামূলক তথ্যগুলি কপি করিয়া ভারতীয় পত্রিকাসমূহে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া চিকিৎসক-সমাজে এরূপ

চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন যে, ডাক্তার জি, অধিকারীর খ্যাতি সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এ সকল ব্যাপারে লক্ষ্য রাখিবার অবসর যেমন ডাক্তার গণপতির ছিল না, নামের খ্যাতিকেও তিনি তেমনই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

কিন্তু ঘটনাচক্রে একদা এলাহাবাদের মেডিক্যাল জর্ণালে প্রকাশিত মানসিক ব্যাধির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ জি, অধিকারীর লিখিত একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ ডাক্তার গণপতিকে বিস্ময়ান্বিত করিলে গঙ্গাধর দিব্য সপ্রতিভাবে এইরূপ স্বীকারোক্তি করেন: আপনার এ লেখাটা আমিই জর্ণালে পাঠিয়েছিলুম। তার কারণ, এত বড় একটা প্রতিভা কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে সেটা আমার অভিপ্রেত নয়। তাই, আপনার অজ্ঞাতেই আপনার লেখাটা আমাকে চুপি চুপি কপি করে পাঠাতে হয়েছিল।

ডাক্তার গণপতি গঙ্গাধরের এই কৈফিয়ৎ শুনিয়া গম্ভীর মুখে বলেন: আমার অজ্ঞাতেই যখন লেখাটা চুপি চুপি পাঠিয়েছ, তখন এ লেখার নিন্দা বা খ্যাতি তোমারই প্রাপ্য। আমি জানাবো এবং যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে সচ্ছন্দে জানাবো—প্রবন্ধ লেখক ডাঃ জি, অধিকারী—তুমিই।

এই ঘটনার কিছু কাল পরেই মোটর দুর্ঘটনায় ডাক্তার গণপতি এবং তাঁহার পত্নী নোরা শোচনীয়রূপে মৃত্যু বরণ করিলে সুবিধাবাদী গঙ্গাধর তৎকালে বিরলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন: তুমি আমাকে নিষ্কণ্টক করলে, খ্যাতির পথ আমার এতদিনে খুলে দিলে।

নোরা তার তিন বছরের শিশুপুত্রটীর ভার ভগিনীর উপর দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত। দুর্ঘটনার সময় শিশুটী সোনার কাছেই ছিল। দুঃসংবাদটী

শুনিবামাত্র সোনা প্রথমে শোকের আঘাতে মূর্চ্ছা যাইবার মত হইয়াছিল, কিন্তু চাঁদের-কণার মত পিতৃমাতৃহীন শিশুটীর মুখের পানে তাকাইয়া তাহাকে বুক বাঁধিতে হয়।

দুর্ঘটনার পর গঙ্গাধরকে স্বার্থগত সুবিধার অনুরোধে আরও কিছুকাল নিউইয়র্কে থাকিতে হয়। এবং এই সময় অপ্রতিহতগতিতে বিভিন্ন ভারতীয় পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জি, অধিকারী লিখিত মানসিক ব্যাধি সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতে থাকে। উপরন্তু প্রবন্ধের সহিত গঙ্গাধরের ছবি মুদ্রিত হইয়া অনিসন্ধিতসু পাঠকগণকে ডাক্তার অধিকারীর আকৃতির সহিত পরিচিত করিয়া দেয়। অবশেষে নিউ ইয়র্কের পাট তুলিয়া গঙ্গাধর যখন সপরিবার এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার অধিকারীর নাম শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব হইতে সুকৌশলে প্রতিষ্ঠানলাভের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করিয়া রাখিলে, বীজ বপন মাত্রই অঙ্কুরিত হইবার কথা। সুতরাং সত্যকার বিজ্ঞান-সাধক এবং প্রতিভাবান কর্ম্মী গণপতির সুপ্রচুর সঞ্চয় সম্বল করিয়া প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা গঙ্গাধরের পক্ষে কঠিন হইল না। অন্যের প্রতিভা সযত্নে সংগ্রহ করিয়া যে ব্যক্তি কাজে লাগাইবার বুদ্ধি রাখে, তাহাকে 'জিনিয়াস' না বলিলেও অনায়াসে 'ইন্টেলিজেণ্ট' বলা চলে।

কিন্তু সুবিধার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বুদ্ধির প্রভাবে স্বার্থসিদ্ধির পথ এভাবে মুক্ত করিয়াও ডাক্তার অধিকারী সুখী হইতে পারেন নাই। আর্থিক অভাব তাঁহার এতবড় খ্যাতির প্রভাবকেও যেন সর্ব্বদাই আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। নোরার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে গণপতি নিউইয়র্ক হইতে বরাবর তাঁহার মাতাকে প্রচুর সাহায্য পাঠাইতেন। তাঁহাদের শোচনীয়

মৃত্যুর পর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গঙ্গাধরকে তাহা চালু রাখিতে হইয়াছে। এবং এই ব্যাপারে সোণার নির্ব্বন্ধের প্রভাবও পর্য্যাপ্ত। গণপতির বিয়োগে গঙ্গাধরের আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যায় এবং তাঁহার এমন কিছু আর্থিক সঞ্চয় ছিল না যে নিউইয়র্কের ব্যয় বহন করিয়া সাহায্য বজায় রাখা চলে; কিন্তু গঙ্গাধরের এই যুক্তি সোনার নিকট খাটে নাই। মাতা ও কন্যা পত্রযোগে এই পরামর্শ স্থির করেন যে, এলাহাবাদে গঙ্গাধরের পৈতৃক যে বাড়ীখানি খালি পড়িয়া আছে, মাতা তাহার পোষ্যগণকে লইয়া সেখানেই বসবাস করিবেন। ফলে, নিউইয়র্ক হইতেই গঙ্গাধরকে ব্যবস্থাটি পাকা করিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও গঙ্গাধর নিস্কৃতি পান নাই। সাত আটটি প্রাণীর মাথা রাখিবার স্থানের যেন ব্যবস্থা হইল, কিন্তু পেটের ব্যবস্থা কে করিবে? অগত্যা গণপতির গুপ্ত তহবিলের অর্থ যাহা গঙ্গাধর অন্যের অজ্ঞাতে অতি সন্তর্পণে আত্মসাত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অংশবিশেষ তাঁহাকে প্রতিমাসে যথাস্থানে নিয়মিতরূপে দাখিল করিতে হইয়াছে।

সোনার মাতার নাম সারা। নোরা ও সোনা ভিন্ন তাঁহার অপর সন্তান সন্ততি না থাকিলেও পোষ্য সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। যথা—একটি খঞ্জ ভাই, তাহার তিনটি অসহায় মাতৃহারা সন্তান; এক পতি-পুত্রহীনা বিধবা বোন, ছুটি কুকুর, তিনটি বিড়াল, এক জোড়া ছাগল। পোষ্য যেখানে এতগুলি, আয়ের পরিমাণ সেস্থলে মাত্র গুটি পঁয়ত্রিশ টাকা। সারার স্বামী যে প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিতেন, সেখানে সিনিয়ার কর্ম্মচারীদের মৃত্যুর পর অপুত্রক বিধবা সম্বন্ধে 'উইডো পেন্‌সনে'র ব্যবস্থা থাকায় সারা মাসিক পঁচিশ টাকা হারে ভাতা পাইতেন। কিন্তু সারা এই টাকার অধিকাংশ গোপনে সঞ্চয় করিয়া কন্যাদের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেন।

ডাক্তার অধিকারী সোনা এবং নোরার পুত্র ওটিনকে লইয়া যখন এলাহাবাদে আসেন, তখন তাঁহার শাশুড়ী সারা উক্ত পোষ্যগুলিকে লইয়া জামাতার পৈতৃক বাড়ীতে সচ্ছন্দে বসবাস করিতেছিলেন। স্ত্রী সোনা এবং নোরার শিশুপুত্র ওটিনের সহিত পৈতৃক বাড়ীতে উঠিবামাত্রই পোষ্যগুলির প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র তাঁহাকে ত্রস্ত এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ দুটি চক্ষুকে বিস্ফারিত করিয়া তোলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পত্নী সোনা তাঁহাকে অন্তের অলক্ষ্যে চাপা স্বরে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেয়—খবরদার, এ-সব দেখে ভড়কালে চলবে না। এদের নিয়েই আমার মা'র সংসার, আর তোমার এই খ্যাতি-প্রতিপত্তির মূলে আমার মা!

সুতরাং সোনার এই সতর্ক-বাণীকে 'মটো' করিয়া ডাক্তার অধিকারীকে অতি সন্তর্পণে জীবন-তরিটি চালাইতে হইয়াছে। কারণ, তিনি জানেন যে, সোনার অজানা কিছুই নাই। সোনা যদি বিগড়ায়, তাহা হইলে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির উপরের পালিস চটিয়া যাইবে—ধোঁকার টাটি ফুটা হইবে। কাজেই, মনের ক্ষোভ মনে চাপিয়া নির্ব্বিচারেই তাঁহাকে এই বৃহৎ পোষ্যটির যাবতীয় ভার বহন করিতে হইয়াছে এবং নিজের প্রতিপত্তির সহিত পোষ্যদের তুষ্টি বজায় রাখিতে তাঁহার ঋণের বোঝা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আয় বৃদ্ধির আশায় ইদানীং ডাক্তার অধিকারী যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। মানসিক ব্যাধির সঙ্গে অপরাধীদের মনস্তত্ব নির্ণয় করিয়া তিনি অপরাধ তত্বানুসন্ধানেও সুপটু—এই মর্ম্মে ফতোয়া দিয়া কর্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিবার সুযোগ না পাওয়ায় তাঁহার এদিককার আয়ের পথ প্রশস্ত হয় নাই। এই পথটি নিরঙ্কুশ করিতে ডাঃ অধিকারী যখন

ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বসিয়াছেন, সেই সময় ধনকুবের হরপ্রসাদের কন্যার নিরুদ্দেশ বার্ত্তা এবং উদ্দেশকারীর সম্বন্ধে বিপুল পুরস্কার ঘোষণা তাঁহাকে সচকিত করিয়া তোলে। সাগ্রহে তিনি যখন এ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করিতে উদ্যত, ঠিক সেই সময় হরপ্রসাদ স্বয়ং তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হন।

ইহার পর হরপ্রসাদ ডাঃ অধিকারীর প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া কিভাবে তাঁহার উপর কন্যা, বন্ধু এবং বন্ধুপুত্রের অনুসন্ধানের সহিত বাড়ীখানি রক্ষণাবেক্ষনের ভার পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া সপরিবার বোম্বাই চলিয়া যান, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সপরিবার হরপ্রসাদকে এলাহাবাদ ষ্টেশনে বোম্বাই মেলে তুলিয়া দিয়া ডাক্তার অধিকারী যে-দিন বাড়ীতে ফিরিলেন, সোনা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, স্বামীর চিরমেঘাচ্ছন্ন মুখের উপর হঠাৎ যেন জ্যোৎস্নার আভা পড়িয়াছে। কোন্ গগনের চন্দ্রোদয়ে ইহা সম্ভব হইয়াছে তাহার সন্ধানে সে যখন উৎসুক হইয়া উঠিল, তখন অধিকারী নিজেই রহস্যের আবরণটি উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। তখন স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে সংলাপ সুরু হইল, তাহাহইতেই অবস্থাটি উপলব্ধি হইবে।

স্ত্রী: ব্যাপার কি—নতুন শীকার কিছু জুটেছে নাকি ?

স্বামী: শীকার কি না জানি না, তবে একটা টাকার গাছ যে খুঁজে পেয়েছি তা অস্বীকার করব না।

স্ত্রী: তোমার মুখ দেখেই সেটা বুঝতে পেরেছি। এমনি হাসিখুসির ঝিলিক দেখিছি নিউইয়র্কে—আমার ভগিনীপতি যেদিন বিশ্বাস করে সর্ব্বস্ব তোমার হাতে সঁপে দেন।

স্বামী : সর্বস্ব মানে কতকগুলো কাগজপত্রের বাণ্ডিল! সে যাই হোক, তবু আমি তার জন্যে কৃতজ্ঞ। সে ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীতে রেখে সেক্রেটারীর কাজের ভার চাপিয়ে দুটি প্রাণীর-যে ভার নিয়েছিলেন, আর তার জন্যেই অতদিন নিউইয়র্ক-বাস আমাদের পক্ষে [illegible] হয়েছিল, আমি তা কোন দিন অস্বীকার করব না।

স্ত্রী : শুনে কৃতার্থ হলুম, সেটা তাঁরই সৌভাগ্য নিশ্চয়! কিন্তু এটাও স্বীকার করা উচিত বোধ হয় এই সঙ্গে, তখন তিনিই হয়েছিলেন তোমার সৌভাগ্যের গাছ; চুপি চুপি একটি একটি করে গাছটির ফুল পাতা সব ছিঁড়ে নিজের জন্যে খ্যাতির মালা গেঁথেছিলে। যাক সে কথা, এখন টাকার গাছটি হয়েছেন কে শুনি? ওকি, মুখখানা যে আবার অন্ধকার হয়ে গেল!

স্বামী : তোমার জন্যেই। জোরে একটা ফুঁ-দিয়ে আলোটি নিবিয়ে দিলে—অন্ধকার হবেই ত!

স্ত্রী : সে দোষ কার? আমার কাছে নিজের বড়াই করতে তোমার লজ্জা করে না? লোকের চোখে ধোঁকা দিয়ে বাহাদুরী দেখাচ্ছ—দেখাও, তাতে ত আমি কিছু বলিনি। কিন্তু আমি ত সব জানি—আসলে ডাক্তার জি, অধিকারী লোকটা কে? ভাগ্যিস তোমার বাবা নামটা গঙ্গাধর রেখেছিল, তাই না আমার ভগিনীপতি গণপতি ওরফে জি, অধিকারীর নামেই তরে যাচ্ছ। সে বেচারা বিদেশে কবরে ঢুকে তোমাকে স্বদেশের সভা-সমাজের অন্তরে ঠাঁই দিয়ে গেছেন, তাঁরই সঞ্চয় তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—এত বড় সত্য কথা তুমি আমার কাছে চাপতে চাও কেন?

স্বামী : কি জান, নিউইয়র্কের অর্থাৎ তোমার ভগিনীপতির ব্যাপার-

টাকে চাপা দিয়ে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলিছে বলেই আমার ধারণা। কাজেই কোন ফাঁক দিয়ে সে-প্রসঙ্গ বেরুলেই চমকে উঠি—শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাই। যাক্, আমার অনুরোধ—যেটা চাপা পড়ে গেছে, তার ঢাকাটি আর খুলো না, লক্ষ্মীটি !

স্ত্রী : ঢাকায় চাপা জিনিষটিই ত হচ্ছে তোমার ঈসের মূল. গো ! ফোঁস্ করলেই ঢাকা খুলতে হয়।

স্বামী : ফোঁস করি কি সাধে! তোমার মা'র এক পাল পুষ্যিকে রাজার হালে পুষতে হচ্ছে বাড়ীতে রেখে। তার ওপরে আছে—তোমার ভগিনীপোতের ছেলে। যা উপায় করি, কুলোয় না ; দেনায় মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে যাবার জো হয়েছে।

স্ত্রী : তার জন্যে এখন চুল ছিঁড়ে ত কোন লাভ নেই! আমার ভগিনীপতি বরাবরই এই পোষ্যগুলির ভার বহন করেছেন—নিউইয়র্ক থেকে প্রতি মাসে টাকা পাঠিয়েছেন। তাঁর অবর্ত্তমানে তুমি যখন তাঁর নাম খ্যাতি প্রতিপত্তির সুযোগ সুবিধা সব নিয়েছ, এ ভার ত তোমাকে নিতেই হবে। তারপর, ছেলের ব্যাপারে তোমার লাভ বই লোকসান নেই। দিদির ছেলেকে আমিই কোলে করে মানুষ করেছি, সে জানে আমিই তার মা। নিউইয়র্কের ব্যাঙ্কে তার নামে যে টাকা জমা আছে, সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত তুলতে না পারলেও, যে-সুদ পাচ্ছ মাসে মাসে, তাতে তার সব খরচ চলে যাচ্ছে। বোঝ সব, বোঝা টেনেও যাচ্ছ, তবু মাঝে মাঝে ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার মতন বেগড়ানো চাই-ই।

স্বামী : তাতেও ত পার নেই—সঙ্গে সঙ্গে অমনি চাবুক হাঁকরে দুরস্ত করবার গাড়োয়ানও ত মোতায়েন আছে। যাক্, এখন থেকে না হয় হুঁসিয়ার হওয়া যাবে।

স্ত্রী: আগেই থেকেই এ সুবুদ্ধিটুকু উদয় হলে এত কথা উঠত না। এখন, যে কথা থেকে এত কথা উঠল, সেটাই শুনি! টাকার গাছটি হলেন কে?

স্বামী: নাম করা মার্চ্চেণ্টস্ মেসার্স এইচ, পি, ঘোষের নাম শুনেছ ত? তারই মালিক—হরি ঘোষ।

স্ত্রী: মনে পড়েছে। মেয়ে হারাবার পর তার বন্ধুর মাথা বিগড়োয়। তোমাকে কল দিয়েছিল শুনিছি। তাকে বুঝি সারিয়েছ?

স্বামী: না। সেও হারিয়ে গেছে। সন্ধান চলেছে। এখন হারানো মেয়ে, বন্ধু আর তার একটি ছেলে—এদের যদি কিনারা করতে পারা যায়, টাকার ভাবনা চুকে যাবে। তিনি আমার ওপরেই সমস্ত ভার দিয়ে [illegible]জ বোম্বাই চলে গেলেন।

স্ত্রী: এ যে সেই গাছে কাঁঠাল আর গোঁফে তেল দেবার জো দেখছি! সন্ধান করলে তবে ত···

স্বামী: আমি এত বোকা নই। সন্ধানের ব্যাপারে দশ হাজার টাকার চেক আগাম পেয়েছি। তা ছাড়া, ওঁর প্যালেসের মত নতুন বাড়ী আমার জিম্বাতেই দিয়ে গেছেন।

স্ত্রী: বল কি?

স্বামী: দরকার পড়লে বা এদের কোন নিশানা বার করতে পারলে আরো টাকা তিনি ঢালবেন।

স্ত্রী: তবে ত সত্যিই টাকার গাছ পেয়েছ গো! তাহলে এখন ভরসা করে কথাটা তোমাকে বলি···

স্বামী: আবার কি কথা বলবে? সুর ত ভাল মনে হচ্ছে না।

স্ত্রী : ভূমিকা না করেই তাহলে বলি শোন ; পুষ্যির আর একটি ভার তোমাকে নিতে হবে।

স্বামী : বল কি ?

স্ত্রী : চমকাবার মত কিছু নয়। আট বছরের একটি মেয়ে। আমার ছোট মাসীমা সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন, মেয়েটি তাঁরই দূরসম্পর্কের ভাসুর-ঝি, তিনকূলে তার কেউ নেই। আর মাসীমার অবস্থা ত জান, কোন রকমে তাঁদের দিন চলে। মেয়েটিকে পোষবার শক্তি তাঁর নেই। তাই বড় মুখ করেই এখানে পাঠিয়েছেন।

স্বামী : চমৎকার !

স্ত্রী : কিন্তু মেয়েটিকে দেখলে চোখ ফেরাতে পারবে না, তখন মুগ্ধ হয়েই বলতে হবে—চমৎকার !

স্বামী : এখন বুঝতে পারছ ত, ঘোড়া সাধ করে বিগড়োয় না।

স্ত্রী : কি দুঃখেই বা বিগড়োবে শুনি ? ঐ মেয়ের আয় পয়েই তুমি টাকার গাছ পেয়েছ তা জান ? যদি ভাল চাও, ভারটি খুসি মনেই নাও, হেলা ক'র না তাকে। ঐ দেখ, মেয়েটি এসে ঝাঁকে মিশে গেছে, খেলছে বাগানে ; দেখতে দিব্যিটি—নয় ?

সোনার কথা খণ্ডন করা কোন দিনই ডাক্তার অধিকারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না, এ ক্ষেত্রেও তাহা অখণ্ডনীয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। কারণ, গৃহ সংলগ্ন ক্ষুদ্র উদ্যানে ক্রীড়াশীল বালকবালিকাদের মধ্যে নবগত মেয়েটির সুশ্রীসুন্দর আকৃতি তাঁহার চোখে পড়িতেই মস্তিষ্কের মধ্যে ঝাঁ করিয়া একটা সঙ্কল্প অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। হরপ্রসাদের নিরুদ্দিষ্টা কন্যা রেণুর আলেখ্যটি তাঁহার স্মৃতির পাতায় গাঢ় ভাবেই মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, নবাগতা এই মেয়েটির দেহভঙ্গি এবং মুখখানি সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁহার

স্নায়ুপুঞ্জে এই মর্ম্মে আর একটি নূতন পরিকল্পনা জাগ্রত করিয়া তুলিল··· রেণুর চেহারার সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে নয়?···যদি রেণুর সন্ধান না-ই মেলে, বছর কয়েক পরে এই মেয়েকেই শিখিয়ে পড়িয়ে রেণু বলে চালিয়ে দেওয়া কি সম্ভব নয়?···

মনের ভাব মনেই প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ডাক্তার অধিকারী স্মিতমুখে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন: মেয়েটির নাম কি?

পত্নী বুঝিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে। হাসিয়া উত্তর দিলেন: ওর ভাল নাম রুমেনী। কিন্তু সবাই রিনি বলে ডাকে।

স্বামী: এই সর্ত্তে আমি মেয়েটিকে পুষতে পারি—নিজের ইচ্ছামত আমি ওকে তৈরী করব। বাড়ীর এই যে ঘেরা আর আলাদা অংশটিতে আমরা থাকি, এই অংশেই রিনি থাকবে। কিন্তু তার থাকা, খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, লেখা-পড়া সব কিছুই আমার ব্যবস্থামত হবে।

স্ত্রী: তা যেন হল, কিন্তু আমাদের ঘর-দালান ওকে ছেড়ে দিয়ে আমরা কোথায় যাব? এত টান দেখে ভয় করছে যে!

কণ্ঠস্বর তরল করিয়া ডাক্তার বলিলেন: আট বছরের খুকির ওপর আটচল্লিশ বছরের বুড়োর টান দেখে ভয় পাবার কিছুই নেই। রিনির থাকার ব্যবস্থা করে আমরা অবশ্য রাস্তায় দাঁড়াব না। তবে বাসা আমাদের বদলাতে হবে।

বিস্ময়ের সুরে স্ত্রী প্রশ্ন করিলেন: তার মানে?

স্বামী: মানে হচ্ছে—হরপ্রসাদ ঘোষের বাড়ীখানা খালি পড়ে থাকবে না, আমরা সেখানে থাকবো। তুমি, আমি আর ওটিন। এখানে ওঁরা সব যেমন আছেন থাকবেন, আর আমাদের ঘরে নজরবন্দী থেকে মানুষ হবে রিনি। অবশ্য এ-ব্যাপারে একটা উদ্দেশ্য আছে।

স্ত্রী : সে উদ্দেশ্য আমি বুঝিছি।

স্বামী : বল কি ?

স্ত্রী : সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। তোমার মুখের কথার সুর ধরেই আমি বলতে পারি শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়াবে। উদ্দেশ্যটি হচ্ছে—যদি হরপ্রসাদের মেয়েকে খুঁজে পাওয়া না যায়, রিনিকেই পরে সেই মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া। তার জন্যে এখন থেকেই চুপি চুপি শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া চাই—এই ত ?

স্বামী : তুমি সত্যিই অদ্ভুত !

স্ত্রী : তোমার চেয়েও ? কিন্তু তুমি যে গোড়াতেই গলদ করছ ! রিনিকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করে নিতে হলে আমার মাকে আড়ালে রাখলে চলবে না। এ সব ব্যাপারে মা'র আমার মাথা যেমন পাকা, তেমনি খেলে। স্বচ্ছন্দে তুমি মা'র ওপর ভার দিতে পার। অবশ্য মাথার ওপরে তুমি থাকবে।

স্ত্রীর যুক্তিটি ডাক্তার অধিকারীর মনে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন : এ কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। কোন মেয়েকে মনের মত তৈরী করে নিতে হলে কোন বিচক্ষণ মেয়েকেই যে আবশ্যক, আমার সায়েন্সও তাই বলে। বেশ, মা'কে ডেকে এখনি কথাটা ঠিক করে ফেলা যাক্। তবে একটা কথা, ফাঁস হলেই মুস্কিল, তখনি সব ভেস্তে যাবে।

মুখখানি শক্ত করিয়া সোনা কহিল : মনের কথা পেটে চেপে রেখে কাজ গুছুতে মা-আমার কি রকম শক্ত, আজও কি সেটা বুঝতে পার নি ? তুমি যা যা চাও, মাকে তার একটু আভাস দিলেই হবে, পরে মার কেরামতী দেখে নিজেই চমকে উঠবে।

ডাক্তার অধিকারীর মুখে পুনরায় হাসির ঈষৎ রেখা পড়িল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি কহিলেন : বেশ, তাহলে মাকেই ডাকো, ব্যবস্থা পাকা করা যাক্।

হরপ্রসাদের সুবৃহৎ বাড়ীর যে অংশটি আত্মীয়স্বজন বা সম্মানভাজন অতিথি অভ্যাগতদের সাময়িক অবস্থিতির জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, ডাক্তার অধিকারী তাহা অধিকার করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারটি পাতিয়াছেন। ধনী গৃহস্বামীর সুসজ্জিত বৈঠকখানাটি এক্ষণে ডাক্তার অধিকারীর মনোবিজ্ঞানাগারে পরিণত হইয়াছে। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীর বিভিন্ন অবস্থার বিলাতী চিত্রাবলী ঘরখানির দেওয়ালগুলি আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। চিকিৎসাগ্রন্থপূর্ণ তুইটি বড় বড় বুক-কেস আসিয়া ঘরের গাম্ভীর্য্য বাড়াইয়া দিয়াছে। বৈঠকখানায় এখন ঢুকিলেই সম্মুখে সুবৃহৎ মুকুরটির উপর আমেরিকান ফ্রেমে বাঁধানো ডাক্তার অধিকারীর আলেখ্য-খানি প্রথমেই আগন্তুকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে স্ত্রী সোনা এবং ওটিন। বারো তেরো বছরের সুশ্রী সুন্দর ছেলেটির মুখখানি তাহার লোকান্তরিতা মাতার মুখমণ্ডলের যেন প্রতিচ্ছবি। নোরা ও সোনা দুই ভগিনীর আকৃতির সাদৃশ্যও ছিল অদ্ভুত রকমের। সুতরাং সোনার কাছে ওটিনকে দেখিলে সে যে তাহারই গর্ভজাত সন্তান নয় একথা জোর করিয়া বলিয়া না দিলে কাহারও সন্দেহ করিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু ডা: অধিকারীর চেহারার সহিত ছেলেটির আকৃতির বিশেষ কোন সাদৃশ্য ছিল না। এদিক দিয়া ওটিনের দেহের গঠন ছিল তাহার পিতার মতই ঋজু ও দীর্ঘায়ত। তথাপি,

সকলেই—এমন কি ওটিন পর্য্যন্ত জানে যে, সোনার গর্ভেই সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ডাক্তার অধিকারীর একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী সে। অবশ্য সোনার মা সারার কাছে ইহা প্রচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হয় নাই। তিনি ইহা জানিতেন এবং তাঁহার এই পিতৃমাতৃহীন দৌহিত্রটিকে নিজের পুত্র বলিয়া পরিচিত করার জন্য কন্যা-জামাতার বুদ্ধির প্রশংসাও করিতেন। কিন্তু বুদ্ধিমান জামাতা ভালোভাবেই বুঝিতেন যে, এজন্য এই মহিলাটি তাঁহার সৌভাগ্যের ভিত্তির দিকে তাকাইয়া নিজের সুযোগ সুবিধাগুলি সুচারুরূপে গুছাইয়া লইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। কোনরূপে তাঁহার সামান্য ত্রুটিতে যদি কোন দিন পান হইতে চূণটুকু খসিয়া পড়ে তাহা হইলে এই ধোঁকার টাটিও একদিনেই ছিঁড়িয়া ফাঁক হইয়া যাইবে।

আর, এ সম্বন্ধে সোনার কি মনোভাব তাহা স্বামি-স্ত্রীর সংলাপে পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে। পোষ্যবর্গের সহিত মাতাকে স্বামীর গলগ্রহ জানিয়াও সোনা যেন জোর করিয়া মায়ের মর্য্যাদাটুকু বাঁচাইয়া চলিত এবং স্বামীকে এ সম্পর্কে অসহিষ্ণু বা বিরক্ত হইতে দেখিলেই ধোঁকার টাটিখানি ধরিয়া নাড়া দিত। এমনই একটি ব্যাপারের মধ্যেই ঘটনার স্রোত যায় অপ্রত্যাশিভাবে অন্যদিকে ঘুরিয়া। সোনাই বুদ্ধি করিয়া নেপথ্য হইতে মাতাকে আনিয়া উপদেষ্টীর আসনে বসাইয়া দেয়।

সারা একটু সঙ্কুচিত ভাবেই আত্মীয়স্থানীয়া সর্ব্বহারা বালিকাটিকে জামাতার সংসারে আনিয়াছিলেন, কিন্তু পরে কথা-প্রসঙ্গে যখন জানিতে পারেন যে, জামাতা বাবাজী এই দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী ও সুদর্শনা মেয়েটিকে হাতের পাঁচ রূপে ধরিয়া রাখিয়া একটা মোটা রকম দাঁও মারিবার ফিকিরে

তাঁহারই স্মরণাপন্ন, তখন তাঁহার অন্তর্নিহিত সঙ্কোচটুকু অন্তরের অন্তস্তলে কোথায় যে তলাইয়া যায়, আর অতিলোভের একটা উদ্দাম লালসা সেই স্থানটি জুড়িয়া বসে, তাহা বোধ হয় সারা নিজেই স্থির করিতে পারে নাই। হরপ্রসাদের কন্যা রেণুর নিরুদ্দেশবার্ত্তা এবং সেই নিরুদ্দিষ্টা কন্যাটির সন্ধানকল্পে ধনী পিতার কোষাগারের দরজাটি অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইবার কথা সারা ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। এখন তাঁহার জামাতার অদৃষ্টেই সেই সৌভাগ্যদ্বারের পুরোভাগে দাঁড়াইবার সুযোগ ঘটিয়াছে এবং ঘটনাক্রমে যে চাবিটি তিনি কুড়াইয়া পাইয়াছেন, মাজিয়া ঘসিয়া সেটিকে কোনক্রমে তালায় লাগাইতে পারিলেই যে ঐ বদ্ধ দরজাটি উন্মুক্ত হইয়া যাইবে—ইহা উপলব্ধি করিয়া তিনি জামাতাকে আশ্বাস দেন,—কাজটা যদিও খুব শক্ত, গাধা পিটে ঘোড়া বানানোর মত, কিন্তু হবে না—এ কথা আমি বলব না। তবে বাপু, এ সব তাড়াহুড়োর কাজ নয়। অনেক কাঠ-খড় এর পিছনে পোড়াতে হবে। তাহলেও ভরসা তোমাকে দিতে পারি, আমার কথামত যদি চল, বছর কয়েকের ভিতরে এই মেয়েকে আমি ঐ হারানো মেয়ে রেণু করে তাক লাগিয়ে দেব।

কাজেই অতঃপর শাশুড়ীর সহিত পাকাপোক্তভাবে ডাক্তার অধিকারীর যে-সব কথাবার্ত্তা হয়, তদনুসারেই পরবর্ত্তী কার্য্যধারা চলিয়া আসে। যথা—

পিতৃ ও মাতৃকুল সম্বন্ধে রেণুর বয়সী অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে যতটুকু সংবাদ রাখা সম্ভব, তাহাদের একটা বৃত্তান্ত।

তাহার বেশ-ভূষা, পড়া-শুনা, খাওয়া-দাওয়া, খেলা-ধূলা, হাসি-খুসি, রাগ-অভিমান প্রভৃতির একটা হিসাব। এবং তাহার পক্ষে স্মরণীয় সাংসারিক ঘটনাগুলির ফিরিস্তি।

বোম্বায়ের ঠিকানায় পত্র লিখিয়া হরপ্রসাদের নিকট হইতে উল্লিখিত তথ্যগুলি ডাক্তার অধিকারীকে সংগ্রহ করিয়া শাশুড়ীর সেরেস্তায় দাখিল করিতে হইয়াছে। এই সঙ্গে রেণুর বিভিন্ন বয়স এবং ভঙ্গির আলেখ্যগুলিও আসিয়াছে। এই সমস্ত উপাদানগুলি সাজাইয়া তাহার মধ্যে রিনি নামে নবাগতা বালিকাটিকে বসাইয়া সারার শিক্ষাদান কার্য্য বিচিত্র প্রণালীতে চলিয়াছে।

ডাক্তার অধিকারীও নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহাকেও ইতিমধ্যে কয়েকটি কাজ সন্তর্পণে সমাধা করিতে হইয়াছে। যথা—

হরপ্রসাদের নিরুদ্দিষ্ট বন্ধু শম্ভুনাথ বসু সম্পর্কে পরিচিত বন্ধু বা আত্মীয়-বর্গের উদ্দেশে এই মর্ম্মে একটি বিজ্ঞাপন যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বঙ্গদেশের পত্রিকাগুলিতে মুদ্রিত হইয়াছে যে অবিলম্বে শম্ভুনাথ বা তাঁহার পুত্রের ঠিকানা পাঠাইয়া তাঁহারা যেন পিতা পুত্রের সৌভাগ্যোদয়ে সাহায্য করেন।

হরপ্রসাদের কন্যা রেণুর সম্বন্ধেও এই ভাবে নব পরিকল্পনায় বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে এবং উভয় বিজ্ঞাপনের কাটিংসগুলি বোম্বায়ে হরপ্রসাদের নিকট কেতাদুরস্তভাবে পাঠাইয়া ডাক্তার অধিকারী কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। হরপ্রসাদও এই বিচক্ষণ ব্যক্তির সময়োচিত তৎপরতায় বিশেষ প্রীত এবং আশ্বস্ত হইয়াছেন।

কিন্তু পঁচিশ ত্রিশখানি পত্রিকায় উপর্য্যুপরি কয়েক সপ্তাহ বিজ্ঞাপন প্রকাশের বহুবাঞ্ছিত ফলটি একদা একখানি পোষ্টকার্ডকে বাহন করিয়া বারাণসীর 'প্রবাস-জ্যোতি' পত্রিকার মারফত এলাহাবাদে ডাক্তার অধিকারীর হস্তগত হইল। উক্ত পোষ্টকার্ডখানির ভিতরে বাঙ্গালা অক্ষরে যে কয়টি ছত্র লেখা ছিল তাহা এইরূপ :

বক্স নং ৫৫২৮, প্রবাস জ্যোতি, বেনারস সিটি

মহাশয়, উক্ত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিয়া সবিনয়ে জ্ঞাপন করিতেছি যে, প্রায় দেড় বৎসর হইতে চলিল শম্ভুনাথ বসু তাঁহার সাত বছরের ছেলে নরনারায়ণকে আমাদের আশ্রয়ে রাখিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে কোন সংবাদই আমরা জ্ঞাত নহি। তবে তৎপুত্র নরনারায়ণ বাবাজীবন এক্ষণে আমার বাসাতেই থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছে। যেহেতু, বর্ত্তমানে আমিই তাঁহার মাতুল এবং অভিভাবক। আমার ঠিকানা নিম্নে জানাইতেছি। ইতি—

বিনীত—শ্রীনিবারণচন্দ্র মিত্র

অডিট অফিস, দানাপুর, ই, আই, আর।

চিঠিখানি এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া ডাক্তার অধিকারী ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। পোষ্টকার্ডে লিখিত কালির বিবর্ণ হরফগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া যেন তাঁহার সম্মুখে এমন একটি সুন্দর সুশ্রী শ্রীমান্ বালকের মূর্ত্তি ধরিল—যাহা ঠিক ওটিনের অনুরূপ। হরপ্রসাদের মুখে অন্তত পঞ্চাশবার তিনি বন্ধুপুত্র নরনারায়ণের নাম এবং রূপের খ্যাতি শুনিয়াছেন, এবং শ্রুত অভিব্যক্তিটুকু শুধু একখানি চিত্রপট হইতেই উদ্রিক্ত। কল্পিত মূর্ত্তিটির সহিত ওটিনের অভিজাত-সুলভ কমনীয় আকৃতির তুলনা করিয়া ডাক্তার অধিকারী আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন: নরনারায়ণ···বাপরে, কি লম্বা নাম? নামের মত ছেলেটির রূপটাও সত্যিই বাড়াবাড়ি রকমের নাকি—ওটিনের চেয়েও···

কল্পনার মূর্ত্তি অদৃশ্য হইতেই বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিলেন, ধবধবে সাদা সার্ট-পেন্টুলনে সজ্জিত হইয়া ওটিন ঘরে ঢুকিতেছে, হাতে তাহার সুশ্রী র‍্যাকেট। প্রত্যহ বৈকালে ঠিক এই সময় তাহাকে ডাক্তার অধিকারীর সহিত

পুরাতন বসতবাটীতে গিয়া দিদিমাকে দর্শন দিতে হয়। আর রিনিও সেখানে সাগ্রহে তাহার এই খেলার সাথীটির প্রতীক্ষা করে। অন্দর-সংলগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত ক্ষুদ্র উদ্যানটিতে একটি ঘণ্টা ধরিয়া ইহাদের ব্যাটমিণ্টন খেলা চলিতে থাকে।

ওটিন কক্ষে প্রবেশ করিয়াই ডাকিল: বাপু!

ডাক্তার অধিকারীকে নিউইয়র্ক হইতেই সে 'বাপু' এবং সোনাকে 'মাপু' বলিয়া ডাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছে।

ডাক্তার অধিকারী বলিলেন: তৈরী হয়েই এসেছ একবারে,—বেশ। তোমার মাপু কোথায়?

ওটিন উত্তর দিল: বাগানে ফুল তুলছেন।

ডাক্তার বলিলেন: আজ তিনিও আমাদের সঙ্গে ও-বাড়ীতে যাবেন।

ওটিন: মাপুকে ডাকি তাহলে?

ডাক্তার: না, আমিই ডেকে আনছি। তুমি দেখ, কোচোয়ান গাড়ী জুতেছে কি না।

ডাক্তার অধিকারী চিঠিখানা হাতে করিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার বাসভবনসংলগ্ন উদ্যানটির দিকে চলিয়া গেলেন। ওটিন র‍্যাকেটটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে দেউড়ির দিকে ছুটিল।

সহরের শেষ প্রান্তে এমন নিভৃত অংশে ডাক্তার অধিকারীর পিতৃক উত্থান-ভবনটি অবস্থিত যে, তাহার আশে পাশে লোকালয়ের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। ঘনসন্নিবিষ্ট বিভিন্নজাতীয় বৃক্ষরাজির অনাবশ্যক প্রাচুর্য্যে বাড়ীখানাকে যেমন বিশ্রী দেখায়, হঠাৎ দেউড়ীর নিকট আসিলেও বুঝিবার উপায় থাকে না যে এই বাড়ীতে লোকজন বসবাস করিয়া থাকে। ঘটনাচক্রে বাড়ীখানির এই গাম্ভীর্য্য এবং রীতিমত নির্জ্জনতা বর্ত্তমানে ডাক্তার অধিকারী তথা গৃহকর্ত্রী সারা দেবীর খুব কাজে লাগিয়া গিয়াছে।

বাহিরের অনুচ্চ দেউড়ীর পর বাগানের প্রস্তরবদ্ধ সঙ্কীর্ণ পথটি ভিতরের বৃহৎ ফটকে গিয়া মিলিয়াছে। ফটকের সুদৃঢ় ও সুউচ্চ দ্বার দুইটি সর্ব্বক্ষণই রুদ্ধ থাকে। দেউড়ীর দুই দিক দিয়া পুরাকালের প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্ভেদ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরটি ভিতরের দুইমহল বাড়ী বাগান কূয়া এবং এক পুষ্করিণীকে দুর্গের মত পরিবেষ্টন করিয়াছে। সুতরাং বাহির হইতে ভিতরের অবস্থা এক নজরে দেখিয়া উপলব্ধি করিবার সুযোগ সুবিধা কোথায়?

বাড়ীর মধ্যে যে সাজানো ঘরখানি ডাক্তার অধিকারী ব্যবহার করিতেন, এখন তাহা রিনির শিক্ষাগারে পরিণত হইয়াছে। সারা কিছুকাল লক্ষ্ণৌর এক মিশনারী বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। সুতরাং রিনিকে মনের মত করিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া লইবার দায়িত্ব তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আসলে কিন্তু এই বিদ্যাশিক্ষা

পারটি গৌন, মুখ্য হইতেছে হাতে-কলমে এবং অখণ্ড মনোনিবেশ কারে এমন কতকগুলি অবাস্তব বিষয় জোর করিয়া শিক্ষা দেওয়া— যা আট নয় বছরের এই মেয়েটিকে যেমন কৌতূহলাক্রান্ত করিয়া তুলে, মনই মধ্যে মধ্যে তাহার নির্ম্মল কোমল অন্তরটি রীতিমত বিক্ষুব্ধ করিয়া সাবাসা চক্ষু দুইটি অশ্রুর বন্যায় ভাসাইয়া দেয়।

আজ এই শিক্ষারই পরীক্ষা চলিতেছিল। একখানি সোফায় বসিয়া রা প্রশ্ন করিতেছিলেন, রিনি তাঁহার সামনেই মুখখানি ভার করিয়া ড়াইয়াছিল। তাহার পরণে রক্তবর্ণের একখানি একলাই সাড়ী, লাল নমে বাঁধা লম্বা বেণীটি পীঠের উপর দোল খাইতেছে। হাতে চারিগাছি রয়া কাচের চুড়ি, কানে ছোট ছোট দুটি ইয়ারিং। মুখখানি সুন্দর শ্রী চমৎকার, মুখের ভঙ্গি সপ্রতিভ, মর্ম্মস্পর্শী; চোখ দুটি টানা টানা ং কালো কালো তারা দুটির মধ্যে দৃষ্টিশক্তির একটা স্বচ্ছ আলো যেন া জ্বল করিতেছে।

সারা শিক্ষয়িত্রীর মত মুখখানা গম্ভীর করিয়া মেয়েটিকে বলিতেছিলেন: াজ যা জিজ্ঞাসা করব, ভুল যদি হয়, ভারি অন্যায় হবে কিন্তু রিনি।

রিনি একদৃষ্টে তাহার এই নূতন ভাগ্যবিধাত্রীর পানে মুখ তুলিয়া চাহিয়া ইল: আমি ত ভুলবনা মনে করি, কিন্তু মিছি মিছি বলতে গেলেই ল করে মরি। আচ্ছা, আমি ত রিনি, খালি খালি রেণু হতে যাব কেন?

জোরে একটা ধমক দিয়া সারা বলিলেন: ফের ঐ কথা? হেন ন নেই—কথাটা তুমি না তুলেছ? দুশোবার তোমাকে বলা হয়েছে— খন থেকে তুমি রিনি নও, রেণু। তোমার নাম হচ্ছে—কুমারী রেণুবালা াষ। ভুল যাতে না হয়, সেজন্যে নামটা মুখস্থ করতে বলা হয়েছে। াজ কতবার মুখস্থ করেছ শুনি?

রিনি উত্তর দিল : গুনে গুনে কুড়িবার মুখস্থ করিছি—আমি রেণু, আমি রেণু, আমি রেণু—

সারা : তবু ভুল কর কেন?

রিনি : জিজ্ঞাসা করলেই অমনি খপ করে মনে পড়ে যায়—আমি রিনি, আমার নাম কুমারী রিনি রায়।

সারা : ফের যদি ঐ কথা বল, মুখে কিন্তু গোবর গুঁজে দেব তা বলে রাখছি। তোমার মত ভুলো-মন মেয়ে যদি দুটি দেখেছি।

রিনি : আচ্ছা, আমি আর ভুল করব না, এখন থেকে খালি খালি মনে মনে মুখস্থ করব—আমি রিনি নই—রেণু; আমি রিনি নই—রেণু।

সারা : হ্যাঁ, তাই করবে। আর মনে রেখ, তোমার ভালর জন্য এটা করা হচ্ছে। রিনি হয়ে ত এতদিন ছিলে, কত কষ্টে মানুষ হয়েছ, জান ত? পেটভরে দুবেলা খেতেও পেতে না, এ রকম কাপড় পরেছ কোন দিন এখানে আসবার আগে? যদি ভুল আর না হয়, দেখবে আরও কত কি পাও, কাপড় জামা সেমিজ গয়না, সোনার চুড়ি—

কথাগুলি এমন সুরে সারা বলিলেন যে, লোভে ও আনন্দে রিনির মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল। চোখে মুখে হাসি ফুটাইয়া সে কহিল: সত্যি? চুড়ি পাব আমি—চুড়ি? সোনার চুড়ি?

সারা কহিলেন : হ্যাঁ, সোনার চুড়ি। কাচের চুড়ি তোমাকে আর পরতে হবে না, দেখবে তখন কি সুন্দর চুড়িই গড়িয়ে দিই।

উল্লাসে করতালি দিয়া বালিকা বলিয়া উঠিল বা—বা, কি মজা! আমার চুড়ি হবে—সোনার চুড়ি, আমি সবাইকে দেখাব।

সারা : দেখিও, কিন্তু আগে ত কথাগুলো ঠিকমত মুখস্থ কর, ভুল যাতে না হয়।

রিনি : না, আর আমার ভুল হবে না, আমি আর ভুলেও ভাববো না যে আমি রেণু নই—রিনি! দেখুন আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আর কেমন ভুলি!

প্রসন্নমুখে এবার সারা প্রশ্ন করিলেন : আচ্ছা, এবার বলত লক্ষ্মীটি—তুমি কে? তোমার নাম কি?

রিনি মুখস্থ পড়া বলার ভঙ্গিতে উত্তর দিল : আমি রেণু। আমার নাম কুমারী রেণুবালা ঘোষ।

সারা : তোমার বাবার নাম মনে আছে ভেবে বল, যা শিখিয়েছি।

রিনি : বলছি; আমার বাবার নাম হচ্ছে—নাম হচ্ছে—শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ ঘোষ।

কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া এইভাবে রিনির শিক্ষার মহলা চলিতেছে। এই সময় রুদ্ধদ্বারে আঘাত পড়িতেই সারা তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন : কে?

বাহির হইতে সোনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল : আমরা এসেছি মা, দরজা খুলুন।

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই ডাক্তার অধিকারী বলিলেন : বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা আপনার 'টিচিং' শুনছিলুম। রিনি আপনার হাতে থাকলে আমাদের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হবে তাতে সন্দেহ নেই।

সোনা রিনিকে নিকটে ডাকিয়া কহিল : তোমাদের ব্যাটমিণ্টন খেলবার সময় হয়েছে বোধ হয়, ওটিন উঠানে জাল খাটাচ্ছে, তোমাকে ডাকছে—যাও।

রিনির মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল, সারার দিকে চোখ দুটি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল : যাই?

সারা বলিলেন : যাও; কিন্তু হুসিয়ার রিনি, নাম পড়ার কথা যদি

কাউকে বলেছ শুনতে পাই, তাহলে সোনার চুড়ি ত পাবেই না, কাচের চুড়িগুলো পর্য্যন্ত কেড়ে নেব।

'এ কথা যে বলতে নেই কাউকে আমি জানি'—বলিয়াই রিনি চলিয়া গেল।

সারা বলিলেন: পাখী পড়াবার মত মেয়েকে পড়াতে হচ্ছে। হাতে-খড়ি দিয়ে সবেমাত্র বর্ণপরিচয় সুরু করানো গেছে। আসল রেণু সত্যিই যদি খোয়া গিয়ে থাকে, অন্তত দুটো বছরের মধ্যে না ফেরে, এই মেয়েকে কি রকম তৈরী করি দেখে নিও। তখন আসল রেণু এলেও পাত্তা পাবে না, নকল সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

ডাক্তার অধিকারী বলিলেন: এদিক দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। এখন ওদিকে আর একটা ফ্যাকড়া বেরিয়েছে। শুনেছেন ত মিষ্টার ঘোষের ধনুর্ভঙ্গ পণ, শম্ভুনাথের ছেলেকে যদি পাওয়া যায়, তাকেই মেয়ের জায়গায় বসিয়ে মানুষ করবে। এমন কি, রেণু যদি ফিরে আসে, তারই সঙ্গে ঐ ছেলেটার বিয়ে দেবে। তাঁর নির্দ্দেশ মতই কাগজে ছেলেটার সন্ধানে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছিল। ভেবেছিলুম, কেউ সাড়াশব্দ বুঝি দেবে না। কিন্তু আজ এই পোষ্টকার্ডখানা এসেছে তার সন্ধান নিয়ে, পড়ে দেখুন।

পোষ্টকার্ডখানি শাশুড়ীর হাতে দিয়া ডাক্তার অধিকারী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন: মিঃ ঘোষের হাতে এ চিঠি পড়লে আর রক্ষা থাকবে না, তখনি দানাপুর থেকে ছোঁড়াটাকে আনিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হবেন। কিন্তু তাহলে আমাদের এদিককার চেষ্টাটাই বৃথা হবে। রিনিকে রেণু বলে চালালেও, আমাদের হাত থেকে সরে যাবে, ঐ বন্ধুপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে না দিয়ে মিষ্টার ঘোষ জিদ ছাড়বেন না।

মুখখানা বিকৃত করিয়া সারা বলিলেন: বাঁদরের গলায় পরাবার জন্যেই কি আমরা তাহলে মুক্তার মালা গাঁথছি ভেবেছ? এখন এই চিঠির নিবারণ মিত্তির আর তার ভাগনে নরনারায়ণের নাম দুটো চাপতে হবে।

বিবর্ণমুখে ডাক্তার বলিলেন: কিন্তু বিজ্ঞাপন পড়ে চিঠি যখন পাঠিয়েছে, এখন চেপে রাখলেও পরে যদি জানাজানি হয়ে যায়···

জামাতার কথায় বাধা দিয়া তীক্ষ্মস্বরে সারা বলিলেন: তাহলে তুমি কিসের মনের ডাক্তার শুনি? একটা মেয়ের আগাগোড়া বদলাবার ভার আমি যদি নিতে পারি, দুটো এই তুচ্ছ মানুষের নাম ভুলিয়ে দেওয়া কি এতই শক্ত?

উদ্বেগে চকিত হইয়া ডাক্তার জানিতে চাহিলেন: তাহলে আপনি কি ঐ দুটি প্রাণীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে বলেন?

এই প্রশ্ন শুনিয়া রুষ্টকণ্ঠে সারা কহিলেন: সে কাজ ত গুণ্ডার দ্বারা হতে পারে, তাতে বাহাদুরী কিছু নেই। মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে তোমার কারবার; পরকে বুদ্ধি দাও, আর নিজেই আজ নির্বোধের মত পথ হাতড়াচ্ছ! মাথা খেলাও, উপায় খুঁজে বার কর।

উৎসাহিত হইয়া ডাক্তার কহিলেন: আপনার এই ইঙ্গিতই আমার বুদ্ধির ওপর আলোকপাত করবে এ ভরসা আমি রাখি। বেশ, মাথাই আমি খেলাব, উপায় খুঁজে বার করব।

(১২)

এই ঘটনার তিন দিন পরে ডাক্তার অধিকারী স্বয়ং সশরীরে ই, আই, রেল কোম্পানীর দানাপুর অডিট আফিসে উপস্থিত হইয়া সিনিয়র ক্লার্ক নিবারণ মিত্রের নামে একখণ্ড চিরকুট পাঠাইলেন।

চাপরাসি সে খানি নিবারণ বাবুর হাতে দিতেই তিনি বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন ক্ষুদ্র চিরকুটখানির উপর ইংরাজীতে লেখা রহিয়াছে—

মিঃ অধিকারী—সরকারী অপরাধ তত্ত্ববিদ্

অধ্যাপক নিবারণ বাবু অত্যন্ত ভীতু প্রকৃতির মানুষ, মিঃ অধিকারীর বিশেষণ পাঠ করিয়া তাঁহার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। চাপরাসিকে জিজ্ঞাসা করিলেন : বাবু কোথায়?

চাপরাসি সম্ভ্রমের সুরে কহিল : বাবু নয়, ভারি সাহেব, জমাদার তাড়াতাড়ি খুরসী এনে দিয়েছে। বড় হলে বসে আছেন।

নিবারণের হৃদ্‌কম্প আরও প্রবল হইয়া উঠিল। হাতের কাজ রাখিয়া তিনি দ্রুতপদে আগন্তুকের উদ্দেশে ছুটিলেন।

চাপরাসি সঙ্গে ছিল, সাহেবকে দূর হইতে দেখাইয়া দিল। নিবারণকে দেখিয়াই ডাক্তার বুঝিলেন লোকটা গো-বেচারী শ্রেণীর, তাঁহার চিরকুট পাইয়াই ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিতেই তিনি হাতের একটি অঙ্গুলি কপালের দিকে হেলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনার নাম নিবারণ চন্দ্র মিত্র? শম্ভুনাথ বসুর শ্যালক আপনি?

একটা ঢোঁক গিলিয়া নিবারণ উত্তর করিলেন: আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু…

ডাক্তার তাঁহাকে অন্য কিছু বলিবার অবসর না দিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন: শম্ভুনাথ বসুর পুত্র নরনারায়ণ বসু ত এখন আপনার হেফাজতেই আছে? পুত্র এবং অর্থ—দুইই, কি বলেন?

নিবারণ ঘাবড়াইয়া গেলেন। এই পদস্থ ব্যক্তিটি তাঁহাকে এভাবে প্রশ্ন করিতেছেন কেন, এবং প্রশ্নের উত্তরটি কি ভাবে দেওয়া উচিত—এই দুইটি সমস্যার চাপে পড়িয়া তিনি যেন হাঁফাইয়া উঠিলেন। ডাক্তার তাঁহার এই বিপন্ন অবস্থা উপলব্ধি করিয়া কিঞ্চিৎ সহানুভূতির সুরেই বলিলেন: আপনি যে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, আপনার মুখখানা দেখেই তা বুঝতে পারছি। তহলে এটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, শম্ভুনাথ বোসের সম্পর্কে এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার ঘটেছে, যার জন্যে এই সব প্রশ্ন বাধ্য হয়েই আমাকে তুলতে হচ্ছে! তবে একটা কথা আপনাকে বলি নিবারণ বাবু, আপনার ভগিনীপোতের সম্বন্ধে কোন কিছু লুকাবার চেষ্টা না করাই ভাল, কেননা, তাঁর সব কিছুই আমরা জানি।

নিবারণের মাথার ভিতরটা যেন ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। কোন গুরুতর ব্যাপার না ঘটিলে যে এই ধরণের কথা উঠিতে পারে না—এটুকু বুঝিবার মত সাধারণ বোধ শক্তি তাঁহার ছিল। গলার স্বর তাঁহার জড়াইয়া গেল, কোন রূপে কম্পিত কণ্ঠকে কাশির গমকে কিঞ্চিৎ সামলাইয়া লইয়া তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন: কিন্তু সার, ব্যাপারটা যে কি হয়েছে, শম্ভুনাথ বাবু কি করেছেন, তার ত কিছুই আমি জানিনা, তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে…নিবারণের মুখের কথাটা যেন সজোরে ছিনাইয়া

লইয়া ডাক্তার কহিলেন: বছর দুই হতে চলল দেখা সাক্ষাৎ আপনার সঙ্গে নেই—এই ত? হ্যাঁ, আমরা তা জানি। যাক্, এখন ব্যাপারটা যা হয়েছে তা শুনুন: কারবারে লোকসান খেয়ে সুদে আসলে সেটা উসুল করবার লোভে তিনি শেষকালে এনার্কিষ্টদের দলে ভীড়ে যান।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই নিবারণের কণ্ঠে যেটুকু রস অবশিষ্ট ছিল, তৎক্ষণাৎ নিঃশেষ হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে একটা মর্ম্মভেদী বিকৃত শব্দ খসিয়া বাহির হইল: য়্যাঁ!

ডাক্তার মনে মনে পুলকিত হইয়া বার্ত্তাটি অধিকতর গাঢ় করিয়া কহিলেন: আমাদের সরকার বাহাদুরের দুর্দ্ধর্ষ মহাশত্রু সীমান্তের ইপির ফকিরের নাম শুনেছেন ত? চোরাই 'য়্যামুনিসান' এই দল থেকে তাঁকে বিক্রী করা হত। এই সম্পর্কে কতকগুলো লোক ধরা পড়ে, তার ভিতরে ছিলেন আপনার পরমাত্মীয় শম্ভুনাথ। কিন্তু ধরা পড়বার পর প্রকাশ পায় লোকটা পাগল। তখন তাকে আমার কাছে পাঠানো হয় পরীক্ষা করে দেখবার জন্য। কিন্তু কি জানি কেন আমাকে দেখেই হতভাগার ভীষণ আত্মগ্লানি আসে, আর তার ভাগ্য-বিপর্যয় থেকে ভাগ্য ফেরাবার জন্যে পাপের পথে ঝাঁপিয়ে পড়া পর্য্যন্ত সমস্তই অকপটে স্বীকার করে। বেচারার আশা ছিল, আমার সুপারিসে সরকার তাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু এ অপরাধে ক্ষমার কথা উঠতেই পারেনা—একথা যখন তাকে বলা হয়, তখন সে আমার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয় যে, এই স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ যেন তার নিষ্পাপ সন্তানকে স্পর্শ না করে। কিন্তু দণ্ড তাকে নিতে হয় নি, বিচারের আগের দিন হাসপাতালেই বেচারী মারা পড়ে!

নিবারণের মনের সমস্ত আতঙ্ক এই নির্ঘাৎ দুঃসংবাদের আঘাতে

বুঝি চূর্ণ হইয়া গেল। ডাক্তার লক্ষ্য করিতেছিলেন, অতি বড় ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের বিয়োগ-বেদনার নিদারুণ চিহ্ন শোকার্তের চোখে মুখে যেভাবে ফুটিতে দেখা যায়, এই সরল নিরীহ প্রকৃতি লোকটির মুখমণ্ডলে তাহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি জানিতেন, লোকের এই আঘাত কাহাকেও একেবারে স্তব্ধ করিয়া দেয়, বাকশক্তি পর্যান্ত রুদ্ধ হইয়া যায়, আবার কাহারও কাহারও বেদনাহত স্বর রোদনের আবেগে সরবে কণ্ঠকে অতিক্রম করিয়া থাকে। নিবারণকেও বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে তাঁহার পানে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে 'বোস মশাই নেই?' এই কয়টি কথা বলিতে দেখিয়াই তাঁহার শেষের ধারণাটি প্রবল হইয়া উঠিল। এখনই নারীর মত উচ্চ কণ্ঠে দুঃসহ বেদনাটি ব্যক্ত করা আশ্চর্য্য নয় বুঝিয়া ডাক্তার তাড়াতাড়ি উপস্থিত বুদ্ধির প্রভাবে শোকের স্রোতটা ঘুরাইয়া দিলেন। কহিলেন: ওকি, আপনি কি কেঁদে লোক জড় করতে চান? শক্ত হোন নিবারণ বাবু, আপনার ভালর জন্যেই সাবধান করে দিচ্ছি আপনাকে, কথাটা এখন একবারে চেপে যেতে হবে—হতভাগা ছেলেটা, অতগুলো টাকা, সবার ওপর আপনার এই চাকরীটার পানে চেয়ে।

নিবারণের শোক বুঝি এবার মাথায় উঠিয়া গেল, ঠোঁট দুটি তাঁহার কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া একটি কথাও বাহির হইবার পথ পাইল না। মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার বেচারীর অবস্থাটি দেখিয়া সমবেদনার সুরে বলিলেন: জানেন ত কথায় আছে—বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! শম্ভু বেচারী হয়ত ভেবেছিল, মরলেই বেঁচে যাবে, আর আপনাদেরও বাঁচিয়ে যাবে। কিন্তু তাকি হয় নিবারণ বাবু? যারা ধরেছিল বেচারাকে, তারা কুলুচি খুজে বার করবার জন্যে ত হন্নে হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেসটা আসে আমারই হাতে। আবার এমনি কাণ্ড,

শম্ভুনাথ আর সব কথাই বলেছিল আমাকে, কিন্তু চেপে গিয়েছিল শুধু আপনার পাত্তাটি। কাজেই বুদ্ধি খেলিয়ে তারি জন্যে আমাকে তখন কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়।

নিবারণের চোখের উপর এবার সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল 'প্রবাস-জ্যোতি' কাগজে ছাপা সেই ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনটি। সেটি দেখিবা মাত্র তিনি বিহ্বল হইয়া উঠেন এবং তৎক্ষণাৎ একখানি পোষ্টকার্ডে সবিশেষ লিখিয়া জবাবের আশায় দিন গণিতে থাকেন। হায়, তখন কি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন, কাগজে ছাপা ঐ কয়টি ছত্রের পিছনে এত বড় একটা শোকের ব্যাপার প্রচ্ছন্ন ছিল ?

পকেট হইতে বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত সেই পোষ্টকার্ডখানি বাহির করিয়া ডাক্তার বলিলেন : বিজ্ঞাপনের কাজ যে হয়েছে, তার প্রমাণ আপনার এই চিঠি। এখানাই আমাকে প্রায় দু' শ মাইল তফাত থেকে দানাপুরে টেনে এনেছে। যাক্, এখন কাজের কথা শুনুন, আপনাদের কোন অনিষ্ট হয় এটা আমি চাই না। বুঝতেই ত পারছেন, শম্ভুনাথের ছেলে আপনার কাছে, তার টাকাও আপনার কাছে, আর আপনি হচ্ছেন তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—এ সব জানাজানি হলে টাকাগুলো ত বাজেআপ্ত হবেই, শেষ পর্য্যন্ত আপনার চাকরী ধরেও টানাটানি হতে পারে…

নিবারণের গলাটা বুঝি শুখাইয়া মরুভূমির মত উষর হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তারের একটানা কথাগুলি এইখানে আসিয়া মোড় লইবার জন্য একটু থামিতেই তিনি প্রাণপণ শক্তিতে গলাটাকে সরস ও সরব করিয়া কহিলেন : আপনি আমাদের বাঁচান সার…

কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এই মহানুভব মানুষটির হাত দুখানি চাপিয়া ধরিলেন।

পলকের মধ্যে নিবারণের হাত ছাড়াইয়া ডাক্তার ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিলেন : এ-রকম ছেলেমানুষী করবেন না নিবারণ বাবু; মনে রাখবেন, আমরা একটা আফিসের ভিতরে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। মাথা ঠিক করে এখন কাজ করা চাই। আমার পরামর্শ শুনুন।

অপ্রতিভের মত শঙ্কুচিত হইয়া নিবারণ কহিলেন : বলুন। আপনি এ অবস্থায় যা বলবেন সার, আমি তাই মেনে নেব।

ডাক্তার বলিলেন : শম্ভুনাথের ব্যাপারটা একবারে চেপে যেতে হবে। এখানে কাউকে কিছু বলবেন না। আর একটা কাজ করতে হবে আপনাকে, ছেলেটার ঐ-যে পিতৃ-দত্ত নাম নরনারায়ণ, ওটা পাল্টাতে হবে, পারবেন ?

নিবারণ আশ্বস্তভাবে বলিলেন : খুব পারবো সার! আর ও নামে ত আমরা ওকে ডাকিও না, তা ছাড়া এখনো স্কুলে ত ভর্ত্তি করান হয় নি যে নাম পত্তন হবে। আজ থেকেই নাম ওর পালটে দেব সার।

ডাক্তার বলিলেন : আর একটা কাজ করতে পারেন ? তাহলে আর কোন ভাবনার কারণ থাকে না।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিবারণ ডাক্তারের অপূর্ব্ব মুখখানার পানে তাকাইয়া রহিলেন। ডাক্তার বলিলেন : জায়গাটা বদলাতে পারেন ? অন্ততঃ মাস খানেকের মত ছুটি নিয়েও…

উৎসাহের সুরে নিবারণকে এবার বলিতে শোনা গেল : খুব ভাল পরামর্শ দিচ্ছেন সার, আজই আমি ছুটির দরখাস্ত করব। ছুটি আমার পাওনাও হয়েছে।

ডাক্তার বলিলেন : বাস, তাহলে ত সব দিক দিয়েই নিশ্চিন্ত হওয়া গেল নিবারণ বাবু! আমার এত মাথা ব্যথা কেন, সে ত আগেই

বলেছি। লোকটা এমনি তুখড় যে, তার কথার ফেরে কথা না দিয়ে পারিনি। তাছাড়া, আর একটা বড় কথা কি জানেন, ঐ নোংরা কেসটার সঙ্গে জড়িয়েছিল এক মাত্র বাঙ্গালী এই শম্ভুনাথ। তার মৃত্যুতে সত্যিই আমি খুসি হয়েছি নিবারণ বাবু, কিন্তু আমার ইচ্ছা—তার সঙ্গেই সমস্ত আপদ কলঙ্ক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। তার পর যেন না আর তেড়ে এসে আপনাদের জীবনযাত্রাটাকেও অতিষ্ঠ করে তোলে। আপনার এই চিঠিখানা আমি চেপেই যাব।

কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া গদ-গদকণ্ঠে নিবারণ বলিলেন: আপনার দয়াতেই এ যাত্রা বেঁচে গেলুম সার। কিন্তু গরীবের বাসায় একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যদি···

কাথাটা সমাপ্ত করিবার অবসরটুকু বক্তাকে না দিয়াই ডাক্তার বলিলেন: আবার আপনি ছেলেমানুষী করছেন নিবারণ বাবু, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা—একথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? আরে মশাই, আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকাবার চেষ্টা ক'রবেন না, কাটাতে পারলেই মঙ্গল, বেঁচে যাবেন; বুঝলেন? এখন নিজের কাজে যান, আর ছুটির দরখাস্তটা আজই পেশ করে দিন। হাঁ, আর একটা কথা,—ছেলেটাকে শুদ্ধ করে দেবেন, তবে এখানে নয়, ছুটি নিয়ে দেশে গিয়ে—বুঝলেন? আচ্ছা, তাহলে কাজ আমাদের মিটে গেল। এখন—গুডবাই।

একই ভাবে ঠায় সেখানে দাঁড়াইয়া নিবারণ এই অদ্ভুত মানুষটি গমন-গতির দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

অফিস সন্নিহিত কেরাণী-পল্লীতেই নিবারণের বাসা। আড়াইখানি ঘর, একটু অঙ্গন এবং সামনে এক ফালি তার দিয়া ঘেরা জমি লইয়া তাঁহার এই 'কোয়াটার'।

অপরিচিতা

বাহিরে ক্ষুদ্র ঘরখানির সামনে রোয়াকটির উপর এক বালক চিত্রকর তাহার অপরূপ চিত্রবিদ্যার সাজ-সরঞ্জাম লইয়া ছবি আঁকিতে বসিয়াছে। ছেলেটির বসিবার ভঙ্গি এবং অপূর্ব্ব-সুন্দর চেহারাখানির সহিত স্বাভাবিক পরিবেশগুলিও চমৎকাররূপে মিলিয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ণ চাতালটির পার্শ্বে তারের বেড়া কাঁপাইয়া লবঙ্গলতার গুচ্ছগুলি ভিতরে এমন ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে যে, লাল, ফিকা গোলাপী ও সাদা রঙের থোবা থোবা ফুলগুলি যেন এই কর্ম্মনিবিষ্ট ছেলেটির শির ঘাড় ও পৃষ্ঠে পড়িয়া হুল্লোড় বাধাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ছেলেটির কর্মনিষ্ঠা যেমন গভীর, তাহার বিদ্যার উপাদান-গুলিও তেমনই বিচিত্র। করবী গাছের একখণ্ড সরু ডাঁটার অগ্রভাগ-টুকু থেঁতো করিয়া তাহাকে তুলির মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে, কয়লা ঘসিয়া, হলুদবাটা গুলিয়া, গেঁড়িমাটি গুড়াইয়া এবং সিন্দুর গুলিয়া চারিখানি খুরিতে চারিটি বিভিন্ন রঙ শোভা পাইতেছে। কোলের উপর পাতা আছে সচিত্র রামায়ণ হইতে সংগৃহীত একখানি সুরঞ্জিত ছবি—দশস্কন্ধ রাবণ রাজার বিরাট মূর্ত্তি, সম্মুখে একখানা ইটের গায়ে ঈষৎ হেলাইয়া রাখা হইয়াছে কোন পুরাতন ক্যালেণ্ডারের একখানা সুশ্রী স্থূল সাদা কার্ডবোর্ড। কোলের উপর রক্ষিত আদর্শটিকে লক্ষ্য করিয়া এই বোর্ডের গায়ে রঙ-তুলির সাহায্যে শিশু চিত্রকর ক্ষিপ্রহস্তে দশস্কন্ধ রাবণের ছবি আঁকিতে ব্যস্ত। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, পরিশ্রমে ক্লান্তি নাই, অদম্য উৎসাহে চলিয়াছে তাহার এই অপূর্ব্ব অঙ্কনের কাজ। বায়ুর সহিত পাল্লা দিয়া যতবারই ফুলগুচ্ছগুলি শিশু-চিত্রকরের মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে, ততবারই সে বাম হাতখানি দিয়া তাহাদিগকে সরাইয়া যেন তাহার প্রচণ্ড ধৈর্য্যের পরিচয় দিতেছে।

খুট করিয়া ভিতরের দিকের দরজাটি খুলিয়া গেল এবং সাতাশ আটাশ

বৎসরের এক হৃষ্টপুষ্ট মহিলা বাহিরে আসিয়া বিস্ময়ের সুরে কহিলেন: অ-মা, আমি চারদিকে খুঁজে খুঁজে সারা হচ্ছি, আর ছেলের এখানে ঘটা করে বসে ছবি আঁকা হচ্ছে? আ—মরণ তোমার, আর কোন খেলা খুঁজে পাওনি? তোলা খুরিগুলো পেড়ে রংগুলে আমার পিণ্ডি চটকানো হচ্ছে! আচ্ছা, আসুন ত উনি—

এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া স্থূলাঙ্গী মহিলাটি হাঁফাইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার চোখ দুটি ছেলেটির এই ছেলেখেলার মধ্যেই বৈচিত্র্যের একটা নিদর্শন দেখিয়া বুঝি আর ফিরিতে চাহিতেছিল না।

ছেলেটি কিন্তু মহিলাটির অনুযোগপূর্ণ কথাগুলিতে কান না দিয়াই সমান উৎসাহে তাহার তুলি চালাইয়া চলিল।

ছেলেটির কোলের ছবিখানার দিকে সহসা মহিলাটির দৃষ্টি পড়িতেই তিনি পুনরায় তর্জনের সুরে ঝঙ্কার তুলিলেন: আ—আমার পোড়াকপাল! রামায়ণ থেকে ছবিখানা খুলে এনে তোমার খেলাঘরে পাতা হয়েছে? খুঁজে খুঁজে খেলবার আর জিনিস পাওনি বটে?

ছেলেটি এই সময় ছবির রাবণের চোখে কালির একটা বিন্দু দিতে গিয়া কালি কিঞ্চিৎ বেশীই দিয়া ফেলিল। ইহাতেই তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তুলিটা তুলিয়া এবং চোখ দুটো পাকাইয়া মহিলাটির পানে রুদ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া সে কহিল: বেশ আঁকছিলুম, তুমিই এসে সব মাটি করে দিলে মামীমা? তুমি ভারী দুষ্টু।

মহিলাটি এবার রীতিমত চটিয়া গেলেন, গলার স্বর আরও উচ্চগ্রামে তুলিয়া ছেলেটিকে শাসাইলেন: আমি দুষ্টু বৈ কি, নইলে দুটিবেলা খোরাকি জোটাবে কে? আদর পেয়ে মুখ তোমার বলে গেছে, ধরাকে

সবা জ্ঞান কর—তা আর জানি না? ঢের ঢের ছেলে দেখেছি বাবা, এমন ভূতুড়ে খেলা কারুর দেখিনি—

হঠাৎ বহির্দ্বারের কড়া দুইটি সশব্দে বাজিয়া উঠিতে মহিলাটি মুখ বন্ধ করিলেন। ছেলেটিও এই সময় হাতের তুলিটি রাখিয়া একলাফে উঠানে আসিয়া রুদ্ধ দরজাটি খুলিয়া দিতে ছুটিল।

সদর দরজা নামে পরিচিত কপাট দুইখানি উন্মুক্ত হইবামাত্র সেইপথে প্রবেশ করিলেন মহিলাটির স্বামী এবং ছেলেটির মাতুল নিবারণ চন্দ্র মিত্র মহাশয়। হাতে একটা পোঁটলা, বগলে ছাতা।

তখনও পাঁচটা বাজে নাই। অসময়ে স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়া মহিলাটি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: এত বেলাবেলি যে? ওকি, মুখখানা তোমার ওরকম দেখছি কেন—অসুখ বিসুখ করেনি ত?

ভাগিনেয়ের হাতে পুঁটুলিটি দিয়া নিবারণ কহিলেন: ভারি মাথা ধরেছিল, তাই একটু সকাল সকাল চলে এলুম। কিন্তু, তুমি অত চেঁচাচ্ছিলে কেন? বাইরে থেকেই তোমার গলার চড়া আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলুম···

ঝঙ্কার তুলিয়া গৃহিনী শান্তমণি জবাব দিলেন: চেঁচাচ্ছিলুম কি সাধ করে? তোমার আদুরে ভাগনের কাণ্ড দেখনা—পটের দোকান খুলে বসেছেন! ঘরের ভেতরে যেখানে যা পেয়েছে টেনে এনে রং গোলা হয়েছে দেখনা! অ-মা—কি সর্ব্বনাশ, সিঁদুরটুকু পর্য্যন্ত ঢেলে এনেছে হতচ্ছাড়া দস্যি ছেলে···

একনজরে চাতালটির পানে চাহিয়াই নিবারণ অবস্থাটা উপলব্ধি করিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি ছেলেটির এই বিচিত্র খেলার সহিত পরিচিতও ছিলেন। ভাগিনেয়ের আজিকার আয়োজন দেখিয়া তাঁহার

বিষণ্ণ মুখখানি প্রসন্নই হইতেছিল ; কিন্তু স্ত্রীর শেষের কথাটা পুনরায় তাঁহাকে আঘাত করিল। তাই আহতের মত মুখভঙ্গি করিয়া প্রতিবাদ করিলেন : কিন্তু দেখে ত মনে হচ্ছে না যে ডাকাতির মতন কিছু বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়েছে। এ-রকম সুশ্রী খেলা এই বয়সের কোন ছেলেকে করতে দেখেছ কখনো ? হডসন সাহেব এখানে ছবির একজিবিসন খুলে লোকের চোখের সামনে রঙগুলো তুলি দিয়ে এঁকে দেখিয়ে দিয়ে গেল কেমন করে ছবি করে। কত বয়সের কত লোক ত দেখেছে, কিন্তু এর মতন সাহেবের ছবি আঁকার নকল কেউ করেছে ? সাহেব যেন তাঁর 'এলেমটুকু' একে গুলে খাইয়ে দিয়ে গেছে ; নৈলে এই বয়সে খেলা-ধূলো ছেড়ে এমন করে কোন ছেলে রঙ তুলি নিয়ে মাথা ঘামায়—হাত চালায় ! বাঃ—বাঃ, খাসা রাবণ হয়েছে।—বলিতে বলিতে তিনি চাতালটির এক প্রান্তে বসিয়া পড়িলেন এবং ভাগিনেয়কে সস্নেহে কোলের কাছে টানিয়া তাহার পীঠে স্নেহময় হাতের গুটি দুই মৃদুমন্দ ঘা দিলেন।

গৃহিনী তথাপি দমিলেন না, বা ছেলেটির খেলার মধ্যে কোনরূপ গুণপনার নিদর্শনও পাইলেন না। পূর্ব্ববৎ রুক্ষকণ্ঠেই বলিলেন : তোমার আস্কারা পেয়েই ত ও-রকম হয়েছে ! বেশ, কিনে এনে দিও কালই এক বাণ্ডিল সিঁদুর ; কত সাধ্যি—সাধনা ক'রে নেবুফুলের নন্দাইকে দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছিলুম,—দজ্জাল ছেলে কৌটো উপুড় করে সবটুকু ঢেলে এনেছ !

নিবারণ বলিলেন : এবার আর তোমার 'নেবুফুলের' খোসামোদ করতে হবে না, কলকাতায় গিয়ে আগেই তোমাকে এক বাণ্ডিল সিঁদুর কিনে দেব, মনের সাধে যত পার—প'রো।

মুখখানা তুলিয়া স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া শান্তমণি জিজ্ঞাসা করিলেন: তার মানে?

নিবারণ সহজ কণ্ঠেই বলিলেন: এখানকার বাসা আপাততঃ তুলতে হচ্ছে। আসছে বুধবার ভোরের ট্রেণে কলকাতায় রওনা হতে হবে।

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া শান্তমণি বলিয়া উঠিলেন: অ-মা, সেকি! বদলি করলে নাকি তোমাকে?

নিবারণ গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। মাস দুই কলকাতায় থাকতে হবে, তার পরে আবার এদিকেই টেনে আনবে।

শান্তমণি: এখানেই আসবে ত?

নিবারণ: না, এখানে আর আসা হবে না, বোধ হয় জামালপুরে কিম্বা মুঙ্গেরে জয়েন করতে হবে। আজ থেকেই সব গুছাতে আরম্ভ কর।

সংবাদটির অভিনবত্ব গৃহিনীকে আনন্দিত করিল কিম্বা তাঁহার মনের মধ্যে বিক্ষোভ গুমরিয়া উঠিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। মুখখানার এক বিচিত্র ভঙ্গিমা করিয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বলিলেন: অ-মা শোন কথা! এখন কি করে কি করব? এ যে সেই—ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ের জো হ'ল দেখছি! নেবুফুলের ননদের সাধ, আসছে রবিবার নেমন্তন্ন করে খাওয়াব বলে ঠিক করে রেখেছি, ডাক্তার-গিন্নীর ছেলের ভাত আবার ঐ বুধবারেই, পনেরো দিন আগে থাকতে বলে রেখেছে; তারপর, একটা সংসার তুলে যাওয়া—সেটা কি কম? কোন্ দিক সামালাই এখন?

নিবারণ বলিলেন : উপায় ত আর নেই, এর মধ্যে সামলে নিতেই হবে।

মাতুলের পাশটিতে বসিয়া এই সংলাপের মধ্যে ছেলেটি বুঝি হাঁফাইয়া উঠিতেছিল। তাহার মনটি পড়িয়ে আছে ছবির দিকে। রাবণ রাজার দশটা বিরাট মাথার অনেকগুলি অংশ এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, কাজটি সমাপ্ত না করিলেও তাহার সোয়াস্তি নাই। ইতিমধ্যে এখানকার বাসা তুলিয়া কলিকাতায় যাইবার কথাটা বালকের চিত্তটিও বুঝি দোলাইয়া দিল। মুখখানা তুলিয়া ভাসা ভাসা অপূর্ব্ব দুই চক্ষু মাতুলের মুখে নিবদ্ধ করিয়া আবদারের স্বরে কহিল : আমি কিন্তু আমার ছবিগুলো সব নিয়ে যাব, আর এই তুলি, রঙ—সমস্ত।

সস্নেহে ভাগিনেয়কে কোলের দিকে টানিয়া কোমলকণ্ঠে মাতুল বলিলেন : কলকাতায় গিয়ে আমি তোমাকে ছবি আঁকবার একটা বাক্স কিনে দেব। তার মধ্যে, নানা রকম রঙ, তুলি, রঙ রাখবার বাটি, আরও কত কি থাকে।

বালকের চোখের তারা দুটি আনন্দে চক চক করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর মুখখানি নির্ম্মল হাসিতে আলো করিয়া কহিয়া উঠিল : সত্যি মামা? বাঃ, কি মজা তাহলে হবে! মামীমার বকুনি তাহলে আর খেতে হবে না আমাকে।

সস্নেহে বালকের চিবুকটি ধরিয়া মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন : মামী তোমাকে কেবলই বকে—ভালবাসেনা মোটেই?

অভিমানক্ষুব্ধস্বরে বালক কহিল : ভালবাসলে বুঝি খালি খালি বকে অমন করে? মামীমা আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না।—

বলিয়াই সে দুই চোখ মেলিয়া এক নজরে মামীর ভারাক্রান্ত মুখখানি দেখিয়া লইল।

কোন কথা সহ্য করিতে শান্তমণি অভ্যস্ত ছিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ মুখখানি মচকাইয়া কথাটার জবাব দিলেন: তা ত বলবেই, ওরা যে নেমক-হারামের ঝাড়। বাপ সেই যে মাথায় বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেলেন - একখানা চিঠি লিখে উদ্দেশ নিয়েছেন কোন দিন? সেই ঝাড়ের ত তেউড়, কত আর ভাল হবে বল! কথা ত পড়েই রয়েছে—জন জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা!

বিরক্ত হইয়া নিবারণ কহিলেন: কোন্ কোথায় কি আনলে টেনে—ছি! তোমার মুখ বড় আলগা! মামীর কথা তুমি গায়ে মেখনা বাবা নরেন্দ্র ··

কি—কি—কি? ভাগনের ওপর দরদ আজ এতই উপলে উঠল যে—নাম পর্য্যন্ত ঘুরে গেল! কথাগুলি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে বলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শান্তমণি স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পবয়স্ক ভাগিনেয় নরনারায়ণ এই সংসারে 'নোরো' নামেই পরিচিত এবং 'নর' নামটি বিকৃত করিয়া এই ভাবেই তাহাকে সম্বোধন বা আহ্বান করা হইত। কিন্তু আজ হঠাৎ স্বামীর পক্ষ হইতে তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া, অর্থাৎ নোরোকে নরেন্দ্র বলিয়া সম্বোধন করায় শান্তমণির মত মেয়ের মনে এরূপ বিস্ময়ের উদ্রেক স্বাভাবিক। কিন্তু নিবারণ যেন পূর্ব্ব হইতে মনে মনে রিহার্স্যাল দিয়াই প্রস্তুত করা শব্দগুলি আজ শুনাইতেছিলেন। তাই পত্নীর কথার পীঠেই মনের কথাগুলি দিব্য গুছাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন: নামটা ওর বাপ খুব লম্বা চওড়া রেখেছিল কি না, তাই কেটে ছেঁটে

ছোটই করে দিলুম আজ থেকে। কলকাতায় গিয়েই ওকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেব, স্কুলের খাতায় এত বড় নামটা থাকলে ক্লাসে নাম ডাকবার সময় মাষ্টাররাই হয় ত বেজার হয়ে উঠবে। কি বল নরেন্দ্র, নামটা ছোট করে ভাল করিনি? পছন্দ হয়েছে ত?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ভাগিনেয়ই মামাকে পাল্টা প্রশ্ন করিল: আমাকে সত্যিই ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেবে মামা? সেখানে ছবি আঁকতে পাব? মাষ্টাররা বকবে না ত মামীমার মতন?

নিবারণ কহিলেন: না; মাষ্টাররা যাতে তোমাকে ভাল করে ছবি আঁকতে শেখায় আমি তার ব্যবস্থা করে দেব।

শান্তমণি মুখখানা ঘুরাইয়া কহিলেন: আফিস থেকে এসেই ত ভাগনের তোয়াজে আজ একেবারে উন্মত্ত দেখছি! কাপড় চোপড় ছাড়তে হবে না?

নিবারণ বলিলেন: এই যে উঠছি, তুমি ত এখনো চায়ের জল চড়াও নি, এত তাড়াই বা কেন?

—তা ত বলবেই, সব তা'তে আমার দোষ ধরাই ত তোমার চিরকেলে স্বভাব।—এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়াই শান্তমণি ভিতরে চলিয়া গেলেন। নিবারণ সাদরে ভাগিনেয়ের চিবুকটি ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন: আজ থেকে আমি তোমাকে মুখে মুখে গোটা কয়েক নতুন পড়া শেখাবো, তুমি সেগুলি কণ্ঠস্থ করবে। তাহলেই ছবি আঁকবার সাজসরঞ্জাম শুদ্ধ একটা সুন্দর বাক্স তোমাকে কিনে দেব কলকাতায় গিয়েই। কেমন, রাজি ত?

মামার মুখের পানে চোখ দুটি মেলিয়া বালক কহিল: যেমন করে নামতা মুখস্থ করি ত?

নিবারণ কহিলেন: হ্যাঁ, নামতার মতই বটে। তবে নামতা হচ্ছে—আঁক, আর এটা হচ্ছে—নাম। আচ্ছা, তোমার নাম যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কি বলবে বলত?

বালক উত্তর করিল: শ্রীনরেন্দ্র বসু।

নিবারণ সহাস্যে কহিলেন: খাসা ছেলে তুমি; নতুন নামটা ঠিক মনে রেখেছ ত! কিন্তু নামের শেষে যে পদবীটা বললে, ওটা ঠিক হয় নি। বলতে হবে—বিশ্বাস।

বালক কোন প্রশ্ন না করিয়া আপন মনেই পুনরায় আবৃত্তি করিল: শ্রীনরেন্দ্র বিশ্বাস।

অত্যন্ত প্রীত হইয়া নিবারণ কহিলেন: তোমার ঠাকুরদাদার পদবী ছিল বিশ্বাস। নবাবের দেওয়া পদবী। তোমার বাবা বলতেন—নবাবী আমল যখন চলে গেছে তখন আর ও পদবীর দাম কি? তাই তিনি বিশ্বাস ছেড়ে সাবেক বসু পদবীই নিয়েছিলেন। কিন্তু পদবী পালটে ত ভাল হল না, তাই তোমার ভালর জন্যেই পুরানো পদবীটাই নামের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি।

মাতুলের কথাগুলি স্বল্পভাষী বালক নীরবেই শুধু শুনিল, কোন উত্তর করিল না। নিবারণ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন: তাহালে তোমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলে কি বলবে?

বালক উত্তর করিল: শম্ভুনাথ বিশ্বাস।

নিবারণ কহিলেন: বাঃ, তোফা স্মরণশক্তি আর বুদ্ধি তোমার, বাপের পদবী বলতে ভুল করনি। হ্যাঁ, তবে একটা কথা আছে, তোমার ঠাকুরদাদা তোমার বাবাকে যে নামে ডাকতেন, সেই নামই তুমি বলবে। ঠাকুরদা ডাকতেন তাঁকে স্বয়ম্ভু ব'লে। 'নাথ' বলবার

কোন দরকারই নেই। নামকে যত ছোট করা যায় ততই ভাল। নামটি আর একবার বলত বাবা?

বালক বলিল: স্বয়ম্ভু বিশ্বাস।

পরিতুষ্ট হইয়া নিবারণ কহিলেন: বাস্—খাসা বলেছ। নামতার সঙ্গে এই নাম আর পদবী আজ থেকে মুখস্থ করবে। আচ্ছা, তুমি তোমার ছবি আঁক, আমি কাপড় জামা ছেড়ে ফেলি, চা হ'লে ডাকব'খন।

নিবারণ ভিতরে চলিয়া গেলেন, বালক এতক্ষণে যেন মুক্তি পাইয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটি অধিকার করিয়া বসিল পরিত্যক্ত বিচিত্র তুলিটি লইয়া।

* * *

ঠিক এই সময় দানাপুরের ডাক বাংলোয় বসিয়া ডাক্তার অধিকারী হরপ্রসাদ ঘোষের বরাবর সেই দিনের বোম্বাই মেলে পাঠাইবার অভিপ্রায়ে যে রিপোর্টটি রচনা করিতেছিলেন, তাহার শেষাংশ এইরূপ:

* * * ছেলেটির নাম নরনারায়ণ এবং দেখিতে বেশ প্রিয়দর্শন ছিল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পিতার গৃহত্যাগের পরেই মাতার ব্যাধি ছেলেটিকে এমনভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরে যে মুক্ত করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। মিলাইয়া দেখা গেল, যে সময় তাহার দুর্ভাগ্য পিতাকে আপনি মৃত্যুর দরজা হইতে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণ শক্তি

প্রয়োগ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই বেচারীর রোগজীর্ণ শৈশব-জীবের অবসান হয়। দায়িত্বপূর্ণ যে তিনটি বোঝা আমার উপর অখণ্ড বিশ্বাসে চাপাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার একটি এইভাবে সরিয়া গিয়াছে, এখন অবশিষ্ট দুইটির সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সচেতন থাকিব।

(১৩)

ডাক্তার অধিকারী আটঘাট বাঁধিয়া অতি সন্তর্পণে যে-সময় তাঁহার কূটবুদ্ধির সুতায় এই মহাজাল রচনা করিতেছিলেন, তৎকালে শ্রীবৃন্দাবনধামে আনন্দস্বামীর সিদ্ধাশ্রমে বসিয়া দুই স্বয়ংসিদ্ধ মহাপুরুষ আর একখানি মহাজাল বুনিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হস্তে যেভাবে সুতা পাকাইতে ছিলেন তাহাও কৌতূহলোদ্দীপক এবং চমকপ্রদ।

বৃন্দাবনের পঞ্চক্রোশী পরিক্রম-পথের বাহিরে—যমুনার গতি যেখানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই জনবিরল বিস্তীর্ণ সৈকতভূমিটি কেল্লারমত সুউচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাচীর পরিবেষ্টনে আনন্দস্বামীর সিদ্ধাশ্রম নামে অল্প কয়েক বৎসর হইল প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আশ্রমটির বিধি নিষেধ এমনই কড়া যে, ইচ্ছামাত্রই বাহিরের কাহারও ইহার ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। তাহার কারণ, দেবসেবা, ধর্ম্মানুষ্ঠান,

অতিথিসৎকার প্রভৃতি প্রচলিত প্রথাগুলিকে সন্তর্পণে বর্জ্জন করিয়া আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ একমাত্র যে লক্ষ্যবস্তুটির জন্য কঠোর সাধনায় ব্রতী—জন-সাধারণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। আশ্রমের মতে, সকল দেশ, সকল জাতি এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রাণকেন্দ্র হইতেছে নারী জাতি। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে ভারতের নারী জাতি আজ প্রাণহীনা। উপযুক্ত শিক্ষা এবং দীক্ষার দ্বারা এই নারীজাতিকে প্রাণময়ীরূপে সর্ব্ব-সিদ্ধা করিয়া তোলাই এই সিদ্ধাশ্রমের একমাত্র লক্ষ্য। আশ্রমের মতে নারীমাত্রই অপাপবিদ্ধা, চিরশুদ্ধা। শিক্ষা ও দীক্ষার প্রভাবে নারী সিদ্ধিলাভ করিলেই আত্মদর্শনের শক্তি পাইবে এবং সমাজের অকল্যাণ নিবারণ করিতে পারিবে।

সিদ্ধাশ্রমের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোটামুটি এই পর্য্যন্তই জানিতে পারা যায়। কিন্তু কি-ভাবে নারীজাতিকে সিদ্ধির পথ প্রদর্শন করা হয় এবং সিদ্ধি পাইলে তাহারা কোন প্রণালীতে সমাজের কল্যাণসাধন করিয়া থাকে, তাহা এ পর্য্যন্ত রহস্যাচ্ছন্নই আছে। তবে ইহাও সুস্পষ্ট সত্য যে, জন-সাধারণের কষ্টার্জ্জিত অর্থের সাহায্য গ্রহণে আশ্রম বরাবরই বিরত, এবং এই জন্যই সম্ভবতঃ আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের এলাকায় সাধারণের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিতে সমর্থ্যও হইয়াছেন। কিন্তু ইহাও ধ্রুব সত্য যে, অর্থের বেদীতে উপবিষ্ট কমলার বরপুত্রদের স্বর্ণ-মুষ্টির আকর্ষণে সিদ্ধা-শ্রমের কোষাগারের দ্বার যেমন খুলিয়া যায়, ঘটনাচক্রে তাঁহাদের আবির্ভাব হইলে ইহার সিংহদ্বারও তখন আর রুদ্ধ রাখা সম্ভব হয় না। তবে পদস্থ রাজপুরুষ এবং বৈদেশিক টুরিষ্টগণের পক্ষে সিদ্ধাশ্রমের পথ সাধারণতঃ নিরঙ্কুশ থাকে বলিয়াই শুনা যায়। আর, জন-সাধারণের পক্ষে সারা বৎসরের মধ্যে মাত্র একটিদিন উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া

কয়েকঘণ্টার জন্য এই সুযোগটি উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি আসিবার পূর্ব্ব হইতেই আবেদন করিয়া প্রবেশ-পত্র সংগ্রহ করিতে হয়। প্রত্যেক পৌষ সংক্রান্তিতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বাহির হইতে দেখিলে সিদ্ধাশ্রমটিকে সুরক্ষিত একটি দুর্গ বলিয়া ভ্রম হয়। সুউচ্চ দেওয়াল কেল্লা-প্রাচীরের মত সমগ্র আশ্রমটিকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। সম্মুখেই বৃহৎ ফটক। ইহার পরেই দীঘির মত বিশাল এক পুষ্করিণী। তাহার চারিটি কিনারাই প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী শোভিত। দীঘির উভয়পার্শ্বে প্রশস্ত অঙ্গন। দুইধারে অঙ্গনের উপর দিয়া দুইটি পথ ঘুরিয়া দীঘির পিছনে গিয়া মিশিয়াছে। এই সংযোগস্থলটির সম্মুখে আর একটি ফটক সিংহদ্বারের মত দেখা যায়। এই দ্বার অতিক্রম করিয়া যে প্রস্তরময় সমচতুষ্কোন চত্বরটিতে উপনীত হওয়া যায় তাহার প্রায় চারিদিকেই সারিবদ্ধ কক্ষশ্রেণী এবং সম্মুখে বরাবর টানা দালান। ঘরের ছাদগুলি পাথরে তৈয়ারী, দালানের দিকটায় রক্তবর্ণ টালির ছাদ ঢালু হইয়া সুশ্রী স্তম্ভগুলিকে অবলম্বন করিয়াছে। চত্বরটির বামে ও দক্ষিণে দুইটি অংশে একটি আশ্রমের গদীঘর, অপরটি গ্রন্থাগার। গদীঘরখানি প্রাচীন আদর্শে সজ্জিত। দেওয়ালে বিশ্বের মহীয়সী নারিগণের দুষ্প্রাপ্য আলেখ্য-রাজির সমাবেশ। বসিবার আসনগুলি বিভিন্ন পশুচর্ম্মে আবৃত। দেওয়ালের দিকে জয়পুরী পাথরের আধারে ঐতিহাসিক সুপ্রসিদ্ধা নারীদের ব্যবহৃত বলিয়া অভিহিত দুর্ল্লভ দ্রব্যগুলি সুরক্ষিত। যথা: রাণী দুর্গাবতীর তরবারী, চাঁদ সুলতানার কটিবন্ধ, অহল্যাবাঈএর ভল্ল, রাণী ভবানীর কঙ্কন, দেবী চৌধুরাণীর খেঁটে—এমনই বহু চমকপ্রদ

নিদর্শন। গদীঘর বলিয়া পরিচিত হইলেও ঘরখানি যেন মিউজিয়মের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। সম্মানভাজন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে এই ঘরেই অভ্যর্থনা করিয়া বসানো হইয়া থাকে। ইহারই একাংশে আশ্রমের কার্য্যনির্ব্বাহ সংক্রান্ত খাতাপত্রগুলিও পরিচ্ছন্নভাবে সজ্জিত থাকে। অপর পার্শ্বের পাঠাগারটি বহুভাষায় মুদ্রিত প্রাচীন ও আধুনিক পুস্তক-সম্ভারে পরিপূর্ণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হস্তলিখিত পুঁথী হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্রিত পুরাণ, ইতিহাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য এমন কি রোমাঞ্চকর অপরাধতত্ত্বমূলক গ্রন্থাবলী পর্য্যন্ত যথাযথভাবে সংগৃহীত ও শৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত। সুপ্রসিদ্ধ প্রাদেশিক সাময়িক পত্রিকাগুলির ফাইল রাখিবার পদ্ধতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি-পরিধি শুধু আশ্রমেই সীমাবদ্ধ নহে—নিখিল বিশ্বের গতিবিধির সহিত তাঁহারা যোগসূত্র রক্ষা করিয়া থাকেন। অন্যান্য কক্ষগুলিও আশ্রমের বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহৃত এবং প্রাসঙ্গিক দ্রব্যাদির সংযোগে প্রত্যেকটিই এক একটি স্বতন্ত্র বিভাগের মত।

এই বৃহৎ অংশটি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই মনে হয়, বুঝি দেখিবার আর কিছু নাই। কিন্তু ব্যায়ামাগার নামে পরিচিত কক্ষটির বিচিত্র দ্বারটি উন্মুক্ত করিলে দেখা যায় যে, প্রস্তরবদ্ধ সঙ্কীর্ণ একটি পথ ক্রমশঃ ঢালুভাবে নিম্নাভিমুখী হইয়াছে। এই পথে কতকটা নিম্নে নামিলেই সিদ্ধ ‥‥ের সর্ব্বাধিক বৃহৎ প্রাঙ্গণটি দর্শকচক্ষুকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যে, ইহাই প্রকৃত আশ্রম—পুরাণের পবিত্র ঋষিস্থানের আদর্শেই যেন এই অংশটি সযত্নে রচিত হইয়াছে। বিশাল প্রাঙ্গণ-মধ্যবর্ত্তী পর্ণময় আটচালাটি যজ্ঞস্থলের মতই শোভা পাইতেছে।

অবশ্য বৈদিকযুগের অনুসরণে কোনরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান এই পর্ণমণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয় না সত্য, কিন্তু আশ্রমবাসিনী বিভিন্ন বয়সের কুমারীদিগকে এইস্থানেই জীবন-যজ্ঞে ব্রতী হইবার জন্য নানাভাবে দীক্ষা লইতে হয়। আটচালাটির উভয়পার্শ্বে ক্রীড়া-প্রাঙ্গণের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ-সমাচ্ছন্ন দুইটি বিস্তীর্ণ ভুখণ্ড শেষ প্রান্তে সুউচ্চ প্রাচীর-সংলগ্ন বংশবনের সহিত মিশিয়াছে। আশ্রমের পিছনের দিকে অবস্থিত এই সুবৃহৎ অংশটি শুধু সুউচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত নহে—প্রাচীর সংলগ্ন কণ্টকাকীর্ণ বেউড় বাঁশের দুর্ভেদ্য ঝাড়গুলি কুম্ভীর দেহের মত প্রাচীরটিকে বরাবর আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যবর্ত্তী আটচালাটিকে 'বুড়ি' করিয়া উভয়পার্শ্বের উন্মুক্ত প্রান্তরে আশ্রম-বালিকাদের নানারূপ খেলাধূলা চলে। প্রান্তরের পরেই তপোবনের আদর্শে উদ্যান-সমন্বিত কুটীর গুলির সংস্থান অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। প্রত্যেক কুটীরে স্বতন্ত্র আঙ্গিনা এবং বিভিন্ন বর্ণের অজস্র কুসুমিত বৃক্ষবল্লরীর ঘনসন্নিবিষ্ট আবেষ্টন প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য যেন আশ্রমোচিত সুষ্ঠু পরিকল্পনায় রক্ষা করিতেছে। এই কুটীর-অঞ্চলের পরেই অপরূপ এক বৃহৎ পুষ্করিণী। তাহার তীরগুলির খানিকটা অংশ সুপরিচিত জলজ কুসুমদামে সমাবৃত। উপরের বাঁধে বৈদেশিক অনুচ্চ বাহারী ঝাউগাছগুলি গায়ে গায়ে মিশিয়া সবুজবর্ণের বিচিত্র প্রাচীরের মতই যেন দাঁড়াইয়া আছে। আশ্রমের পরিভাষায় পুষ্করিণীটি কন্যা-সরোবর নামে পরিচিত। কন্যা-সরোবরের পাশ দিয়া যে রাস্তাটি ক্রমশঃ 'চড়াই' ভাবে উঠিয়া যথাক্রমে বৃক্ষবল্লরী ও বংশ প্রাচীর পরিবেষ্টিত সুপ্রশস্ত আঙ্গিনা-সমন্বিত সুরম্য আশ্রমটির দ্বারদেশে মিশিয়াছে—তাহাই সিদ্ধাশ্রমের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীমৎ আনন্দ স্বামীর আবাসস্থান। এই উদ্যান-

অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চভূমিখণ্ডে সর্ব্বজনমান্য স্বামীজির এই আস্তানাটী স্বতন্ত্র একটি আশ্রমের মতই মনোহর এবং সম্ভ্রমসূচক। প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রস্তরবদ্ধ কূয়া এবং তাহার সান্নিধ্যে রক্তবর্ণ বৃহৎ চত্বরটি বৃত্তাকারে অতিকায় এক নিম্ববৃক্ষকে পরিবেষ্টন করিয়া আশ্রমের গাম্ভীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য যেন ব্যক্ত করিতেছে। প্রাঙ্গণ সংলগ্ন ঘরগুলিও প্রিয়দর্শন, পরিচ্ছন্ন ও সুরুচির পরিচায়ক। প্রত্যেক গৃহটী প্রয়োজনানুযায়ী বস্তু সম্ভারে সজ্জিত।

সর্ব্বাধ্যক্ষ আনন্দস্বামীর বিভিন্ন কার্য্যাবলী সম্পর্কে প্রত্যেক কক্ষটী সুনির্দ্দিষ্ট। অধ্যয়ন, সাধনা, ভোজন, শয়ন এবং আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি বিভিন্ন কক্ষেই যথাযথভাবে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। স্বামীজীর নির্দ্দেশমত আর দুইখানি সজ্জিত কক্ষ যাহার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে, এই সুদৃশ্য আশ্রমটির আনন্দ, উৎসাহ এবং জীবনস্বরূপ বলিয়া তাহাকে অভিহিত করা যায়। এই আনন্দদায়িনী বালিকাটীই—হরপ্রসাদ ঘোষের কন্যা—রেণু। কিন্তু স্বামীজী তাহার নূতন নামকরণ করিয়াছেন—তনু। নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া তনুর মনটী নিজের মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন।

কুম্ভমেলা হইতে অনেকগুলি বালিকাই সিদ্ধাশ্রমের শোভাবৃদ্ধি করিয়াছে, এবং তাহাদের জন্য যে স্বতন্ত্র কুটীর অঞ্চলটী নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহার তত্ত্বাবধায়ক হইতেছেন লালা লছমন দাস। লালাজীর নির্দ্দেশ মতই সেখানে অন্যান্য বালিকাদের শিক্ষা দীক্ষা খেলাধূলা প্রভৃতি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, কিন্তু তনুকে শিখাইয়া পড়িয়া গড়িয়া তুলিবার ভার লইয়াছেন স্বামীজী স্বয়ং। তাঁহার সাধন ভজন,

যোগ অধ্যয়ন, চিন্তা পরিকল্পনা—সব কিছুই এখন তন্নুর তন্নুলতাটী ঘিরিয়া ঘুরিয়া থাকে। লালাজীর বহু অনুরোধে অপরাহ্নের দিকে মাত্র একটী ঘণ্টা তিনি তন্নুকে ছুটী দিয়া থাকেন—লালাজীর আশ্রম-বালিকাদের সহিত মিশিয়া খেলাধূলা এবং শক্তি-চর্চ্চার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যেও অধিকাংশ দিন খেলা দেখিবার অছিলায় স্বামীজীকে তন্নুর সন্ধানে উপস্থিত দেখা যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, স্বামীজীর সাধনার প্রভাবেই হৌক, বা সাধনালব্ধ কোন দিব্য ঔষধের গুণেই হৌক, প্রায় সম্বৎসরের মধ্যেই অন্যান্য মেয়ে-গুলি আপনাদিগকে এই আশ্রমেরই প্রতিপাল্য কন্যা ভাবিয়া বাঁধাধরা জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে পাঞ্জাবী বালিকা-টীকে শুধু পোষ মানাইতে কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তন্নুকে লইয়া স্বামীজীকে যেভাবে হিমসিম খাইতে হয় তাহা সত্যই বেদনা-দায়ক। বলবান রোগীকে 'ক্লোরোফরম' সাহায্যে অজ্ঞান করিবার চেষ্টা যে-ভাবে উপর্য্যুপরি ব্যর্থ হইয়া যায়, স্বামীজীর অব্যর্থ শক্তির প্রভাব অতিক্রম করিয়া এই দুর্জ্জয় মেয়েটী তাঁহাকে তেমনই বিব্রত করিয়া তোলে। দাড়ি ছিঁড়িয়া, পুঁথি পত্র তছনছ করিয়া, ইংরাজী বাঁধানো কেতাবগুলিকে লোষ্ট্রের মত ব্যবহার করিয়া সে স্বামীজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। স্বামীজীকে অগত্যা বাধ্য হইয়া বহুদিনের সঞ্চিত দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফের পাট তুলিয়া দিতে হয়। গভীর রাত্রিতে এই ভাবে ক্ষৌর কার্য্য চলে। পরদিন প্রত্যুষে স্বামীজীর শ্মশ্রুগুম্ফহীন প্রসন্ন মুখের তরল হাসি, সদ্যঃনিদ্রোত্থিতা বালিকা বুঝি স্নিগ্ধদৃষ্টিতেই দেখিয়াছিল। ইহার পর বালিকার মনোবৃত্তির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আশ্রমশুদ্ধ সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দেয়। কেননা, তন্নুকে আর

কোনদিন কেহ কোন প্রকার বিদ্রোহ করিতে বা স্বামীজীর উপর শক্তি চালাইতে দেখে নাই। সে যেন স্বামীজীর ইচ্ছাশক্তির নিকট স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

সেই দিন হইতে তনুর সকল ভার স্বামীজীকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান, পরিচ্ছদের ধারা, ভোজনের তালিকা, খেলাধূলার ব্যবস্থা—প্রত্যেকটি সুচিন্তিত পরিকল্পনায় স্বামীজী নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। শিষ্ট বালিকার মত তনু নির্ব্বিচারেই সেগুলি অধিকাংশ সময় মানিয়া চলে সত্য, কিন্তু এক এক সময় সহসা তাহার চক্ষুর তারা দুটি যেন জ্বলিয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড করিয়া বসে। সে সময় কেহই তনুকে সামলাইতে সমর্থ্য হয় না; কিন্তু আশ্চর্য্য, স্বামীজীর উপস্থিতিতেই বহ্নি নির্ব্বাপিত হয়; তনুর উদ্ধত তনুলতা পুনরায় নম্র হইয়া সকলকে অবাক করিয়া দেয়।

সে দিন স্বামীজীর খাস-কামরায় লালাজীর সহিত তনুর এই আচরণ সম্পর্কেই আলোচনা চলিতেছিল।

স্বামীজী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন: সার্কাসের পোষা বাঘ দেখেছ ত লালা, দিব্যি খায় দায় বেড়িয়ে বেড়ায়, হাজার হাজার লোকের সামনে কতরকম খেলা দেখায়, ছাগল-ছানাকে পীঠে তুলে নাচে। কিন্তু এরই ফাঁকে আগেকার স্বাধীন অবস্থার স্মৃতি কোন রকমে স্পষ্ট হয়ে উঠলেই সে তোলে বিদ্রোহ—বর্ত্তমানের বন্ধন ছেঁড়বার জন্য তখন তাকে মরিয়া হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই মেয়েটিরও হয়েছে তাই।

লালা: তাহলে কি আপনি বলতে চান, আপনার তনুর মনে

এখনো পূর্ব্বস্মৃতি জাগে? এখনো কি এলাহাবাদের কথা সব ভুলতে পারে নি?

স্বামীজী: বাঘের উপমা দিয়ে যা বলেছি তাতেই কি তোমার প্রশ্নটির উত্তর পাওনি? সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে খেলবার সময় এমন কিছু ঘটে, যাতে মনটা তার ফুটো হয়ে যায়, আর তারই ফাঁক দিয়ে পূর্ব্বস্মৃতির আলো অমনি চোখে এসে পড়ে। এই জন্যেই আমি তাকে কারুর সাথে মিশতে দিতে চাইনি।

লালা: কিন্তু কারুর সাথে মিশতে না দিলে তার স্বভাবটিই যে বুনো হয়ে যাবে দাদাজী! দশটা মেয়ের সঙ্গে না মিশলে, দৌড় ঝাঁপ, হুটোপাটি, মারামারি—এসব না করলে আপনার তনুকে সবদিক দিয়ে আপনি চৌখোস করবেন কি করে? শুধু লেখা পড়া শেখালে, আর খবরের কাগজ পড়ে বোঝালেই কি তাকে আপনার 'দেবী চৌধুরাণী' করে তুলতে পারবেন?

স্বামীজী: তোমার এ-যুক্তি ত আমি অস্বীকার করিনি লালা। সেই থেকেই ত তনু ও-পাড়ায় গিয়ে রীতিমত মিশছে, খেলছে, দৌড়ঝাঁপ করছে। কিন্তু তাতে অসুবিধা হচ্ছে কি জান,—ওদিকের আকর্ষণটা এত বেশী যে এখানকার কাজগুলো যেন এক পেশে হয়ে পড়ছে।

লালা: ত্রুটিটা কি ওরই ঘাড়ে চাপাতে চান দাদাজী? বয়সটা দেখে তবে বিচারটা করা উচিত। আরো দু-চারটে বছর যেতে দিন, দেখবেন তখন—এদিকের 'এলেম'টাও কতটা দখল করে বসেছে। এখনই যা শিখেছে, তাকি বয়স হিসাবে অন্যের পক্ষে পর্ব্বত নয়?

স্বামীজী : সেটা ঠিক। তবে কি জান লালা, আমার যেন আর সবুর সইছে না। নিজের বয়স যত গড়িয়ে চলেছে, ততই দুশ্চিন্তা গভীর হয়ে উঠেছে—জীবনের সাধটা বুঝি অপূর্ণই থেকে যায়। তোমারই চেষ্টা আর উদ্যোগে মেয়েটাকে পেয়ে আমি জীবনের মোড়টা পিছন থেকে ফিরিয়ে জোর করে সামনের দিকে নিয়ে চলেছি ;—তাকে টানছে ঐ মেয়েটা।

লালা : সে ত দেখতেই পাচ্ছি। জীবনটা মরচে ধরে ক্রমশঃই অচল হয়ে পড়ছিল, এখন ঐ মেয়েটা তেজী ঘোড়ার মত তাকে টেনে শুধু যে সফল করেছে তা নয়, শ্রী-ছাঁদপর্য্যন্ত বদলে দিয়েছে। তার সাক্ষী আপনার চেহারা, খাওয়া-পরনা আর হাল চাল। প্রয়াগের মেলায় যে লোক আপনাকে দেখেছিল, আজ যদি আপনার সামনে এসে দাঁড়ায়, হলফ করে বললেও বিশ্বাস করবেনা যে—সেই লোক আপনি! সেফ্‌টি ক্ষুরে নিত্য খেউরি হন, স্নো-পাউডারের প্রলেপ দেন! ভাগ্যিস্ মেয়েটার দাড়ির ওপরে অতটা বিষদৃষ্টি হয়েছিল।

লালার শেষের কথাগুলি, স্বামীজীর সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা শিহরণ তুলিয়া দিল। আত্মবিস্মৃতের মত বিহ্বলভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন : তার ঐ দৃষ্টির মধ্যেই আর একটা মেয়ের মুখ মনের মধ্যে ভেসে উঠত আর আমাকে ঠেলে দিত পিছনে। অমনি সব গোলমাল হয়ে যেত!

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে স্বামীজীর মুখের পানেই লালা চাহিয়াছিল। মনে মনেই তিনি বুঝি স্বামীজীর অস্পষ্ট কথাগুলির একটা অর্থ স্থির করিয়া সহসা দৃঢ় স্বরে কহিলেন : আজও গোল করে ফেলেছেন

দাদাজী, নিজের কথাতেই ধরা পড়ে গেছেন! এখন কবুল না করে আর উপায় নেই।

উভয় চক্ষুর দৃষ্টিতে বিস্ময় এবং প্রশ্ন ভরিয়া স্বামীজী কহিলেন: তার মানে?

লালাজী গম্ভীর মুখে কহিলেন: আপনিই মনে করুন, বুঝতে পারবেন।

ইহাতেও স্বামীজীর মুখের ভাব অপরিবর্ত্তিত দেখিয়া লালাজী কহিলেন: সাধারণ লোকে যে ভুল ক'রে পস্তায়, আপনার মত লোকের পক্ষে সে-রকম ভুল করা কি ঠিক দাদাজী? তন্ত্রের ব্যাপারে প্রথম দিনই এলাহাবাদে আপনি এমনি একটা ভুল করে ফেলেছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও সেদিন আপনার ঐ ভুলের মধ্যে ঢুকে মনের সন্ধান কিন্তু পাইনি। তবে আমার ব্যগ্রতা দেখে নিজেই তখন বলেছিলেন—মনটাকে যদি আর কোন দিন এভাবে নড়তে দেখ লালা, সেদিন চাপা-পড়া মাটিগুলো তুলে গোড়াটা দেখিয়ে দেব। আজ-যে কথায়-কথায় মনটি ঠিক সেই ভাবে নড়ে উঠেছে দাদাজী!

স্তব্ধভাবে ক্ষণকাল লালাজীর মুখের পানে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া স্বামীজী বলিলেন: তুমি দেখছি আমার চেয়েও সয়তান!

তৎক্ষণাৎ মাথাটি নত এবং হাত দুইখানি স্বামীজীর পাদদেশে প্রসারিত করিয়া লালাজী বলিলেন: এ যে আমার পক্ষে মস্ত একটা 'সার্টিফিকেট' দাদাজী!

স্বামীজী গম্ভীর মুখে বলিলেন: আমি এখন বুঝছি লালা, আমার মনোবিজ্ঞানের খান কয়েক পাতা তোমাকে না পড়িয়ে মস্ত

একটা ভুল করেছি। কিন্তু সে পাতাগুলো খোলবার আগে তার ভূমিকাটা তোমাকে সংক্ষেপে না শোনালে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না। বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকবে, বিশ বিছর আগেকার মনে-লাগা কোনো একটা গানের সুর হঠাৎ যদি কানে লাগে, অমনি সমস্ত গানটি মনে প'ড়ে যায়। এটা হচ্ছে মনের কাজ, এরই নাম মনস্তত্ত্ব। এমনি আমাদের অতীত জীবনে বড় রকমের ব্যাপার যা ঘটে যায়, তার একটা প্রতিবিম্ব আমাদের মনের অবচেতন স্তরে যুগ যুগ ধ'রে জমা হয়ে থাকে কোন হদিসই পাওয়া যায় না। কিন্তু হঠাৎ—তার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এমন সামান্য একটা ঘটনার পুনারাবৃত্তি হ'বামাত্রই সেই ঘটনার প্রতিবিম্বটি অবচেতন থেকে একবারে চেতন স্তরে এসে একটা দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে, পুরানো অনুভূতিটাও সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হয়ে ওঠে। এই জন্যই রক্ত দেখলে কিম্বা মাংসের গন্ধ পেলে চিড়িয়াখানার বাঘ গর্জ্জন ক'রে ওঠে। আমার উত্তেজনাটাও এমনি একটা পুরানো অনুভূতির আকস্মিক জাগ্রত অবস্থা—বুঝলে ?

লালা : মনস্তত্ত্বের চেয়ে আমি দেহতত্ত্বটিই যে বেশী বুঝি দাদাজি! আমার মনে হয় মনের ব্যাপারগুলো সবই অবাস্তব, কিন্তু দেহের কাজ গুলো পুরোপুরি বাস্তব। তবে এই বাস্তব আর অবাস্তবের মধ্যে যে একটা পুরাদস্তর মাখামাখি ভাব আছে, তাও না বলতে পারি না। যাই হোক, ভূমিকা ত শুনলুম, এবার কেতাবখানি শুনিয়ে দিন।

স্বামাজী : সত্যভঙ্গ আমি করব না লালা, অকপটেই আমার জীবনের অতীত অধ্যায়টি বলছি, শোন :—আমার সম্বন্ধে এইটুকুই তুমি জান যে, কতকগুলো ছেলেকে ধরে-বেঁধে দল পাকাবার

জন্মেই আমার জেল হয়। কিন্তু তার আগের কোন পরিচয় তুমি পাওনি। শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন-যাত্রার ছন্দই আমার ছাত্র-জীবনকে মনোরম করেছিল। বাবা ছিলেন যাজক, বিশিষ্ট ভট্টাচার্য্য পদবী, তারি সিদ্ধ-বংশ, অর্দ্ধকালীর বংশধর ব'লে আমরা সমাজে সম্মানিত ছিলুম। ধর্ম্ম আর ভগবান, ন্যায় আর পুণ্য—এই আবহাওয়ার ভিতর দিয়েই মানুষ হয়েছিলুম। মেধাবী ছাত্র ব'লে নিজের খ্যাতিও বড় কম ছিল না। ইংরাজী আর দর্শনে এম-এ পাশ করে যখন কুইন্স কলেজের অধ্যাপক পদে পাকা হয়ে বসি, আমার বাবা তখন সেইখানেই সংস্কৃতের প্রবীণ অধ্যাপকরূপে নাম করেছেন খুব। কলেজের কাছাকাছি একটা ফাঁকা জায়গায় নিজেদের বাড়ী। তার কাছাকাছি বড় বাগানবাড়ীখানিতে থাকতেন বেনারস ডিষ্ট্রিক্টের জজ সাহেব। তিনি ছিলেন আবার বাবার বাল্যবন্ধু, ময়মনসিং জেলার এক প্রসিদ্ধ গ্রামেই তাঁদের নাকি বাল্যজীবন কেটেছিল। কাশীতে কর্ম্মস্থানে দীর্ঘকাল পরে একই অঞ্চলের বাসীন্দা হওয়ার সুযোগে তাঁদের শৈশবজীবনের বন্ধুত্বটি আবার নূতন করে এমন জেঁকে উঠল যে, দুই বাড়ীর মধ্যে সঙ্কোচের ব্যবধান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। জজ সাহেব হলেন সম্পর্কে কাকা, তাঁর মেয়ে অনুপমা সেই সম্পর্ক ধরে দাদা বলেই আমাকে মেনে নিল। তন্বী সুন্দরী সে, মুখখানা এত চমৎকার যে, চখে পড়লে পল্লব পর্য্যন্ত স্তব্ধ হয়ে যায়, বয়স তখন বছর পনেরো, এনিবেসান্তের থিওজফিক্যাল গার্লস স্কুলে পড়ছে। জজসাহেব বরাবর বাইরে বাইরে কাটিয়ে এসেছেন, তাঁর মতটিও ছিল খুব উদার, তাই তখন পর্য্যন্ত মেয়েকে আইবুড়ো রেখে স্কুলে পড়াচ্ছিলেন, আর—আমার মত তরুণ বয়স্ক যুবকের সঙ্গে

পড়া-শুনার ব্যাপারে মিশতে দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি কিম্বা মনে কোন রকম অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেন নি। কিন্তু তাঁর সেই বিশ্বাসের মর্য্যাদা আমার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

লালা নিবিষ্ট মনেই স্বামীজীর কথাগুলি শুনিতেছিলেন, এই সময় সহসা বলিয়া উঠিলেন: অবিশ্বাসের কথাই বা এল কেন দাদাজী? দুপক্ষে অত মাখামাখি যখন, বিয়ের কথাটা ত…

লালার কথায় বাধা দিয়া স্বামীজী বক্রকণ্ঠে কহিলেন: শোন কথা. আরে বোকা. বিয়ের কথা ওখানে উঠবে কোথা থেকে? বললুম না, আমি হচ্ছি ভট্টাচার্য্যের ছেলে, আর জজ সাহেব যে কায়েত—অর্থাৎ বাংলা দেশের 'লালা'। বামুন-কায়েতের মধ্যে বিয়ের কথা তুলবে সামাজিক মানুষ? অসম্ভব! কিন্তু আমার মন যে কোন্ ফাঁকে সমাজের এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীটাকে বিস্তীর্ণ করে ফেলেছে, আর, আমার মিলনেচ্ছাটিই সেখানে বড় হয়ে মানুষের তৈরী ব্যবস্থাটাকে একেবারে মুছে দিয়েছে, সেটি জানতে পারি নি। জানতে পারলুম সেইদিন—কলেজ-ম্যাগাজিনে অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনে আমার লেখা একটা প্রবন্ধের ব্যাপার নিয়ে যখন খুব সাড়া পড়ে গেছে,—আর সেটা অনুর কানে পর্য্যন্ত গিয়ে উঠেছে। কেননা, সেদিন সন্ধ্যার সময় তার পড়ার ঘরে ঢুকতেই সে একখানা কাঁচি আমার হাতে দিয়ে বলল—'পড়াতে বসবার আগে টিকিটি তোমার কেটে ফেল দাদা!' এর আগে আর একদিন সে আমার কিশলয়ের মত নূতন গজানো দাড়িগুলি নিশ্চিহ্ন করবার জন্য জিদ ধরেছিল। সে দিনের যুক্তি ছিল তার—টিকি আর দাড়ি দুটোয় মিশ খায় না। কিন্তু বাধ্য হয়েই সেদিন আমাকে টিকি আর দাড়ি

দুটোরই মাহাত্ম্য প্রচার করে তবে তাকে শান্ত করা গিয়েছিল। কিন্তু এ-দিন আর তাকে বশে আনা গেল না। ধনুর্ভঙ্গ-পণ তার—টিকি না কাটলে কিছুতেই আমার কাছে সে পড়বে না। জেদে আমিও কম যেতুম না, বললুম—বিদ্যাসাগর নূতন মতবাদ প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তার জন্যে কেউ তাঁকে টিকি কাটতে বলেনি। উত্তরে অনু তার মুখখানার এক অপূর্ব্ব ভঙ্গি করে বল্‌ল—বিদ্যাসাগরের কোন বিধবা ছাত্রী ছিল আর তার ওপর নিদারুণ একটা লোভ থাকার জন্যই যে তাঁকে বিধবা বিয়ের ব্যবস্থা প্রচার করতে হয়েছিল—এমন কথা শুনি নি। মেয়েটার প্রতিবাদের যুক্তি আর মুখের ভঙ্গি আমার চোখের পরদা যেন খুলে দিলে। বুঝতে আর বাকী রইল না, তাকে পাবার লোভ আমার ঐ লেখাটার ভিতর দিয়েই তার চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে গেছে। মনে মনে খুসিই হলুম, আর মনের সঙ্গে মিলিয়েই ঝাঁ করে কথাটার পাল্টা জবাব দিলুম—সেরকম সুযোগ যদি তাঁর আস্‌ত তখন, তাহলে তাঁর মতবাদ অত বাধা পেতনা। কথায় আছে—আপনি আচারি ধর্ম্ম অন্যে শিখাইবে। এদিক দিয়ে কিন্তু আমি ভাগ্যবান। কথাগুলো বক্তৃতার সুরে এক নিশ্বাসে শেষ করে আমি তার মুখের পানে তাকাতেই দেখলুম, এত বড় কথা শুনে তার মুখের ভাব একটুও বদলায়নি, ঠোঁটের কোনে স্বচ্ছ হাসিটুকু তেমনি জড়িয়ে আছে, শুধু চোখের তারা দুটী একটু বেশী চক্‌চক্ করছে। চোখোচোখি হতেই অনু বলে উঠল—আজ থেকে আর দাদা বলে তোমাকে ডাকবনা, টিকি দাড়ি আর যুক্তির জোরে তুমি সাধু হয়ে গেছ। আমি তোমাকে সাধুজী বলেই ডাকব। এরপর আমাকে দেখলেই সে সাধুজী বলে ডাকত, আর এমন অপূর্ব্ব একটা সুরে ডাকত যে শুনেই আমি তন্ময় হয়ে যেতুম।

লালা এই সময় বলিয়া উঠিলেন: এখন বুঝতে পেরেছি দাদাজী, তনুকেও আপনি সাধুজী ব'লে কেন ডাকতে বাধ্য করেছেন! তনুর গলার মিষ্টি সুরের ভিতর দিয়েই আপনি অতীতের সেই অতিবাঞ্ছিত *ডাকটি অনুভব করতে চান!*

লালার কথাটার কোন উত্তর না দিয়া স্বামীজী আপন মনেই বলিলেন: এখন গল্পটার উপসংহার করা যাক। এরপর মনের উৎসাহ এমনি দুর্ব্বল হয়ে পড়ল যে, বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের সমাজের যা-কিছু প্রচলিত মতবাদ, প্রত্যেকটিকে নিষ্ঠুর পরিহাস করে একখানি কেতাব লিখে ফেললুম। বইখানা ছাপাবার জন্যে একটি মাস আমাকে এলাহাবাদে বাস করতে হয়। সেখান থেকেই ছাপা বই সর্ব্বপ্রথম রেজিষ্টারী ডাকে অনুর নামে পাঠিয়ে দিই। টাইটেলের পরেই উৎসর্গ পত্রে বড় বড় অক্ষরে যে কয়টি কথা ছাপা হয়েছিল, এখনো তা মনে আছে।

কথাগুলি হচ্ছে:—যাকে প্রথম চোখে দেখেই আমার মনের ঘটে এই উদার মতের বীজগুলি সঞ্চিত হয়, যার নিবিড় সংস্পর্শে ক্রমশঃ সেগুলি অঙ্কুরিত পল্লবিত ও মুকুলিত হয়ে ওঠে, আজ সেই সযত্ন-গ্রথিত মত-মঞ্জরিগুলি মঞ্জুভাষিণী অনুপমার মঞ্জু-করে সাদরে উপহৃত হল।

বিস্ময়ের সুরে লালা বলিয়া উঠিলেন: বলেন কি? অবিবাহিতা কন্যার নামে বইয়ের পাতায় এই কথাগুলো ছেপে দিলেন!

স্বামীজী সহজসুরেই বলিলেন: তখন যে ভাব-জগতে বিচরণ করছিলুম; তরুণ বয়েস, তার ওপর রূপ আর মতের মোহ—দুটোই দুর্ব্বার। *সমাজের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা যে খুবই খারাপ, সেটা তখন* মনে আসেনি। এরপর ছাপানো বইগুলো নিয়ে কাশীতে ফিরে

এসে জজ-সাহেবের বাড়ীতে ধূলোপায়ে ঢুকতেই প্রথম ধাক্কাটা খেয়ে আকাশ থেকে পড়লুম আর কি! জজ-সাহেব তখন তাঁর বসবার ঘরের বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। আমাকে দেখেই চাপরাসীকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন। কাছে গিয়েই মামুলী প্রথায় স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করতেই আঙ্গুল দিয়ে সামনের ঘরখানা দেখিয়ে দিলেন। ঘরে ঢুকেই তাঁর মুখের পানে তাকাতেই চম্‌কে উঠলুম। মনে হল, সেই হাস্যময় সদা-প্রসন্ন মুখখানার উপর একটা হিংস্র জানোয়ারের মুখ কে যেন বসিয়ে দিয়েছে, চোখ দুটো জ্বলছে। ঘরের দরোজাটা পীঠ দিয়ে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বামদিকের র‍্যাক থেকে একখানা বই তুলে আমার সামনে গোল টেবিলটার মাঝখানে ফেলে দিলেন, আর সেই সঙ্গে ডানদিকের দেওয়ালের গায়ে হুকে টাঙ্গানো সাপের ন্যাজের মত চামড়ার চাবুকটি টেনে নিয়ে সেইটিই আঙ্গুলের মতন হেলিয়ে অত্যন্ত রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করলেন—এ বই তোমার লেখা? সেটি আমারই জ্ঞান-বৃক্ষের প্রথম ফুল বা ফল—এলাহাবাদ থেকে ডাকযোগে যেখানি অনুর নামে পাঠিয়েছিলুম। তখন পর্য্যন্ত অবস্থাটা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিনি, সপ্রতিভ ভাবেই স্বীকার করলুম যে, বইয়ের লেখক আমিই। এরপর তাঁর দাঁতের ভিতর দিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন বেরিয়ে এল আরও তীক্ষ্ণ হয়ে—বই লেখবার স্বাধীনতা তোমার থাকতে পারে, কিন্তু আমার মেয়ের নামের সঙ্গে এই নোংরা কথাগুলো ছাপবার অধিকার তোমাকে কে দিলে?—প্রশ্নের সঙ্গেই যেন মগজের চাপা পরদাটা কে খুলে দিল একটানে। সত্যই ত, অনুর নামটি স্পষ্ট করে ছেপে দেওয়াতেই আজ অধিকারের কথা উঠেছে! কিন্তু পরক্ষণেই তারুণ্যের অভিমান দীপ্ত হয়ে আমাকে তাতিয়ে দিল। চোখ তুলে

উত্তর করলুম—'যা সত্য, তাই অকপটে লিখেছি। কাউকে কিছু দেওয়াটা হচ্ছে আমার ইচ্ছাধীন, তবে নেওয়াটা অন্যের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। এখানে অধিকারের কোন প্রশ্ন নেই।' চাবুকের মাথাটা টেবিলের ওপর সজোরে ঠুকে জজ-সাহেব হুঙ্কার তুলিলেন—সাট-আপ্! কি বলব, তুমি জাতে ব্রাহ্মণ, তার ওপর তোমার বাবা আমার বাল্যবন্ধু, নতুবা এই চাবুক দিয়ে তোমার গায়ের চামড়া তুলে ও-কথার জবাব দিতাম।—এত বড় কথার পর আর বসে থাকা চলে না, মাথার ভিতরে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। মুখের কথা মুখেই চেপে ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত উঠে দাঁড়ালুম। কিন্তু হাতের চাবুকটি তুলে জজ-সাহেব শাসালেন—'যাবে কোথায়? তোমার বাবাকে খবর দেওয়া হয়েছে, তিনি আসছেন। তাঁর সামনেই এ ব্যাপারের হেস্ত-নেস্ত একটা হলে তবে তোমার নিষ্কৃতি।'

পরের ব্যাপারটির কথা সংক্ষেপেই শেষ করছি। সেই ঘরেই ঘণ্টা খানেক আমাকে আটক রেখে আমার বাবা আর অম্বুর বাবা দুই ঝুনো বৃদ্ধের পাকা মাথা থেকে যে যুক্তি-বহ্নি বেরুল, তাতে ছাপা বইগুলিকে আনিয়ে আমার চোখের সামনে পুড়িয়ে ফেলা হল। এর ওপর জজ-সাহেব জানিয়ে দিলেন, তাঁর বাড়ীর দরজাই যে শুধু আমার জন্যে বন্ধ থাকবে তা নয়—আমাকে কাশী ছেড়ে অন্তত একটি বছর এলাহাবাদে থাকতে হবে, সেখানকার কায়স্থ কলেজে তিনি আমার চাকরী জুটিয়ে দেবেন। আর, আমার বাবাও বন্ধুর এই ব্যবস্থা নির্বিচারে মেনে নিয়ে হুমকী দিলেন যে, এর অন্যথা হলে তিনি আমাকে ত্যাগ করতেও দ্বিধা করবেন না। ব্যস্, দুর্জ্জয় জেদ আমাকেও পেয়ে বসল; যেমন ধূসপায়ে জজ-সাহেবের বাড়ীতে সেঁধিয়েছিলুম,

সেখান থেকেও তেমনি সেই অবস্থাতেই বৈরাগ্যের পথে পাড়ি দিলুম।

লালা এই সময় জিজ্ঞাসা করিলেন: জজ সাহেবের মেয়ের সঙ্গেও দেখা করলেন না?

স্বামীজী গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন: না, তার যে মূর্ত্তি মনের মধ্যে এঁকে ফেলেছিলুম তাকেই ফুটিয়ে তোলা হল আমার কিছু-কালের সাধনা। প্রিয়জনদের পরিত্যাগ করলুম, বন্ধুদের সঙ্গ হারালুম, প্রফেসারী ছেড়ে দিলুম, কিন্তু অনুর স্মৃতি ভুলতে পারলুম না। বছর দুই পরে খবরের কাগজে দেখলুম, জজ সাহেব বোম্বায়ে বদলী হয়েছিলেন, সেখানেই হার্টফেল করে মারা গেছেন। তখনো চলেছে পূরা উদ্যমে আমার মানস-প্রতিমার নিয়মিত অর্চ্চনা। খবরটা পেয়েই মনটা দুলে উঠল, আমি তখন কনখলে। সেখান থেকে লম্বা একখানা চিঠি ছাড়লুম অনুর নামে। পিতৃশোকে সমবেদনার সঙ্গে মানস-প্রতিমার উদ্দেশে কঠোর সাধনার কথাও বিস্তারিত ভাবেই তাতে লেখা ছিল। কিন্তু পত্রের উত্তর পেয়ে একবারে যেন আকাশ থেকে আছাড় খেয়ে পড়লুম। উত্তর দিয়েছেন—হরপ্রসাদ ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক। খুব সংক্ষেপে লিখেছেন তিনি—অনুর কাছে আপনার ইতিহাস সবই শুনিছি আমি। আমরা ভেবেছিলুম, সর্ব্বত্যাগী হয়ে আপনি মানসপাপের প্রায়শ্চিত্য করছেন। কিন্তু তার বদলে আপনি যে পূর্ণউদ্যমে মানসপ্রতিমা গড়তে লেগে গেছেন, এ খবর পেয়ে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করছি। অনুগ্রহ করে একদিন অধীনের অফিসে পদধূলি দিয়ে আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অনুপমার বাস্তব-প্রতিমার সঙ্গে আপনার মনেগড়া মানস-প্রতিমাটী মিলিয়ে দেখতে পারেন।

লালা বিস্ময়ের সুরে কহিলেন: সর্ব্বনাশ! এ যে সেই—গ্রীক্ মিট এ গ্রীক্—অর্থাৎ সেয়নায় সেয়নায় কোলাকুলির মতন হল! তারপর? গেলেন নাকি বোম্বায়ে?

স্বামীজী শুষ্ক স্বরে কহিলেন: পাগল! তাহালে বুকের ছাল তুলে ছবি খুঁজে বার করত ঐ হরপ্রসাদ! ডাইরেক্টরী খুলে জানতে পারি—সে একটা মস্ত মার্চ্চেণ্ট ওখানকার। সেইদিন থেকেই মনের ছবির ওপর পরদা ফেলে দিয়ে অন্য রাস্তা ধরলুম। খেয়ালের বশে অনেক কিছুই—করা গেল, নানা রকম রাস্তা খুঁজে বার করে খুব ছুটোছুটিও চলল। কিন্তু কেউ যদি সন্ধানী দৃষ্টিতে তল্লাস করত, তাহলে বোধ হয় বেরিয়ে পড়ত যে ওসবের তলে তলে রয়েছে মস্ত একটা আক্রোশ—ঐ মেয়েটাকে ঘিরে। কিন্তু ক্রমে তার স্মৃতি চাপা পড়েই গিয়েছিল। সে চাপা খুলে দিল তার মেয়ে···আর উপলক্ষ হলে তুমি।

লালা: কিন্তু এখন আপনি ইচ্ছা করলেই মনের আক্রোশ মেটাতে পারেন। হরপ্রসাদ ঘোষ মেয়ের জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

স্বামীজী: তাহলেই কি মনের আক্রোশ আমার মিটবে বলতে চাও?

লালা: টাকার লোভ আপনার নেই তা জানি, এদিক দিয়ে আপনি পরমহংস; টাকা পয়সা স্পর্শও করেন না। তবে একটা মতলব ত কিছু আছে। না হয় দেবী চৌধুরাণীই তৈরী করলেন, কিন্তু তার পর? মেয়েকে দিয়েই কি শেষে বাপের ঐশ্বর্য্যের উপর ডাকাতি করে কিম্বা মাকে ধরে এনে মনের ঝাল মেটাবেন দাদাজী?

স্বামীজী : একথার উত্তর আমি তোমাকে এখন দিতে পারব না লালা ; কেননা, আমি নিজেই তা জানি না। এখন আমি ওকে শুধু আমার মনের মতন করে শিখিয়ে পড়িয়ে নেব—যে পর্য্যন্ত বয়স ওর ষোল পূর্ণ না হয়। অনুর ছবি আমার মানস-পটে যখন আঁকতে সুরু করি—তখন সেও ছিল প্রায় ষোড়শী···এর বেশী আর কিছু বলব না লালা, তুমিও এসম্বন্ধে আর প্রশ্ন তুলনা ভাই! সময়ে সবই জানতে পারবে—বুঝেছ ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীজীর মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া লালা কহিলেন : আপনি যতটুকু বললেন দাদাজী, এই যথেষ্ট। এর পরের অধ্যায় জানবার প্রলোভন আমার নেই। আমি অতীত আর ভবিষ্যৎ ছেড়ে বর্ত্তমানকে নিয়েই সাধনা চালাতে ভালবাসি।

স্বামীজী : তাই উচিত, বুদ্ধিবৃত্তির এইটিই হচ্ছে প্রধান অঙ্গ। আজ কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ করতে বসে তনুর খেলা দেখতে আর যাওয়া হলনা। তুমিও সেখানে অনুপস্থিত, খেলা বোধ হয় ওদের আজ আর হ'বে না।

লালা : আপনার সঙ্গে আলাপ করব বলেই খেলার একটা নতুন ধারা দেখিয়ে দিয়ে এসেছি। আপনার দ্রোণাচার্য্যেরই অনুকরণ আর কি! একটা পাখী তৈরী করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছি। একশো হাত তফাতে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়ে তার চোখটি বিঁধতে পারলেই বাঁধন কেটে পাখীটা ঝুপ করে পড়ে যাবে। সেই প্রতি-যোগিতাই ওদের চলেছে।

স্বামীজী উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন : চল তাহলে দেখা

যাক খেলাটি কি ভাবে শেষ হল; মেয়েটাও অনেকক্ষণ চোখের আড়ালে রয়েছে।

স্বামীজীকে উঠিতে দেখিয়া লালাও উঠিলেন এবং পরক্ষণেই কক্ষের রুদ্ধ দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল তনু। হাতে তাহার বাখারীর ধনুক, পীঠের দুইদিকে দুইটি তুণ পরিপাটি করিয়া বাঁধা, তাহাতে নল-খাগড়ার মুখে সংযুক্ত লোহার সরুসরু ফলাগুলি চিক্ চিক্ করিতেছে। মেয়েটির কালো লম্বা চুলগুলি বেণীবদ্ধ হইয়া পীঠে দুলিতেছে, তার প্রান্তভাগে এটি পঞ্চমুখী জবাফুল বাঁধা। লাল পাড়ের যোগিয়া রঙের সাড়ীখানি হাতকাটা জামাটির সংযোগে আঁট সাট করিয়া তাহার সুডৌল দেহটিকে আবৃত করিয়াছে। অনাবৃত বাহুমূলে ও প্রকোষ্ঠে অলঙ্কারের আকারে সুশ্রী ফুলের বেষ্টনী। কানে রক্তবর্ণ দুটি প্রবাল ঝুলিতেছে, ললাটে সিন্দূরের উজ্জ্বল ফোঁটাটি যেন অগ্নিশিখার মত জ্বলিতেছে, তাহার একটু উপরে চুল ঘেঁসিয়া ফিতার মত প্রশস্ত পিঙ্গল-বর্ণের এক শ্রেণীর লতার দ্বারা ফেট্টি বাঁধা; সুন্দর মুখখানি সাফল্যের উল্লাসে সমুজ্জ্বল।

মেয়েটি আসিতেই উভয়ে পুনরায় বসিলেন এবং স্বামীজী লালাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: একবারে শিকারী সাজিয়েছ যে দেখছি!

তনুই উপরপড়া হইয়া তাড়াতাড়ি কথাটার উত্তরে বলিল: শুধুই সেজেছি নাকি, শিকারও করেছি। আপনি ত শিকার দেখিয়ে চলে এলেন ওস্তাদজী, তারপর যা হোল মজা!

ওস্তাদজী অর্থাৎ লালা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তনুর পানে চাহিতেই সে পুনরায় বলিল: আপনার চামেলী জোর করে বলেছিল, পাখীটার চোখ বিঁধতে সেই পাড়বে। কিন্তু পেড়েছি আমি, চামেলীর মুখ চুণ হয়ে গেছে।

সিদ্ধির আহুতিরূপে সিদ্ধাশ্রমে যে কয়টি জীবন্ত সমিধ আহৃত হইয়াছে, চামেলী নামে মেয়েটি তাহাদেরই একজন। প্রয়াগের আশ্রমেই এই পাঞ্জাবী বালিকাটিকে আমরা দেখিয়াছি। এখানে চামেলী নামে তাহাকে পরিচিত করা হইয়াছে। একপাল মেয়ের মধ্যে এই মেয়েটিই তনুর মত বুদ্ধিমতী এবং খেলধূলায় তাহার প্রতিযোগিনী।

লালা : বল কি, তুমি ত তাহলে লক্ষ্যভেদেও সবার ওপরে উঠে গেলে দেখছি!

স্বামীজী : তাইত, তোমার লক্ষ্যভেদটা দেখাই হল না আমাদের! সেদিন সাঁতার কাটা দেখে সত্যিই অবাক হয়েছিলুম।

তনু : সাঁতারেও চামেলী আমাকে হারাতে পারে নি, তিনবারই আমি সবার আগে পার হয়েছি।

লালা : কিন্তু দৌড়ে তুমি চামেলীকে হারাতে পার নি তনু। তিনটে দৌড়েই সে তোমাকে হারিয়ে দিয়েছে।

তনু : এবার যেদিন দৌড়ের পরীক্ষা হবে দেখবেন—কে কাকে হারায়।

লালা : বল কি, তুমি ঐ দৌড়বাজ মেয়েটাকে হারিয়ে দেবে ভেবেছ? পারবে?

তনু : না পারি ত নিজের ঠ্যাং ভেঙ্গে ফেলব। প্রজাপতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে দৌড় শিখছি, তা বুঝি জানেন না! চামেলী এবার আসুক না ছুটতে।

লালা : ভাল, দেখা যাবে কে হারে কে জেতে—কালই তোমাদের দৌড়ের পরীক্ষা নেওয়া যাবে।

স্বামীজী: শিকারীর সাজ এখন ত ছেড়ে ফেল, এবার পড়া চলবে।

তনু: পড়া নয়—গল্প। পড়বার আগে ত গল্প শোনবার কথা! কালকের গল্পটি আজ শেষ করতে হবে সাধুজী। অর্দ্ধেক শুনিছি; মনে থাকে যেন কাপড় ছেড়েই আমি এখুনি আসছি।—বলিয়াই দ্রুতবেগে সে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

লালাজী জিজ্ঞাসা করিলেন: কিসের গল্প এখন চলেছে দাদাজী?

স্বামীজী বলিলেন: দেবী চৌধুরাণীর। কাল বলা সুরু হয়েছে, আজ শেষ করতেই হবে।

লালাজী বলিলেন: রোখ দেখলেন ত, কোন বিষয়েই পেছপাও নয়, কারুর পিছনে পড়ে থাকতে চায়না। বলল শুনলেন ত—এবার হেরে গেলে পা ভেঙ্গে ফেলব! দৌড়ে চামেলীর সঙ্গে পারেনি ব'লে প্রজাপতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ের কসরৎ করছে!

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন: সেই জন্যই ত দেবী চৌধুরাণীর গল্পটা শুনিয়ে জমি তৈরী করে রাখছি; এর উপর তুমি ওকে ঝাঁকে মিশিয়ে যে ভাবে পাকাপোক্ত করে তুলছ সব রকমে, ষোলোয় পড়লে দেখো এ মেয়ে কি হয়!

লালাজী কি ভাবিয়া সহসা প্রশ্ন তুলিলেন: আচ্ছা দাদাজী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—মনের জোর যার এই বয়সেই এতখানি, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে কি একটা টোটকা ওষুধ আর আপনার ইচ্ছা-শক্তির জোরে আগের কথা সব ভুলে গেছে মনে করেন?

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে লালাজীর মুখের পানে চাহিয়া স্বামীজী

বলিলেন : তোমার টোলের মেয়েগুলোর অবস্থা দেখেও কি এটা বুঝতে পারনি লালা ?

লালা : তাদের কথা আলাদা। তবুও কাউকে কাউকে আনমনা হতে দেখিছি, ঘুমের ঘোরে এক এক জন হেদোয়, বাপ মা ভাই বোনকে ডাকে। চামেলীকেই কিছু বেশী বাড়াবাড়ি করতে দেখিছি। তবে আমার সামনে সজাগ অবস্থায় এখন আর কেউ টুঁশব্দটীও করে না।

স্বামীজী : নিদ্রিত অবস্থায় ওদের অবচেতন মন জাগ্রত হয়ে ওঠে, ওগুলো তারই ক্রিয়া। কিন্তু তনুর সম্বন্ধে আমি লক্ষ্য করে দেখিছি, জাগ্রত অবস্থাতেও তার অবচেতন মন পূর্ব্বস্মৃতির সামান্য একটু স্পর্শেই সাড়া দিয়ে ওঠে। কাল সেই অবস্থাই দেখা গিয়েছিল।

লালাজী : কি রকম ?

স্বামীজী : দেবী চৌধুরাণীর গল্প বলতে বলতে যেই হরবল্লভের কথা উঠল, অমনি তনু তার ডাগর ডাগর চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড় করে নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলে উঠল—হরবল্লভ ?···বউকে তাড়িয়ে দিল !···আচ্ছা, আমার বাবার নামও হর ·····এই পর্য্যন্ত বলতেই আমি তার চোখের পানে চেয়ে জোর গলায় বললুম—তোমার বাবার ও নাম হ'তে যাবে কেন ?

লালাজী : তারপর ?

স্বামীজী : একবার চমকে উঠেই আস্তে আস্তে বলল—'তাইত, আমার বাবা হলে অমন করে কখন তাড়িয়ে দিত না।' বুঝলুম, গল্পের হরবল্লভ নামটি শুনেই ওর অবচেতন মনের তারে বাপের হরপ্রসাদ নামটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে। এরপর হরপ্রসাদের নাম চেপে 'ব্রজে-

শ্বরের বাবা' বলে গল্প শুনিয়ে তবে নিষ্কৃতি পাই। এমনি করেই এই শক্ত মেয়েটির মন থেকে পূর্ব্বস্মৃতি আমাকে সরিয়ে দিতে হচ্ছে লালা। এ যেন সেই—বাঘের সঙ্গে খেলা চলেছে, একটু ভুল হলেই হালুম করে লাফিয়ে উঠবে।

লালা একটু থামিয়া বলিলেন: এ মেয়েকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মনের মতন করে গড়ে তোলা বড় সোজা কথা নয়, আপনি বলেই পারছেন। যা'হোক, চামেলীটাকেও এখন থেকে আপনাকে একটু ভাল করে তালিম দিতে হবে দাদাজী!

স্বামীজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন: সে ত দিচ্ছিই গো—যখনই যেখানে জল পড়ছে বলেছ, সামলানো যাচ্ছে না, তখুনি ছুটতে হয়েছে ছাতি ধ'রে। বল ভায়া, কোন দিন 'না' বলেছি।

লালা কহিলেন: আমরা যাই করি না কেন, এটা ভাল করেই জানি যে, মাথার ওপরে আছেন আপনি বসে। কাজ যেখানে আটকাবে, আমার সাধ্যে কুলাবে না—সেখানেই আপনি গিয়ে দাঁড়াবেন 'মুস্কিল আসান' হ'য়ে। আচ্ছা, এখন তাহলে উঠি দাদাজী, আপনার ত এখন গল্পের আসর বসবে, আমার ছাত্রীরাও আটচালায় গিয়ে জমেছে—পাঠশালা সেখানে বসিয়ে গুরুম'শায় হতে হবে।

স্বামীজী বলিলেন: হ্যাহে ভায়া, তোমার মেয়েগুলোকে নাকি জাত-ভাষা ভুলিয়ে দিয়ে বাংলা ভাষায় লায়েক করে তুলতে উঠে পড়ে লেগেছ! ব্যাপার কি?

লালা উত্তর করিলেন: ব্যাপারটা একটু বাঁকা রকমের দাদাজী। আপনি যেমন তন্নুকে বাঙলা, হিন্দী, উর্দ্দু আর ইংরিজী—এই চারটে ভাষায় লায়েক করে তুলতে চান, ওদের সম্বন্ধে আমার ইচ্ছাটিও তাই।

তবে কি জানেন, বাঙ্গালী জাতটা ওপরপড়া হয়ে পরের ভাষা শেখে, বিদেশ গিয়ে মনের জোরে বিদেশী ভাষায় কথা বলে, কিন্তু অন্য জাত এর ঠিক উল্টো। তারা যেখানেই যাক, জাতভাষার মায়া কিছুতেই ছাড়বে না। এই জন্যেই ওদের জাত-ভাষাগুলোর ওপর আপাতত ধামা চাপা দিয়ে বাঙলা আর ইংরিজীকেই চালু করে দিয়েছি। এরাও যখন সব ঘোলোয় পড়বে—তখন এর ফল কি হয় দেখবেন!

ঈষৎ হাসিয়া স্বামীজী একটি সংস্কৃত প্রবচন আবৃত্তি করিলেন—

এক ভূরুভয়োরেকদলয়োরেককাণ্ডয়োঃ।
শালিশ্যামাকয়োভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে॥

লালা কহিলেনঃ শ্লোকটির অর্থ ত ঠিক বুঝতে পারলুম না দাদাজী?

স্বামীজী বলিলেনঃ অর্থ হচ্ছে—একই ক্ষেত্রে শালি এবং শ্যামা ধান জন্মে, উভয়েব দল কাণ্ড প্রভৃতি একই রকম; কিন্তু ফলের দ্বারায় উভয়ের প্রভেদ জানা যায়।

মুখখানা গম্ভীর করিয়া লালা বলিলেনঃ আপনার শ্লোকটি সত্যই ভাববার মতন; এটা আমার কাজে লাগবে। তাহলে এখন চললুম দাদাজী।

লালাজীর প্রস্থানের পরক্ষণেই তন্নু বেশ পরিবর্তন করিয়া স্বামীজীর কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিল। পরনে একখানি ছাপানো বৃন্দাবনী সাড়ী, মাথার চুলগুলি বেণীবন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া পীঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, অঙ্গে ফুলের আভরণগুলির কোন চিহ্ন এখন নাই, সে স্থলে হাতে দুই গাছি করিয়া সুশ্রী শাঁখা এবং গলায় একছড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক শঙ্খের বিচিত্র মালা, ললাটে কাঁচ-পোকার একটি সুচিক্কন টিপ। এই সামান্য

বেশ-ভূষাতেই তাহার রূপশ্রী উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া ঘরখানিকে যেন আলো করিয়া দিয়াছে।

নির্দ্দেশমত তনু স্বামীজীকে 'সাধুজী' বলিয়া ডাকিতে অভ্যস্থ হইয়াছে। তনুর ন্যায় আশ্রমের অন্যান্য বালিকারাও তাঁহাকে 'সাধুজী' সম্বোধনেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকে। সপ্তাহে দুইদিন করিয়া স্বামীজী আটচালার আসরে উপস্থিত হইয়া আশ্রম-বালিকা-দিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার আবাস-ভবনে একমাত্র তনুই নিত্য নিয়মিতরূপে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করে, উপদেশ ও গল্প শুনিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিবার সুযোগ পাইয়াছে। স্বামীজী বাছিয়া বাছিয়া বিশ্ব ইতিহাস এবং উপন্যাসের তেজস্বিনী নারীচরিত্রমূলক আখ্যানগুলি শুনাইয়া বালিকার কোমল অন্তরটির উপর একটি বলিষ্ঠ অনুভূতির সঞ্চার করিতে বদ্ধপরিকর। গল্প শুনিতে তনুর আগ্রহ এবং উৎসাহ এরূপ প্রচুর যে বড় বড় আখ্যায়িকা একদিনেই সে নিঃশেষ করিতে উৎসুক, কিন্তু স্বামীজী তাহার আগ্রহকে অধিকতর উদগ্র করিবার অভিপ্রায়ে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক স্থানেই বিরাম দিয়া পরদিনের জন্য ঝুলাইয়া রাখেন। অপরাহ্নে খেলাধূলার পরই তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সে স্বামীজীর বৈঠক ঘরে গল্প শুনিবার আগ্রহে প্রবেশ করে এবং গল্পটি সম্পূর্ণ হইবার পর স্বামীজীর সহিত তাহাকে সান্ধ্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। এইরূপ বাঁধা-ধরা নিয়মের চাপে পড়িয়া তাহার পূর্ব্বস্মৃতি সমাহিত হইয়া পড়ে এবং পুনরায় যাহাতে অতর্কিতে সমুথ হইয়া ছাত্রীটিকে চঞ্চল বা চিন্তান্বিত করিয়া না তোলে, সেদিকে স্বামীজীকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

লালাজীকে বিদায় দিয়াই স্বামীজী তাঁহার গল্পের খেইটি ধরিবার

উপক্রম করিয়াছেন এমন সময় তনু তড়িৎগতিতে আসিয়া একেবারে তাঁহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল : কাল যে আপনি বল্‌ছিলেন সাধুজী, আমার বাবার ওনাম হবে কেন,—আজ কিন্তু আমি ভেবে ভেবে জেনেছি—আমার বাবারও নাম ছিল হর······

বালিকার কথার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর চক্ষুর তারা দুটিও এরূপ প্রদীপ্ত হইতেছিল যে তাহাদের আভায় তনুর কোমল মুখখানি বুঝি ঝলসিয়া গেল। কণ্ঠস্বর সহসা স্তব্ধ হইতেই অগ্নিবর্ষী দৃষ্টির সহিত স্বামীজী তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন : মিছে কথা, অমন কথা মনে ভাবাও মহাপাপ, তনু ! তোমার বাবার ওনাম নিশ্চয়ই ছিল না।

দৃষ্টির প্রখরতা এবং কণ্ঠের তীক্ষ্ণস্বরের প্রভাবে বালিকা অভিভূত হইয়া পড়িলেও মুখখানি তুলিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল : ছিল না ?

তাহার জিজ্ঞাসু চক্ষু দুটির উপর নিজের জ্বলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্বামীজী তীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন : না—ছিল না।

বালিকার কণ্ঠ তথাপি স্তব্ধ হইল না, প্রশ্ন উঠিল : কিচ্ছু ছিল না ? আমার বাবা, আমার মা, আমার দিদি, আমাদের বাড়ী·····

তর্জ্জনের মত স্বরে স্বামীজী বলিলেন : না—না—না, আমি বল্‌ছি না, কিচ্ছু তোমার নেই। আমি বল্‌ছি—নেই—নেই—নেই।

বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীজীর পানে চাহিয়া বালিকা স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিল : নেই—নেই—নেই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুই চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ তাহার চিবুকটি তুলিয়া ধরিয়া আহ্বানের সুরে ডাকিলেন : তনু—তনু······

ধড়মড় করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া তনু এবার মুদিত দুই চক্ষু

বিস্ফারিত করিয়া চাহিল, তাহার পর অপ্রতিভের মত হইয়া কহিল : অ-মা, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম নাকি ?

স্বামীজী বলিলেন : বেশ যাহোক, গল্প শুনবে বলে এসে বস্‌লে, তারপর অমনি মেয়ের ঘুম ! শিকারের খেলায় ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ—নয় ? গল্প শোনা তাহলে আজ থাক, কি বল ?

বালিকার উৎসাহ পুনরায় জাগ্রত হইয়া উঠিল, কণ্ঠের স্বরে জোর দিয়া কহিল : বা-রে ! গল্প শুনব বলে ছুটে এলুম, আর আপনি বলছেন আজ থাক। না, তা হবে না, আজ ও-গল্প শেষ করতেই হবে।

স্বামীজীকে তখন মৃদু হাসিয়া তাঁহার গল্পের শেষাংশ আরম্ভ করিতে হইল : সেইত, সাহেব আর ব্রজেশ্বরের বাবাকে বোকা বানিয়ে দেবী রাণী তাঁর বজরায় তুলে দিলেন তাকে ছেড়ে, ঠিক সেই সময় আচমকা একটা ঝড় উঠে সব ওলট-পালট করে দিল। সাহেবের বরকন্দজরা নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল, আর দেবীর বজরা তখন ছুটল তীরের মত বেগে। বুদ্ধি খেলিয়ে আগে থাকতেই যে ফাঁদটি দেবীরাণী পেতে রেখেছিলেন, তাতেই সাহেব-বাঘটি ধরা পড়ল, আর তার সাথী ব্রজেশ্বরের বাবাও রেহাই পেল না। এখন এদের সঙ্গে দেবী-চৌধুরাণীর একটা বোঝাপড়া করবার সময় এল···

স্বামীজীর গল্প যখন এইভাবে জমিয়া উঠিয়া তনুর মনে একটা পুলকের শিহরণ তুলিতেছিল, সেই সময় আশ্রমের পূর্ব্বোক্ত অঞ্চলে বিস্তীর্ণ আটচালার মধ্যে অন্যান্য বালিকাগুলিকে লইয়া লালাজীর বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষাদানের বিচিত্র কসরৎ চলিতেছিল।

এ সম্বন্ধে লালাজীর উদ্দেশ্যের আভাস পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহার ছাত্রীগুলিকে সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গলা ভাষায়

পাকাপোক্ত করিয়া লইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিখাইবেন। তনুর যেমন বাঙ্গলা ভাষায় স্বাভাবিক জ্ঞান প্রচুর, এই মেয়েগুলির অধিকাংশই তেমনি হিন্দী ও উর্দ্দু বলিতে অভ্যস্ত। কিন্তু লালাজীর ধারণা, ভালো করিয়া বাঙ্গলা ভাষাটা শিখিতে পারিলে, যে কোন ভাষা শিখিবার আগড় খুলিয়া যাইবে। যে কোন কারণেই হউক, এই ভাষাটির প্রতি আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা বশতঃ তিনি দলের সব কয়টি বালিকাকেই এমনভাবে বাঙ্গলা ভাষা শিখাইয়া পড়াইয়া পণ্ডিত করিয়া তুলিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন যে—প্রথম আলাপেই যে-কোন প্রদেশবাসীর দৃষ্টিতে ইহারা যেন বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়াই ধরা পড়িয়া যায়। তাই প্রত্যহই এই সময় এখানে বাঙ্গলা ভাষার প্রাথমিক শিক্ষার মহলা বসে এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় ভাষা রূপে ইংরাজীকে আমল দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এই আসরে এই দুইটি ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষাকেই স্থান দেওয়া হয় না—বালিকাদের মাতৃভাষা হইলেও নয়।

আশ্রম-বালিকাগণ আটচালার অভ্যন্তরে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়াইয়া লালাজীর প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। লালাজীর মুখে ইংরাজী শব্দটি শুনিয়াই সমস্বরে বালিকারা তাহার বাঙ্গলা প্রতিশব্দ বলিবে—ইহাই এই আসরের সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা।

প্রথমেই লালাজী প্রশ্ন করিলেন: Daughter বলতে কি বোঝ তোমরা?

বালিকারা সমস্বরে উত্তর করিল: কন্যা।

প্রশ্ন: আর Girl মানে?

উত্তর: মেয়ে।

প্রশ্ন: Daughters এবং Girls বল্‌লে কি বুঝবে ?

উত্তর: মেয়েরা।

প্রশ্ন: Daughters এবং Girls কি রকম দেখতে ?

উত্তর: যেমন আমরা।

প্রশ্ন: Body বল্‌তে কি বোঝ ?

উত্তর: শরীর।

প্রশ্ন: আর Appearance ?

উত্তর: চেহারা।

প্রশ্ন: Head কি ?

উত্তর: মাথা।

প্রশ্ন: Brain ?

উত্তর: মস্তিষ্ক।

প্রশ্ন: Tears কাকে বলে ?

উত্তর: চোখের জল।

প্রশ্ন: আর Heart ?

উত্তর: হৃদয়।

এবার প্রশ্নের মোড় ফিরাইয়া লালাজী বলিলেন: হাত তোল সকলে একসঙ্গে।

বালিকারা প্রায় সকলেই একসঙ্গে উভয় হাত শূন্যে উঁচু করিয়া তুলিল। লালাজী উত্থিত হাতগুলি দেখিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন: এবার হাতাহাতি করত দেখি।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বৃহৎ পংক্তিটি সমান্তর দুইটি লাইনে পরিণত হইল এবং মুখোমুখি হইয়া বালিকারা পরস্পর হাতে

হাত লাগাইয়া বল-পরীক্ষা সুরু করিয়া দিল। মিনিট সাতেক ধরিয়া ঠেলাঠেলি ও হুড়াহুড়ি চলিবার পর লালাজী হাত তুলিয়া হুকুম দিলেন: থামো সকলে, যেমন ছিলে, তেমনি দাঁড়াও।

এক মিনিটের মধ্যেই পুনরায় বালিকারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ওস্তাদজীর পরবর্ত্তী নির্দ্দেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এবার ওস্তাদজী আদেশ করিলেন: গান ধর—কিসের তরে অশ্রু ঝরে……

বালিকারা সমস্বরে গান ধরিল:

"কিসের তরে অশ্রু ঝরে,
কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস।
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্ব্বহারা
সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্ব্বময়ী ভাগ্য দেবীর
নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে
করবো মোরা পরিহাস।"

স্বামীজীর প্রয়োজনের অনুরোধ তাঁহার পাঠাগারে বিশ্বপণ্ডিত-গণের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের সংগ্রহ-ব্যাপারে এই লালাটি যে পরিমাণে আগ্রহশীল ছিলেন, সংগৃহীত গ্রন্থগুলির ভিতরে প্রবেশ করিবার মত ধৈর্য্য বা অবসরের ততখানি অভাব দেখা যাইত। যদিও এককালে পড়াশুনা তাঁহার মন্দ ছিল না এবং অনেকগুলি ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইদানীং কয়টি বৎসর ধরিয়া এই বিস্তীর্ণ আশ্রমটির প্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থ সংগ্রহ এবং আনুষঙ্গিক পরিকল্পনায়

তাঁহাকে এরূপ লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে যে, পাঠাগারে বসিয়া গ্রন্থের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার স্পৃহা কদাচ দেখা যাইত না। তবে, ইহাও সত্য যে, আশ্রমে উপস্থিতির সময় সহস্র কার্য্যের মধ্যে অন্ততঃ একটি ঘণ্টা সময় করিয়া তিনি স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার সহায়তায় বিশ্বপণ্ডিতদের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতেন এবং নব নব তথ্যগুলি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগাইতে অবহেলা করিতেন না। স্বামীজী একদা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'হতভাগ্যের গান'টি সুর করিয়া গাহিয়া তনুকে শুনাইতেছিলেন। লালাজী সেই সময় স্বামীজী সন্দর্শনে আসিয়া—বাহিরে দাঁড়াইয়া গানটি শুনিয়া মুগ্ধ হন। অতঃপর স্বরলিপিসহ স্বামীজীর নিকট হইতে তাহা নিখুঁতভাবে আদায় করিয়া লইয়া তাঁহার ছাত্রীদের প্রাত্যহিক গানে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনের বিখ্যাত সিদ্ধাশ্রমটির কার্য্যধারা এই-ভাবে বিচিত্র গতিতে চলিতে থাকে।

এই বিচিত্র উপন্যাসটির প্রথম পর্ব্বের উপর এইখানেই যবনিকা ফেলা গেল।

দ্বিতীয় পর্ব

\

দ্বিতীয় পর্ব্ব

(১)

পূর্ব্বোক্ত ঘটার পর অনেকগুলি বৎসর কালের পরিবর্ত্তনশীল আবর্ত্তে পড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এবং প্রায় যুগান্তে যে কাল সবুজের হিল্লোল তুলিয়া প্রগতির পথে অভিনবরূপে দেখা দিয়াছে, কর্ম্মী পুরুষ হরপ্রসাদ তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, সেই সঙ্গে তাঁহার সে-যুগের বলিষ্ঠ উদার মনটিও যেন আশ্চর্য্য রকমে বদলাইয়া গিয়া দুর্ব্বল ও কৃপণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রয়াগে আমরা এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মানুষটির প্রকৃতির যে প্রশংসিত পরিচয় পাইয়াছি, বর্ত্তমানে সেই প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই হইয়াছে!

প্রয়াগের বেদনাদায়ক দুর্ঘটনার বৎসরটির শেষভাগে হরপ্রসাদ সেই-যে সপরিবার তাঁহার সযত্নরচিত প্রাসাদতুল্য নব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া বোম্বাই যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার পর আর একটি-দিনের জন্যও তাঁহাকে কেহ সেই অভিশপ্ত ভূমির ছায়াও স্পর্শ করিতে দেখে নাই। পাছে এলাহাবাদের বৈষয়িক আকর্ষণ ছিন্ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর না হয় তজ্জন্য এলাহাবাদের আফিস কানপুরে স্থানান্তরিত করিয়াছেন এবং বাড়ী দুইখানি ডক্তর অধিকারীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বিক্রয় না করিয়া তাঁহাকেই বারো বৎসরের জন্য এই সর্ত্তে লীজ দিয়াছেন যে, বাড়ীর আয় হইতেই তাহাদের সরকারী ট্যাক্স সরবরাহ এবং সংস্কারাদি চলিবে, উপরন্তু হরপ্রসাদ বাবুর নিরুদ্দিষ্টা কন্যার অনুসন্ধান-সংক্রান্ত যাবতীয় খরচপত্রও নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে ডাঃ অধিকারী রেণুকে যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ

হন—নির্দ্ধারিত পুরস্কার ত পাইবেনই, উপরন্তু বসতবাড়ীখানাও বোঝার উপর শাকের আঁটির মত কায়েমীভাবে তাঁহার আয়ত্তাধীন হইবে। কিন্তু বারো বৎসরের মধ্যে যদি তিনি রেণুর সম্বন্ধে অকৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে লীজ ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে বার্ষিক পাঁচশত টাকা হিসাবে বারোবৎসরের দরুণ ছয় হাজার টাকার সহিত সুসজ্জিত বাড়ী দুইখানি নিখুঁত অবস্থায় বিনা ওজরে হরপ্রসাদ বাবু বা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

এলাহাবাদের পাট যখন এইভাবে দীর্ঘকালের মত চুকিয়া যায়, সেই সময় কলিকাতায় মোটা রকমের কোন পাওনা টাকার ব্যাপারে হরপ্রসাদকে সেখানে একটা নূতন পাট পাকা করিয়া ফেলিতে হয়। অর্থাৎ, পাওনা টাকার সম্পর্কে বালিগঞ্জ অঞ্চলের কয়েক বন্দ জমি তাঁহার হাতে আসিয়া যায়। জমিগুলির জর্জ্জর অবস্থা অন্যের দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করিতে না পারিলেও, অসাধারণ দূরদৃষ্টির প্রভাবে হরপ্রসাদ তন্মধ্যে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর রত্নঝাঁপির আভা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ণ একটি ঝিলকে উপলক্ষ করিয়া বালিগঞ্জের জনবিরল জঙ্গলাকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলটিকে তখন অভিনব পরিকল্পনায় সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত করিবার আয়োজন চলিতেছিল। হরপ্রসাদ স্থির ক[illegible]বন, অঞ্চলটি সুসমৃদ্ধ হইলে ক্রীত ভূখণ্ডের একটি প্লটে মনোরম [illegible]াস ভবন তুলিয়া বন্ধু শম্ভুনাথের নামে তাহার নামকরণ করিবে[illegible] এবং আর একটি প্লটের উপর কন্যার স্মৃতিরক্ষা কল্পে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার নাম দিবেন—রেণু-নিবাস।

কিন্তু মাস কয়েক পরে বাড়ী পত্তন করিতে গিয়া হরপ্রসাদ দেখেন যে, কয়মাসের মধ্যেই এই অঞ্চলের জমির দর অনেক

বাড়িয়া গিয়াছে এবং ক্রমশঃই বাড়িতেছে। হরপ্রসাদের ব্যবসায়ী মন লাভের লালসায় দুলিয়া উঠায় সে সময় আর বাড়ীর পত্তন হয় নাই, বরং বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার জন্য যে টাকা কলিকাতার ব্যাঙ্কে আমানত রাখিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া আরও কতিপয় নূতন প্লট খরিদ করিয়া বোম্বায়ে ফিরিয়া যান। ফলে, কলিকাতায় পাশা পাশি দুইটি স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের কল্পনার উপর মুলতুবির আবরণ পড়ে। ইহার পর নানাদিক দিয়া কর্ম্মের চাপ এরূপ ব্যাপক হইয়া উঠে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা এমনই তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে, দুই জামাতার পক্ষে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। তখন বাধ্য হইয়া হরপ্রসাদকে সমগ্র দৃষ্টি, শক্তি ও কূটবুদ্ধি তাঁহার বিরাট প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশেই পুনরায় একাগ্র দৃঢ়তায় নিয়োগ করিতে হয়। প্রায় একাদশবর্ষব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সাধনার পর প্রতিষ্ঠানটিকে সকল দিক দিয়া নিষ্কণ্টক করিয়া এবং কর্ম্মভার জামাতাদের উপর চাপাইয়া যে-সময় হরপ্রসাদ অবশিষ্ট জীবনটুকু নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্তভাবে কাটাইবার জন্য সময়োচিত কোন নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থানের সন্ধান করিতেছিলেন, তখন বালিগঞ্জে ক্রীত দীর্ঘকালের পতিত ভূখণ্ডগুলি তাঁহাকে যেন হাত ছানি দিয়া আহ্বান করে। তখনই মনের উপর সঙ্কল্পের রেখাটি গভীর হইয়া উঠে--ঐখানেই একখানি নীড় বাঁধিয়া শেষ জীবনটুকু সস্ত্রীক অতিবাহিত করিবেন। নিকটে কলুষনাশিনী ভাগিরথী, দুর্গতিহারিণী জগদম্বার আস্তানা কালীঘাট। অবসর জীবন-যাপনের পক্ষে এমন উপযুক্ত স্থান আর কোথায়!

অর্থসম্পর্কে হরপ্রসাদ চিরদিনই এমনই ভাগ্যবান যে, তাঁহার এই

অবসর যাপনের ব্যাপারেও দেখা গেল—চঞ্চলা কমলা অচঞ্চল করে তাঁহাকে বরাবর যে কাঞ্চন-প্রসাদ বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অতীতের জীর্ণ ঝিলটিকে মনোরম এক কৃত্রিম 'লেকে' পরিণত করিয়া নবনগরীর অপরূপ রূপসজ্জা এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রাধান্যলাভ করায় প্রায় দ্বাদশবর্ষপূর্ব্বে তাঁহার ক্রীত জমিগুলির মূল্য বিশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ-অবস্থায় বুদ্ধিমান হরপ্রসাদ কমলার দেওয়া এমন সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহারই করিলেন। পাশাপাশি দুইটি প্লটের একটি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া অপর প্লটটির উপর ব্যবসাদারের উপযুক্ত পরিকল্পনায় এমন একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইলেন যে, নিজেরা থাকিয়াও বাড়ীর বিভিন্ন অংশগুলি ভাড়া দিয়া রীতিমত আয়ের সংস্থান হয়। নবনির্ম্মিত বাড়ীখানির মধ্যাংশে আলিসার নীচে কোন বিশিষ্ট স্থানে কনক্রিটের তৈয়ারী বড়বড় হরফে রচিত হইল—রেণু-নিবাস।

বাড়ীখানি যখন তৈয়ারী হইতেছিল, সেই সময় পত্নী অনুপমা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—রেণুর নামে যে হাসপাতাল করবে বলেছিলে তার কি হল?

হরপ্রসাদ বাবু তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—হবে। আরও যে সব জমি কেনা আছে, তাই থেকেই সেটা হবে। লেকটার এক্সটেনশ্যান শেষ হলেই সে কাজে হাত দেব, দরও পাব বেশী। জমি থেকেই বাড়ী হয়ে যাবে।

ইমপ্রুভমেণ্টট্রাষ্ট্ এই সময় লেকটিকে কাটাইয়া তাহার আয়তন আরও অনেকটা বাড়াইবার আয়োজন করিতেছিলেন। বিচক্ষণ হরপ্রসাদ তাহার নক্সা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার তিনি অপেক্ষা-

ক্রীত উচ্চ মূল্যে যে সব জমি কিনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, লেকের আয়তন বাড়িলে তাহাদের দামও সঙ্গে সঙ্গে বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং সেই সুযোগটুকু গ্রহণ করিয়া তিনি সেই সময় মাছের তেলেই মাছ ভাজিবার চেষ্টা করিবেন।

আগেই বলা হইয়াছে, ব্যবসাদারী বুদ্ধির সাহায্যেই হরপ্রসাদ তাঁহার পরিকল্পিত 'রেণু-নিবাস' নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই ব্যবস্থায় মধ্যবর্ত্তী অংশটুকু নিজ ব্যবহারে রাখিয়াও দুই পার্শ্বের ব্লক দুইটি অনায়াসেই ভাড়া দেওয়া যায়। তিনটি ব্লকই এমনভাবে প্রস্তুত যে প্রত্যেক ব্লকের নিচের তলায় উঠানটির দুইদিকের দুইটি দ্বার খোলা থাকিলে সমস্ত বাড়ীখানিই এক হইয়া যায় আবার ঐ দুই দরজা বন্ধ করিয়া দিলে—বাড়ীর তিনটি অংশই স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে।

প্রয়াগে কুম্ভমেলার সময় হরপ্রসাদের যে মনোবৃত্তি প্রশংসিত ও উল্লেখযোগ্য ছিল, যুগান্তে সেই মানুষটির মন যে নিরতিশয় কৃপণ হইয়া পড়িয়াছে বালিগঞ্জের বাড়ীর সম্পর্কেই তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

বাড়ীখানির বৈশিষ্ট্য, উপযোগিতা ও চাহিদার প্রাচুর্য্য বুঝিয়া হরপ্রসাদ যেরূপ প্রচুর ভাড়া ও ধনাঢ্য ভাড়াটিয়া চাহিলেন, তাহা দুর্লভ বলিলেই চলে। এক একটি ব্লকের জন্য দুই মাসের ভাড়া ডিপজিট এবং মাসিক দেড় শত টাকা ভাড়ার হার সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া তিনি বহু সম্ভ্রান্ত প্রার্থীকেই নিরাশ করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি কমলার এমনই আশ্চর্য্য কৃপা যে, গৃহস্বামীর এই অসঙ্গত ও অতিরিক্ত দাবী স্বীকার করিয়া প্রায় একই সময়ে দুইটি বিশিষ্ট পরিবার দুই পার্শ্বের দুইটি ব্লকে তাঁহাদের সংসার পাতিয়া স্থায়ী হইলেন।

উভয় ভাড়াটিয়া প্রত্যেকই দুই মাসের ভাড়ার টাকা ডিপজিট রাখায় এবং প্রতি মাসের ভাড়ার দরুণ দেড়শত টাকা মাসান্তে দাখিল করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় গৃহস্বামী হরপ্রসাদ যেমন নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, উভয় ভাড়াটিয়ার ভদ্র ব্যবহারও তেমনই তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছে। এই সূত্রে তিনটি পরিবারের মধ্যে সময়োচিত একটি সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে।

রেণু-নিবাসের দক্ষিণাংশের ব্লকটির ভাড়াটিয়ার নাম রায় বাহাদুর কাশীনাথ বড়ুয়া। আসাম অঞ্চলে ইঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারী আছে। ছেলেদের পড়াশুনাকে উপলক্ষ করিয়া ইনি বহুদিন হইতেই কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি এক পুত্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় চিকিৎসকগণের পরামর্শে বহুবাজারের জনবহুল অঞ্চল হইতে বাসা তুলিয়া বালিগঞ্জের জনবিরল স্বাস্থ্যকর অঞ্চলের নূতন বাড়ীতে সপরিবার বাসা পাতিয়াছেন। কর্ত্তা, গৃহিনী, একটি বিধবা ভগিনী এবং তিন পুত্র লইয়া ইঁহার সংসার। নরেন বিশ্বাস নামে অতিশয় প্রিয়দর্শন এক শিক্ষিত যুবা এই পরিবারটির অন্তর্ভূক্ত হইয়া এ বাড়ীতে আসিয়াছে। বাহিরের এই ছেলেটি ব্যতীত সরকার, পাচক, চাকর, চাপরাসী, দাসী দরোয়ান প্রভৃতি আরও অনেকগুলি প্রাণী রায়বাহাদুরের সংসারের সামীল হইয়া এক নম্বর ব্লকটিকে গুলজার করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে এই সুদর্শন ছেলেটিই বিশেষভাবে হরপ্রসাদ বাবুর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ছেলেটির আশ্চর্য্যরকম দীর্ঘ ঋজু দেহযষ্টি, বলিষ্ঠ বাঁধুনী, সুগৌরকান্তি এবং সহাস্য মুখখানার চমৎকার শ্রী-ছাঁদ তাঁহাকে যেন অবাক করিয়া দেয়। কলিকাতায় আসিয়া অবধি কত ছেলেই ত তাঁহার নজরে পড়িয়াছে, চাহিয়া চাহিয়া তিনি

বাঙ্গলার ছেলেদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য যাচাই করিবার দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন স্বাস্থ্য-পুষ্ট সুন্দর আকৃতির ছেলে এই প্রথম তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়াছে। রায় বাহাদুর ও তাঁহার পুত্রগণের সহিত এই ছেলেটির আকৃতিগত পার্থক্য তাঁহার মনে কেমন একটা কৌতূহলের সঞ্চার করিয়া দেয়। রায় বাহাদুর ও তাঁহার পরিজনবর্গ একটু বেলাতেই শয্যাতাগ করিতেন। কিন্তু হরপ্রসাদ তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, রাত্রি চারিটা বাজিলেই ব্লকটির একতালার একখানি ঘরে বিজলীর আলো জ্বলে, আর সেই আলোকে এই সুন্দর-কান্তি ছেলেটির সঞ্চরণশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায়। এমন সময় উঠিয়া ছেলেটি কি করে এবং বড়ুয়া-পরিবারের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ তাহা জানিবার কৌতূহল সন্দিগ্ধচিত্ত হরপ্রসাদকে বিচলিত করিয়া তুলিতে ছিল। শেষ রাত্রিতে শয্যাতাগ করিতে তিনিও অভ্যস্ত ছিলেন, সুতরাং একদিন অসময়ে অতর্কিতভাবে তিনি রায় বাহাদুরের ব্লকের ফটকের সামনে আসিয়া আস্তে আস্তে এমন কৌশলে কড়া নাড়িলেন, তাহার ধ্বনি যাহাতে দ্বিতলে বা নিম্নের আলোকিত ঘরখানিতে না পৌঁছায়। ফটকের ভিতরে ক্ষুদ্র একটি প্রাঙ্গণ, তাহার মাঝখানে একখানি খাটিয়ায় দরোয়ান সাধু সিং ঘুমাইতেছিল, কড়ার শব্দেই তাহার ঘুম ছুটিয়া গেল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিদ্রাবিজড়িত চোখ দুটি রগড়াইয়া 'কোলাপসেবেল' দ্বারের দিকে চাহিতেই বাড়ীওয়ালার মূর্ত্তি তাহাকে চমৎকৃত করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি তালা খুলিয়া দুইহাতে লোহার ফটকের দুই অংশ দুইদিকে ঠেলিয়া দিয়া প্রথমে সে সসম্ভ্রমে এই সম্মানজনক মানুষটিকে মিলিটারী কায়দায় সেলাম করিল, তাহার পর বিস্ময়ের সুরে কহিল : হুজুর ইতনে রাতমে? ফরমাইয়ে—

হরপ্রসাদ কহিলেন : ম্যায় রোজ ইস্ বখ্ত যহাঁ টহল্তা হুঁ, তোমারে বাবুজী তো দেরমে উঠতে হঁয়, মগর, ইধর বত্তি জলতি রহতি হ্যায় ; ক্যা, বচ্চে লোগ ইস্ বখ্ত পড়তা লিখতা হ্যায় ?

দরোয়ান সবিনয়ে উত্তর দিল : নহি, ওলোগ ভি ... মে উঠতে হ্যায় হুজুর, মগর মাষ্টার সাব রোজ আখিরি রাতকে বখত উঠ্তে হঁয়—

হরপ্রসাদ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন : ক্যা, ও পড়তে হঁয় ?

দরোয়ান একটু হাসিয়া উত্তর দিল : মাষ্টার সাব এক অজীব আদমী হঁয়, ইস্ বখত উঠ কর্ কসরৎ করতে হঁয়, উস্‌কে বাদ্ তসবীর খিঁচতে হয়—

মুখখানি প্রসন্ন করিয়া অস্ফুটস্বরে হরপ্রসাদ কহিলেন : ছোকরা তাহলে দেখতেই শুধু রাঙ্গা মূলো নয়, গুণও আছে! পরক্ষণে দরোয়ানকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন : আচ্ছা, দরোয়ানজী, তুম্ দরওয়াজা বন্ধ করকে শো যাও, তব্ তক্ মঁয় মাষ্টার সাহাবসে বাতচীৎ করুঁ—

কথাগুলি বলিতে বলিতেই তিনি টানা সোপানশ্রেণীর উপর দিয়া আলোকিত ঘরখানির দিকে অগ্রসর হইলেন।

সাজানো বড় হলঘরখানির উভয় পাশে দুইখানি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ঘর। একখানি ঘরে সরকার ও ভৃত্যেরা থাকে। অপরখানি তরুণ গৃহশিক্ষক একাই অধিকার করিয়া তাহার পড়াশুনার ও শিল্পচর্চ্চার তোড়-জোড় পাতিয়াছে।

ঘরখানি ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। দরজার দুই পাশের দুইটি বাতায়ন আলো-চলাচলের জন্য বোধ হয় বন্ধ করা হয় নাই। একটি

বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতরে কৌতুহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া হরপ্রসাদ দেখিলেন, সুগৌর ও সুপুষ্ট দুইটি আঙুলে সুদৃশ্য একটি তুলি ধরিয়া এই ঘরের সেই প্রিয়দর্শন ছেলেটি তন্ময়ভাবে সমাপ্তপ্রায় সুদীর্ঘ একখানি ছবির প্রসাধন করিতেছে।

বাতায়ন-পথে গরাদের উপর ঝুঁকিয়া হরপ্রসাদ বাবু ডাকিলেন : মাষ্টার, ওহে মাষ্টার—

স্বর শুনিয়াই ছেলেটি সচকিতে পিছনে চাহিল, গবাক্ষের ওপারে রেণু-নিবাসের অধিস্বামীকে এমন অসময়ে এভাবে দেখিয়া তাহার কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিতেই সে দেখিল, প্রবীণ আগন্তুক ইতিমধ্যেই দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার মুখের হাসি সুপুষ্ট গোঁফজোড়াটির ভিতর দিয়া সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

চোখাচোখি হইবামাত্র ছেলেটি সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া সবিনয়ে কহিল : আপনি এত ভোরে সার? কিন্তু রায় বাহাদুর ত এখনো ওঠেননি, বিশেষ দরকার যদি থাকে···

হরপ্রসাদ বাবু কথাটায় বাধা দিয়া কহিলেন : না, না, বিশেষ দরকার কিছু নেই, রায় বাহাদুর যে বেলায় ওঠেন তা আমি জানি। আমি এসেছি তোমার সঙ্গেই আলাপ করতে—বুঝেছ?

ধনী গৃহস্বামীর অযাচিত উপস্থিতি এবং তাহার ন্যায় পরাশ্রিত দরিদ্রের সহিত আলাপ করিবার অভিব্যক্তি ছেলেটিকে যে কৃতার্থ করিয়াছে, তাহার মুখের ভাবে এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। মনে হইল, সে যেন শুধু শিষ্টাচারের অনুরোধেই যুক্ত হাত দুইখানি প্রসারিত করিয়া আগন্তুককে তাহার কক্ষে আহ্বান করিল এবং

তাড়াতাড়ি বেতের একখানি চেয়ার দরজার কাছে টানিয়া আনিয়া মৃদুস্বরে কহিল : বসুন, সার।

হরপ্রসাদ বাবু আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন : তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে, ব'স। নইলে আলাপ জমবে কেন?

ছেলেটি সবিনয়ে উত্তর দিল : দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে সার, যে কাজ ধরেছি, তাতে এমন কত ঘণ্টাই আমাকে একটানা দাঁড়িয়ে তুলি চালাতে হয়।

একটু হাসিয়া হরপ্রসাদ বাবু কহিলেন : বটে! তবে আমি শুনেছিলুম, ছেলে পড়ানোই তোমার পেশা, রায় বাহাদুরের ছেলেদের তুমি হোল টাইম-টিউটর। কিন্তু তুমি যে একজন আর্টিষ্ট, ছবি আঁকো, সেটা আমার জানা ছিল না।

ছেলেটি কহিল : এটা আমার নিজের বিজনেস। সারাদিন ত আর সময় পাই না, ছেলেদের পড়াতে হয়, নিজেকেও একটু পড়াশুনা করতে হয়, ভোরের দিকে এই সময়টাই নিশ্চিন্ত হয়ে ছবির চর্চ্চা করে থাকি।

দীর্ঘ অয়েল পেণ্টিংটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হরপ্রসাদ বাবু কহিলেন : এই ছবিখানা তাহলে তোমার ঐ চর্চ্চার ফল বল? খাসা হয়েছে ত? ওর ওপর চোখ পড়লেই মনে হয় যেন রায় বাহাদুর বড়ুয়া বসে রয়েছেন। তোমারই হাতের আঁকা ত?

মৃদু হাসিয়া ছেলেটি উত্তর দিল : অনেকদিনের চেষ্টার ফল সার, এখনো শেষ হয়নি, 'ফিনিসিং টাচ' চলেছে।

হরপ্রসাদ বাবু কহিলেন : সে ত দেখতেই পাচ্ছি হে, ওরই ওপর তুলি চালাচ্ছিলে। আমি এসে তোমার কাজে হয়ত বাধা দিলুম। কিন্তু আমার স্বভাব কি জান, ভালোই হোক আর মন্দই হোক—কোন

দিক দিয়ে কারুর সম্বন্ধে কৌতূহল কিছু হলে যেচে তার সঙ্গে আলাপ করতেই হবে। আমারও অভ্যাস শেষ রাত্তিরে ওঠা। এ-পাড়ায় আমার মত 'আর্লি রাইজার' আর কেউ যে আছে তা জানতুম না। তোমার ঘরে আলো দেখেই মনে কৌতূহল জাগে, অবশ্য তোমাকে প্রথম দেখেই মনটি দুলে উঠেছিল, দোলবার হেতুটা হচ্ছে—মুখখানা যেন চেনা—কোথায় যেন কোনদিন দেখিছি, কিন্তু ঠিক ধরতে পারিনি। আচ্ছা—তোমার নামটি কি বলত ?

ছেলেটি জানাইল : নরেন বিশ্বাস।

মুখখানা গম্ভীর করিয়া হরপ্রসাদ কহিলেন : পদবীটা কিন্তু ভারি 'ট্রেচারাস্'। সব জাতের ভেতরেই 'বিশ্বাস' আছে। কাজেই পদবী ধরে সহজেই বিশ্বাসঘাতকতা করা চলে। তোমার পদবীটা কোন পর্য্যায়ে পড়ে ?

মৃদু হাসিয়া নরেন উত্তর দিল : কায়েতের পর্য্যায়ে সার! আমরা কায়স্থ।

—বটে, তাহলে আমাদের স্বজাতি তুমি! ভাল, ভাল ; আচ্ছা! তোমরা কোন্ জেলার লোক হে ? বাড়ী কোথায় ?

এই প্রশ্নটি উঠিতেই নরেনের মুখখানি গম্ভীর হইল। কুলজীর প্রসঙ্গ বরাবরই তাহাকে পীড়া দিয়া থাকে, এ সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন করিলেই তাহার সুন্দর মুখখানা অমনই বিরক্তিতে বিবর্ণ হইয়া উঠে। সে তখনি কথাটা চাপা দিতে বা আলাপের গতি অন্য দিকে ফিরাইতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। বৃদ্ধের মুখটিও বন্ধ করিবার জন্য এক নিশ্বাসে সে বলিয়া দিল—ঘর-বাড়ী আমাদের বিহারে ছিল সার, কিন্তু 'নাইটিন থার্টিফোরে'র ভূমিকম্পে সে-সব পাট চুকে গেছে। আমি সে-সময়

ক'লকাতার মেসে ছিলুম। তাই বিশ্বাস-বংশটা একবারে লোপ পায়নি। বন পুড়ে গেলে এক একটা লম্বা গাছ যেমন মাথা তুলে একলা দাঁড়িয়ে থাকে, আমার অবস্থাও হয়েছে, ঠিক তাই। আপনার বলতে কেউ নেই; যাঁরা ছিলেন, পাঁচ মিনিটের ভেতরেই নিঃশেষ হয়ে গেছেন। আমি এখন একলা, যেখানে থাকি সেই আমার বাড়ী, এর বেশী আর কোন পরিচয় আমার নেই স্যার!

মর্ম্মন্তুদ কথাগুলি হরপ্রসাদের মনে বেদনার সঞ্চার করিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে বিহারে যে প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, তাহার শোচনীয় কাহিনী তিনি সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলেন। সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় যে-সকল পরিবার একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত তাঁহার জানাশুনাও ছিল। তাঁহারই স্বজাতীয় এই প্রিয়দর্শন সুশিক্ষিত তরুণটির পিতা-মাতা পরিজনবর্গ একদিনেই একসঙ্গে সেই সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় শোচনীয় মৃত্যুবরণ করিয়াছে, দুর্ভাগ্য ছেলেটির পরিচয় দেবার মত আর কিছু নাই, এই দুশ্চিন্তা তাঁহাকে আর্ত্ত ও অভিভূত করিয়া তুলিল। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন: জানতুম না যে তোমার পরিচয়ের পাতায় এত বড় একটা দুর্ঘটনার ইতিহাস রক্তের হরফে লেখা আছে। একটা নূতন দিনের প্রভাতেই দুর্দ্দিনের সেই স্মৃতিটা জাগিয়ে তুলে হয়ত অন্যায় করেছি; আমিও যে ভুক্তভোগী!

নরেনের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সে কহিল—ঐ ভূমিকম্পে তাহলে আপনারও কোন দুর্ঘটনা—

হরপ্রসাদ কহিলেন—না, না, বিহারের ভূমিকম্পে নয়, কোন দুর্ঘটনাতেও নয়। সাধারণ সহজ অবস্থার মধ্যেই আমার ছোট মেয়েটিকে আমি হারিয়েছি। সেই মেয়ের নামেই আমার এই বাড়ী। কিন্তু যেদিন সকালে হারানো মেয়েটির কথা আমার মনে ওঠে, সেই দিনটিই আমার কষ্টে কাটে, কিছুতেই শান্তি স্বচ্ছন্দ পাই না। যাক্—তুমি তোমার কাজ কর, আমি উঠি। তোমাকে দেখে যেমন খুশী হয়েছিলুম, কিন্তু দুর্ভাগ্যের পরিচয় পেয়ে তেমনি একটা বেদনা নিয়ে চললুম।

নরেনের সহিত হরপ্রসাদ বাবুর পরিচয়সূত্রে ইহাই প্রথম আলাপ। ফলে পরিজনহীন এই ছেলেটির প্রতি তাঁহার চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হয়। ইহার পর রায় বাহাদুর বড়ুয়ার সহিত কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মুখেও ছেলেটির স্বভাব ও শিক্ষার সুখ্যাতি শুনিয়া তিনি তাহার পক্ষপাতী হইয় পড়িলেন।

(২)

রেণু-নিবাসের অপর ব্লকটিতে যে ভাড়াটিয়ারা বসবাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত হরপ্রসাদ বসু ও তাঁর পত্নী অনুপমার ঘনিষ্ঠতা গোড়ায় খুব গাঢ় হইলেও, পরে তাহাদের চালচলন স্বামি-স্ত্রীর মনঃপূত হয় নাই। নিখিল রায় নামে পূর্ব্ববঙ্গবাসী এক ভদ্রলোক এই ব্লকটি ভাড়া লইয়াছিলেন। স্ত্রী ইন্দিরা ও তরুণী কন্যা মালা—এই দুইটি প্রাণী লইয়া ইঁহার সংসার। মিষ্টার রায় সিঙ্গাপুরের কোন বিখ্যাত ইনসিওর কোম্পানীর সংস্রবে কাজ করিতেন, বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় তাঁহাকে কোম্পানীর কাজে বাহিরে বাহিরে থাকিতে হইত। বাড়ীখানা বন্দোবস্ত করিয়া তিনি হরপ্রসাদ বাবুকে বলিয়াছিলেন—আমাকে অনেক জায়গায় ঘুরা-ঘুরি করতে হয়। দেখতে আপনি খড়-একটা পাবেন না; তবে, আমি যেখানেই থাকি মাসের পয়লা তারিখে তিনশো টাকা আমার স্ত্রীর হাতে এসে পৌছবে। এদের মাথার ওপর আপনি রইলেন, একটু দেখাশোনা করবেন।

হরপ্রসাদ বাবু তাঁহার প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু নিখিল বাবুর প্রস্থানের পর তিনি তাঁহার স্ত্রী-কন্যার আচার-ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। মা ইন্দিরা চল্লিশের সীমারেখায় পদার্পণ করিয়াও সাজগোজের বাহার সমানভাবেই বজায় রাখিয়াছেন। এই বয়সে বাহারী পাড়ের রঙীন সাড়ী কায়দা করিয়া পরিবার এবং মুখে রঙ মাখিবার ঘটা দেখিলে মনে হয় তিনি বুঝি ষ্টেজে নামিবার জন্য সাজিয়া-গুজিয়া তৈরী হইয়াছেন! মায়ের সাজ-সজ্জায় এমন

বাড়াবাড়ি যেখানে, মেয়ে মালাও সবে উনিশে পা দিয়াছে, বয়সের অনুপাতে তাহার সাজসজ্জা ও অঙ্গরাগ আরও কত উৎকর্ষ হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রত্যহ বৈকালে মা ও মেয়ে যখন সাজিয়া-গুজিয়া বেড়াইতে বাহির হয়, মাঝের ব্লকের গবাক্ষ হইতে সে দৃশ্য দেখিয়া হরপ্রসাদের সেকেলে শিক্ষিতা সহধর্ম্মিণী অনুপমা মুখখানা বিকৃত করিয়া স্বামীকে শুনাইয়া বলেন—দূর দূর! মাগী যেন ন'টি, আর মেয়ে ঠিক বাঈজী! মা-মেয়ে যেন মজরো করতে চলেছে! ঝাঁটা মারো—ঝাঁটা মারো! কলসী-দড়ি জোটে না—

মালা বেথুন হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া ডায়সেসান কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহার এখন সেকেণ্ড ইয়ার চলিয়াছে। ইহাতেই সে দেমাকে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। ইহার উপর গানে তাহার নাম হইয়াছে, রেডিয়ো আসরে কয়েকখানি গান গাহিয়া সে লোকের সুখ্যাতি এবং সেই সঙ্গে কিছু অর্থ পাইয়াছে। কাগজে তাহার ছবি-ও ছাপা হইয়াছে; সঙ্গীতের আসরে তাহার চাহিদা ক্রমশঃই বাড়িতেছে।

বয়সের দিক দিয়া মালা যদিও বর্ত্তমানে উনিশে পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাকে দেখিলে মনে হয় বুঝি সে বাইশ পার হইয়া গিয়াছে। দেহের রঙটুকু তাহার যতখানি ফর্সা, তাহাতে লাবণ্যের অভাব ঠিক ততখানি। এই অভাবটুকু তাহাকে প্রসাধনের সাহায্যে পূরণ করিয়া লইতে হয়। দেহযষ্টি তাহার যে অনুপাতে ঢ্যাঙ্গা, দেহের বাঁধুনীও সেই পরিমাণে আলগা। তথাপি পরিপূর্ণ মুখখানির ছাঁদটুকু তাহার এমনই চমৎকার ও নিখুঁত যে, আকৃতিগত ত্রুটিগুলি অনায়াসে ঢাকিয়া

একাই সেটি একান্ত চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র, সুতরাং মালার স্থান সকলের আগে; রূপপিপাসুরা তাহার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে, রূপের অহঙ্কারে মালার অন্তর সর্ব্বদাই স্ফীত হইয়া থাকে।

মা ও মেয়ে দুইটি প্রাণীর জন্য দেড় শত টাকা ভাড়ায় এত বড় বাড়ীখানির প্রয়োজন হইয়াছে এবং পাচক চাকর ঝি বেয়ারা প্রভৃতি লইয়া আরও চারিটি প্রাণীকে ইহাদের পরিচর্য্যায় হিমসিম খাইতে হয়। কর্ম্মস্থল হইতে প্রতি মাসে নিখিল রায় তিন শত টাকা পাঠান, কিন্তু টাকা আসিয়া পহুঁছাইবা মাত্রই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। বাড়ীর ভাড়াটি আদায় করিতে হরপ্রসাদ বাবু অতিশয় সতর্ক থাকেন বলিয়া তাঁহার ভাড়া বড় একটা পড়ে না, কিন্তু অপর পাওনাদারদের কষ্টের অবধি থাকে না। চাকর-বাকররা কোন মাসেই পূরা বেতন পায় না, গয়লা, মুদী, কয়লাওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর ফিরিওয়ালারা পর্য্যন্ত ইহাদের পাওনাদার। প্রতিমাসে তাহাদের নিকট দেনার হার বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু মা ও মেয়ের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, বাজে খরচ কমাইয়া ঋণের বোঝা হাল্কা করিতে ইহাদের কেহই সচেতন নহেন।

হিসাবী হরপ্রসাদ বাবু মাঝে খিট খিট করেন, নিখিল বাবুর অনুরোধের মর্য্যাদা রাখিতে মা ও মেয়েকে হিসাব করিয়া চালতে এবং ব্যয় সংকোচ করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু মা ও মেয়ে তাঁহার উপদেশ শুনিয়া হাসেন।

মা বলেন—বরাবর যে হালে চলে এসেছি, তা খাঁটো করলে নিন্দে হবে। লোকে বলবে—কর্ত্তার আয় কমে গেছে। তাছাড়া

দেনা কার না হয়? খরচ যাদের বেশী, বাজারে তাদেরই টাকা পড়ে। তার জন্যে আর হয়েছে কি?

মেয়ে বলে—পিঁপড়ের পেট টিপে আমরা চলতে শিখিনি দাদামশাই! চারচারটে লোক আমাদের খিদমেত খাটে দেখে আপনি চমকে উঠেছেন, কিন্তু এটা এমন কিছু বেশী নয়। একটা ঝি না হ'লে মার চলে না, আমার কাছে হামেসা একটা ব্যায়রা মোতায়েন চাই, চিঠি নিয়ে তাকে ছুটোছুটি করতে হয়। রাঁধুনী না রেখে নিজেরাই হাত পুড়িয়ে রাঁধবো নাকি? তারপর—চাকরের কাজগুলো করবে কে? জল তোলা, বাসনমাজা, বাজারকরা—এ সব? মানুষের মত থাকতে হলে এসব চাই-ই। আপনি দুনিয়ায় এসেছেন পয়সা সঞ্চয় করতে, আমরা এসেছি পয়সা খরচ করে জীবনটাকে সার্থক করতে। দোহাই আপনার, নিজের খরচ যত ইচ্ছে কমান, কিন্তু আমাদের খরচ কমাবার জন্যে উপদেশটুকু দয়া করে আর দেবেন না।

ইহার পর হরপ্রসাদ আর কি বলিতে পারেন! তিনি ইহাদের সম্বন্ধে ইদানীং মুখ বন্ধই করিয়াছেন। কিন্তু কোন মাসে বাড়ী ভাড়ার টাকা দিতে একদিন বিলম্ব হইলে তাঁহাকে এমনই মুখর হইয়া উঠিতে দেখা যায় যে, মা ও মেয়ের পক্ষে এই জবরদস্ত পাওনদারটির পাওনাগণ্ডা কোনরূপেই চাপিয়া রাখা সম্ভবপর হয় না। এই সূত্রে মা মুখখানা মচকাইয়া বিকৃতস্বরে প্রায়ই বলেন—ওঁর যেমন আক্কেল, বাড়ী আর খুঁজে পাননি, 'কানের কাছে কানাইয়ের বাসা' যেখানে, সেখানে থাকতে আছে কখনো! মনি-অর্ডার এলেই ডাইনের মত তাকিয়ে থাকে, সন্ধান রাখে। একদিন আর তর্ সয়না! দেড়শো টাকা ওঁকে দিয়ে এত বড় সংসার চালাই কি করে?

হঠাৎ রায় বাহাদুর বালিগঞ্জের বাসা তুলিয়া সপরিবার দেশে ফিরিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। জমিদারী সম্পর্কে এমন একটা গণ্ডগোল সেখানে বাধিয়াছে, তাঁহার উপস্থিতি অপরিহার্য্য এবং দীর্ঘকাল তাঁহাকে দেশেই থাকিতে হইবে। কাজেই অস্থায়ী বাসা না তুলিয়া তাঁহার আর উপায় কি? নরেন যেন আকাশ হইতে পড়িল। কলিকাতার বিপুল ব্যয় এবং দেশের জমিদারীর বিশৃঙ্খলার জন্য প্রজাদের নিকট খাজনাপত্র অনাদায় যে রায় বাহাদুরের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে, নরেন তাহা জানিতে পারিয়াছিল। সেইজন্য রায় বাহাদুরের আকিঞ্চন সত্ত্বেও, তাঁহার বর্তমান অবস্থায় গলগ্রহ স্বরূপ হইয়া সে তাঁহার সহিত আসামে যাইতে সম্মত হইল না। রায় বাহাদুরও বিশেষ পীড়াপীড়ি না করিয়া তিনি নরেনের পাওনার উপর এক মাসের বেতন পুরস্কার স্বরূপ দিয়া বলিলেন— তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে নরেন, তবে আমার বিশ্বাস, তোমার মত ছেলের কাজের অভাব হবে না। ভগবান তোমাকে তোমার যোগ্য ক্ষেত্রই দেখিয়ে দেবেন।

রায় বাহাদুরের মত বিশিষ্ট ভাড়াটিয়ার সহিত সংস্রব ত্যাগ হওয়ায় হরপ্রসাদ বাবু যে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। এই সঙ্গে রায় বাহাদুরের আশ্রিত পরিজনহীন ছেলেটির জন্যও তাঁহার অন্তরটি যেন দুলিয়া উঠিল। রায় বাহাদুর আসামে চলিয়া গেলে ছেলেটির অবস্থা কি হইবে? সম্পন্ন ভাড়াটিয়া অপেক্ষা, বিপন্ন ছেলেটির চিন্তাই তাঁহাকে যেন অধিকতর চঞ্চল করিয়া তুলিল।

বাসা ছাড়িয়া রায় বাহাদুরদের আসাম যাত্রার পূর্ব্বদিন সায়াহ্নে হরপ্রসাদ ভৃত্যকে দিয়া নরেনকে তাঁহার নিজের ব্লকের বৈঠকখানায়

ডাকিয়া পাঠাইলেন। নরেন তখন তাহার ঘরের জিনিসপত্রগুলি গুছাইতেছিল। বাড়ীর মালিকের আহ্বান তাহাকে চমকিত করিল, হাতের কাজ ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ সে ভৃত্যের সহিত মাঝের ব্লকটির নীচের হলঘরে উপস্থিত হইল। হরপ্রসাদ তখন তক্তপোষের উপর পাতা ঢালা বিছানায় বসিয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নরেনকে দেখিয়াই তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন: এস মাষ্টার এস, বস এইখানে।

করযোড়ে অভিবাদন করিয়া কুণ্ঠিতভাবে নরেন এই শ্রদ্ধাভাজন মানুষটির শয্যাপ্রান্তে বসিল। তাহাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া এবং কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া হরপ্রসাদ কহিলেন: রায়-বাহাদুর ত কাল সকালেই সপরিবার তাঁর দেশে যাচ্ছেন। তুমি যে তাঁর সঙ্গে আসামে যাবে না, এ খবর অবশ্য আমি পেয়েছি। কাজেই তোমার ব্যবস্থা কি হয়েছে, সেটা জানতে ভারি আগ্রহ হয়েছে আমার, তাই তোমাকে ডেকেছি মাষ্টার। আশা করি, এতে তুমি বেজার হওনি।

নরেন সসঙ্কোচে কহিল: আমার মত সামান্য লোকের বাসায় গিয়ে একদিন আপনি যেচে আলাপ করেছিলেন। সেইদিনই জেনেছি আপনি কোন স্তরের মানুষ। কিন্তু আমি এমনি অমানুষ আর মুখচোরা যে সাহস করে একদিনও আপনার সামনে এসে দাঁড়াতে পারিনি। আজও আপনি দরদী হিতৈষীর মত আমাকে ডেকে—

নরেনের কথায় বাধা দিয়া হরপ্রসাদ কহিলেন: ওসব ভূমিকার কি দরকার! তোমার ব্যবহারে আমি কোন দোষ দেখিনি, আমি বরাবরই কৌতূহলী, এরই ঝোঁকে তোমার বাসায় ঢুকে আলাপ করতে গিয়েছিলুম। তুমি আসনি পাল্টা আলাপ করতে, কি হয়েছে তাতে?

আমি জানি তুমি কাজের লোক ; বাজে কাজে যোগ দেবার, ফুরসদ তোমার মোটেই নেই। যাক, এখন কি করবে ঠিক করেছ ?

নরেন কহিল : রায় বাহাদুর অবশ্য আমাকে তাঁর দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাতে রাজী হতে পারিনি। এই জায়গাটি আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল, আর যে ঘরখানি পেয়েছিলুম—চমৎকার। আমার ইচ্ছা, যদি এ পাড়ায় কম ভাড়ায় ছোটখাটো একখানি ঘর পাই তাহলে আর কোথাও যাব না।

হরপ্রসাদ গম্ভীর হইয়া কহিলেন : ঘরের অভাব কি, ভাত ছড়ালে আবার কাকের ভাবনা। আচ্ছা—মাষ্টার, তোমার এ চাকরী কত দিনের ?

নরেন : গত জুলাই মাসে একবছর পূর্ণ হয়ে গেছে।

হরপ্রসাদ : মাসে তিনি কি রকম দিতেন ?

নরেন : নগদ ত্রিশটি টাকা। খাইখরচও আমার লাগতো না।

হরপ্রসাদ : ছবি থেকে আয় কিছু হ'য় ? রায় বাহাদুরের ছবি ত আঁকছিলে দেখে এসেছি, তার জন্যে—

নরেন : ওঁর ছবির দাম আমি নিইনি, তবে মাল-মসলা উনি কিনে দিয়েছিলেন। বাইরের ছবি থেকেও আমার আয় কিছু হয়।

হরপ্রসাদ : বাঁধা ত্রিশটি টাকা ত গেল, এখন কি করবে ঠিক করেছ ? কোন চাকরী বাকরী—

নরেন : আজ্ঞে না, চাকরি আমি আর করব না।

হরপ্রসাদ : চলবে কিসে ? বাঁধা একটা আয় ত চাই।

নরেন : স্বাধীনভাবে ছবির কাজই করব। আমার ভরসা আছে, এতেই আমি দাঁড়াতে পারবো।

হরপ্রসাদ : পড়াশুনা তোমার কতদূর জানতে পারি ?

নরেন : পাঠ্যাবস্থা থেকে আমি সার ছবি আঁকার দিকেই ঝুঁকে পড়ি। তার ফলে, গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাস করেছি।

হরপ্রসাদ : আচ্ছা—মাষ্টার, যে রকম ঘরে তুমি আছ, ঠিক ঐ ঘর যদি তোমাকে আমি যোগাড় করে দিই, আর তোমার দু-বেলার খাইখরচ মায় চা-জলখাবারের ভারটুকুও যদি নেওয়া যায়,—তুমি তার জন্যে মাসে কত টাকা দিতে পার ? ভাল করে ভেবে বল—যেটা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে, অর্থাৎ সাধ্যে কুলাবে।

এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে নরেনের অন্তরটি বুঝি আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া উল্লাসের সুরে সে উত্তর দিল : আমি যদি কোন মহৎলোকের আশ্রয়ে তাঁর পরিজনের সামিল হয়ে থাকতে পাই সার, যেরকম ঘরে ছিলুম, ঠিক তেমনি একখানি ঘর তিনি আমাকে ছেড়ে দেন, তাহলে মাস মাস ত্রিশটি টাকা অনায়াসে দিতে পারি।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নরেনের মুখের দিকে চাহিয়া হরপ্রসাদ কহিলেন : ভেবে বলছ ? না হয় আজ থাক, বেশ করে বুঝে কাল সকালে আমাকে ব'ল।

নরেন ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল : না সার, আমার যা বলবার বলেছি। আমি জানি কোন ভদ্রলোকের সংসারে ভদ্রভাবে থাকতে হলে এর কমে থাকা চলে না। আমি কারুর বোঝা বা গলগ্রহ হয়ে থাকতে ইচ্ছা করি না—নিজে যখন উপার্জ্জনের ক্ষমতা রাখি।

হরপ্রসাদ কহিলেন : এই ত মরদের কথা ; কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব

যার থাকে, সে কখন নিজেকে অন্যের বোঝা করেনা, কারুর গলগ্রহ হয় না। তাহলে এই কথাই আমি স্থির বলে ধরে নিতে পারি—তুমি প্রতিমাসে ত্রিশটি করে টাকা আমাকে স্বচ্ছন্দে দিতে পারবে?

দৃঢ়স্বরে নরেন উত্তর দিল: হাঁ, সার! আপনি যদি বলেন, প্রথম মাসের ত্রিশ টাকা আমি আজই আগাম দিতে পারি।

নরেনের এই কথায় হরপ্রসাদের মুখখানি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন: ভাল কথা, তোমার অসুবিধা না হলে টাকাটা দিতে পারো। তাহলে কাল থেকেই তোমার থাকবার আর খাবার কোন ভাবনা রইল না। কাল ওঁরাও যেমন বেরুবেন, তুমিও অমনি তোমার লটবহর সব নিয়ে আমার বাড়ীতে এসে উঠবে।

বিস্মিত নরেনের কণ্ঠ হইতে মৃদুস্বর বাহির হইল: আপনার বাড়ীতে!

কণ্ঠের স্বরে জোর দিয়া হরপ্রসাদ কহিলেন: হ্যাঁ, আমার বাড়ীতে। এই ঘরের পাশের ঘরখানাই তোমার। বুঝতেই পারছ, তিনটে ব্লকের ঘরগুলোই একই রকমের। যেমন ঘরে ছিলে, তেমনি ঘরে আসবে, কাজেই অসুবিধে হবেনা। খাবার ব্যবস্থাও এখানেই হবে। তবে বাপু, আগেই বলে রাখছি, গেরস্ত মানুষ আমি, রাজা বা রায় বাহাদুর নই! ঘরের ছেলের মতন মানিয়ে গুনিয়ে থাকতে হবে তোমাকে। আমার সুখসুবিধে তুমি দেখবে, তোমার অসুবিধে যাতে না হয় সেদিকে আমারও নজর থাকবে। কেমন, রাজী ত?

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে নরেন উত্তর দিল: এ যে আমার পরম সৌভাগ্যের

কথা সার! আপনার মত মহতের সংসর্গে থাকা যে আমার পক্ষে স্বর্গবাস!

ঈষৎ হাসিয়া হরপ্রসাদ কহিলেন: আগে ত বাসটা কর, তার পর হিসেব করে দেখো কোথায় এসেছ, স্বর্গে কিম্বা নরকে। আগে থাকতেই আহ্লাদে নেচে ওঠা ঠিক নয়, বুঝেছ?

নরেন কহিল: তাহলে টাকাটা নিয়ে আসি সার?

হরপ্রসাদ কহিলেন: আনো। আমি তাহলে রসিদটা তৈরী করে রাখি। হ্যাঁ, আর একটা কথা, ঐ ত্রিশটি টাকার বিনিময়ে যে সুবিধা বা অধিকারগুলো এ বাড়ীতে তুমি পাবে অর্থাৎ আমি দিতে বাধ্য থাকবো, একখানা চিঠিতে খোলসা করে সব লিখে দেব। তোমাকেও একখানা চিঠিতে লিখে দিতে হবে—টাকাটা মাস মাস আগাম দেবে, ভদ্রভাবে থাকবে, আমাদের অসুবিধা বা বিরক্তিকর হয় এমন কোন কাজ করবে না। বুঝেছ?

নরেন হাসিয়া উত্তর দিল: আমার কিছুতেই আপত্তি নেই সার! আমার কাজ হচ্ছে তুলি টানা, তাতে একটু আওয়াজও হয় না, গোলমাল কিসে হবে? আমি যাই সার, টাকাটা দাখিল করে নিশ্চিন্ত হই।

হরপ্রসাদ কহিলেন: বেশ, নিয়ে এসো টাকা। আমি ততক্ষণ চিঠির মুসুবিদাটা করে ফেলি।

মিনিট দশেকের মধ্যেই নরেন টাকাগুলি আনিয়া হরপ্রসাদের সম্মুখে রাখিলে তিনি সেগুলি সতর্কভাবে গণিয়া এক আনার একখানি টিকিটের উপর সহি করিয়া পাকা রসিদ দিলেন। অতঃপর উভয়পক্ষের লিখিত একরারনামা দুইখানিরও আদান প্রদান হইয়া গেল।

(৩)

হরপ্রসাদ ভাবিয়াছিলেন, কর্ম্মশালা হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় আসিয়া নূতন বাসস্থানটিকে ধর্ম্মশালা করিয়া তুলিবেন। সহধর্ম্মিণী অনুপমা অবসরকাল ধর্ম্মপুস্তক পড়িয়াই অতিবাহিত করিতে অভ্যস্ত, তিনিও পত্নীর আদর্শ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সারাজীবনের সংস্কার এখানেও তাঁহাকে আর্থিক ব্যাপারে নিষ্কৃতি দিল না। বাড়ীর খালি ব্লকটির দিকে নজর পড়িলেই, মাসিক দেড়শত টাকা আয়ের ঘরের শূন্যটি বৃহত্তর হইয়া তাঁহার মনটিকেও যেন শূন্যময় করিয়া দেয়। ধর্ম্মপুস্তক খুলিলেই মুদ্রিত অক্ষরগুলির মধ্যে জনশূন্য ব্লকটি মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। আবার এখানকার বাড়ী ভাড়ার আয়ের মোহ অতীতের অপ্রীতিকর একটা ঘটনার ব্যাপারে তাঁহার অন্তরটিকে রীতিমত বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। দুর্দ্দিন ও দুর্ব্বার শোকের সুযোগ লইয়া ডাক্তার অধিকারী তাঁহার এলাহাবাদের প্রাসাদতুল্য বাড়ী এবং সেই সঙ্গে অনেকগুলি টাকা হস্তগত করিয়া কেমন নিশ্চিন্ত হইয়া আছে! বোম্বায়ের কর্ম্মক্ষেত্রে নানাভাবে বিব্রত এবং লিপ্ত থাকায় তিনি যেন এলাহাবাদের দিকে মনঃসংযোগ করিবার অবসর পান নাই, কিন্তু ডাক্তার অধিকারীর ত কর্ত্তব্য ছিল মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা বা তাঁহার কাজের রিপোর্ট দেওয়া। বালিগঞ্জের বাড়ীর তুলনায় এলাহাবাদের বাড়ী অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়াও সেখান হইতে এ পর্য্যন্ত কিছুই উসুল করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই এবং সুনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকাল পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার করিবারও

কিছুই নাই। যথাস্থানে সংবাদ লইয়া তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন যে, ডাক্তার অধিকারী বাড়ীর ট্যাক্স ফেলিয়া রাখিয়া সর্ত্ত ভঙ্গ করেন নাই। সুতরাং সর্ত্তানুসারে দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কোন সূত্রেই এলাহাবাদের সম্পত্তি ডাক্তার অধিকারীর কবল মুক্ত করিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেই হইবে। এখন সেই চিন্তাটিও তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। ডাক্তার অধিকারীকে য়্যাটর্নীর দ্বারা সর্ত্ত সম্বন্ধে অবহিত হইবার নির্দ্দেশ দিয়া তিনি কাজ আগাইয়া রাখিয়াছেন,—এখন কয়টা মাস পূর্ণ হইলেই হয়।

ইহার উপর একদা সাধ করিয়া যে কাজল তিনি চোখে লাগাইয়াছিলেন, এখন তাহাও যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আত্মীয়স্বজনহীন অসহায় নিরুপায় ছেলেটি তাঁহার চক্ষুর উপর নিরাশ্রয় হইতেছে দেখিয়া তিনি নিজেই যাচিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। রাজার হালে সে সুসজ্জিত ঘরে বাস করিতেছে, ষ্টুডিও সাজাইয়া ছবি আঁকিতেছে, দুইবেলার পরিপাটি আহার এবং সুনির্দ্দিষ্ট জলখাবার গৃহস্বামীই যোগাইয়া চলিয়াছেন; কিন্তু এই সুবিধাগুলির বিনিময়ে প্রতি মাসের প্রথমেই যে ত্রিশ টাকা নিয়মিতরূপে তাহার দাখিল করিবার কথা এবং সে নিজেই স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়াছে—তিনটি মাস ঠিকমত দিয়াই চতুর্থ মাস হইতে বাকি ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাসের প্রথমে খরচের ঐ টাকা দেওয়া ত দূরের কথা, মাস শেষ হইয়া গেলেও দেয় টাকাগুলি কোন মাসেই সে সম্পূর্ণ দাখিল করিতে পারে না, এবং যাহা দেয় তাহাও কয়েকটি দফায়; ফলে, গৃহস্বামীর নিকট দেনা তাহার ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। তিনি

হইতেছেন কথার মানুষ, জীবনে কখন কথার নড়চড় করেন নাই, এবং কেহ করিলে সহ্য করিতে পারেন না। প্রায়ই তাঁহাকে বলিতে শুনা যায়—যে লোক মুখের কথা রাখিতে পারে না, তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না। কেননা, মুখের কথাই হইতেছে মানুষের প্রকৃতির কষ্টি-পাথর, তাতেই তার ভিতরকার সমস্ত খবর ধরা পড়িয়া যায়। এই জন্যই ঋষিরা বলিয়াছেন—শব্দ ব্রহ্ম। সুতরাং মাস কয়েকের মধ্যেই বেচারী নরেনকে দেনা-পাওনার ব্যাপারে কথা রাখিতে না পারায় এক-কথার-মানুষ হরপ্রসাদের নিকট হেয় হইতে হইয়াছে।

কিন্তু নরেনের আয়ের হিসাব লইতে বসিলে এবং সেই সঙ্গে তাহার শিল্পী-সুলভ অন্তরটির সত্যকার পরিচয় পাইলে করুণার উদ্রেক হইবারই কথা। সে জানে, শৈশব হইতেই দৈব তাহার প্রতিকূল, দুর্ভাগ্য যেন ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। শৈশবেই মাতা ও পিতাকে হারাইয়া মাতুলের গলগ্রহ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মামীর বাক্য-বাণে তাহার অন্তরটি অনবরত বিদ্ধ হইয়া এমনই কড়া পড়িয়া গিয়াছে যে, কোনরূপ তিরস্কারই সেখানে বেদনার অনুভূতি জাগাইতে পারে না। হৃদয়বান মাতুল অবস্থাটি উপলব্ধি করিয়া তাহাতে স্নেহের প্রলেপ দিতেন এবং তাঁহারই সুব্যবস্থায় কলিকাতার মেসে থাকিয়া সে শিক্ষার সুযোগ পায়। মাতুল তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, শিল্প-বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই একটি ভাল রকমের ষ্টুডিও খুলিয়া তাহাকে স্বাধীনভাবে শিল্প-ব্যবসায়ের উপায় করিয়া দিবেন। কিন্তু এখানেও দৈব হয় তাহার প্রতিকূল। ফাইনাল পরীক্ষার পরই ১৯৩৪ অব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে তাহার সকল আশা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। মাতুল তখন কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া

মুঙ্গেরে একটি সোনা-রূপার দোকান খুলিয়া—ব্যবসায় চালাইতে-ছিলেন। দুর্ঘটনার পর অতিকষ্টে নরেন মুঙ্গেরে গিয়া মাতুলের ঘরবাড়ী এবং মাতুলবংশের জনপ্রাণীরও সন্ধান পায় নাই—সেই অঞ্চলটাই ভূগর্ভে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। ব্যাঙ্কে মাতুলের কিছু টাকা গচ্ছিত আছে বলিয়া যখন তাহাকেই একমাত্র ওয়ারিশন সাব্যস্ত করিয়া সংবাদ দেওয়া হয় এবং টাকা তুলিবার জন্য তদ্বির করিবার তাগিদ আসে, নরেন তখন শিক্ষানবিসীরূপে কোন চিত্রশালার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া মেসের খরচটুকু সংগ্রহের সুযোগ পাইয়াছে। এ অবস্থায় অর্থহীন অসহায় মানুষের চিত্তে লালসার উদ্দীপনা স্বাভাবিক, কিন্তু এই ছেলেটির প্রকৃতি বুঝি বিধাতা সাধারণ ধাতুতে গড়িতে ভুলিয়াছিলেন। তাই আর্থিক প্রলোভন তাহার শিল্পী-মনে কোনরূপ চাঞ্চল্য তুলিতে পারে নাই—বরং সেখানে প্রকৃতির ধ্বংসলীলার ভয়াবহ দৃশ্যের সহিত সর্ব্বহারা দুর্গতদের বেদনাতুর চিত্রই ভাসিয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ সে সমবেদনার সুরে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষকে লিখিয়া জানায়—'আমার মাতুলের আত্মার তৃপ্তি এবং স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া তাঁহার যে কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকার-স্বত্ব বিহারের দুস্থ অধিবাসীদের সাহায্যকল্পে আমি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে পরিত্যাগ করিলাম।' কিন্তু এই ব্যাপারটি তৎকালে নরেনের মনে চাঞ্চল্য তুলিতে না পারিলেও বিহারী নেতাদের অন্তরগুলি বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিল; কারণ নরেনের মাতুল ব্যাঙ্কে যে টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তাহার পরিমাণ দশ সহস্রেরও অধিক। পাটনার বিখ্যাত 'বিহার হেরল্ড' পত্রিকায় দুর্গত বিহারীদের সাহায্য-ভাণ্ডারে বাঙ্গালী চিত্রশিল্পীর এই বিপুল দানের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ভাষায় যে

সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও এই অদ্ভুত চিত্র-শিল্পীর মনের কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

মনের এই উদারতা নরেনের কর্ম্ম-জীবনেও নানারূপ বাধার সৃষ্টি করায় অধিকদিন চাকুরী করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। রায় বাহাদুর বড়ুয়ার দরাজ অন্তরটির সহিত তাহার অন্তরের অনেকটা মিল হইয়াছিল বলিয়াই কোনরূপ অসদ্ভাব এখানে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বরং, বেতনের টাকা হইতে ক্রমে ক্রমে সে প্রথম শ্রেণীর ষ্টুডিওর উপযুক্ত উচ্চাঙ্গের বিবিধ যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম কিনিয়াও কিছু টাকা সঞ্চয় পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছিল—যাহা তাহার কোষ্ঠিতেও বোধ হয় লেখা ছিল না। চিত্রবিদ্যায় তাহার বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে প্রকাশিত না হইলেও, ব্যবসায়ীমহলে এই অসামান্য প্রতিভাবান্ তরুণ শিল্পীটির শক্তির বিষয় অপরিচিত ছিল না; সুতরাং কঠিন কাজকর্ম্ম আসিলেই তাঁহারা নরেন বিশ্বাসকে স্মরণ করিতেন এবং তাহার উদারতার সুযোগটুকু পূর্ণমাত্রায় লইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। এই জন্যই হাতে প্রচুর কাজ থাকা সত্ত্বেও এবং দিবারাত্রি নিরলসভাবে তুলি চালাইয়াও শ্রমের অনুরূপ অর্থ কিছুতেই সে উপার্জ্জন করিতে পারিত না। রায় বাহাদুরের সংশ্রবে আর্থিক স্বচ্ছলতা নিবন্ধন তাহার শিল্পী-মন ব্যবসায়ের আবরণ পরিয়া নিজের সাধনাকে কোনদিনই বাজারে যাচাই করিতে ছুটে নাই। যে যেরূপ দক্ষিণা স্বেচ্ছায় দিয়াছে, তাহাই সে হাসিমুখে লইয়া বাসায় ফিরিয়াছে। সেখানে জীবিকার চিন্তা ত ছিলই না উপরন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি বাঁধা থাকায় আর্থিক সমস্যাও জট পাকাইবার সুযোগ পাইত না।

কিন্তু স্বাধীন জীবন-যাত্রার পথে নামিয়া সামান্য সঞ্চয়টুকু নিঃশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইল যে, এ-পথ একেবারে কুসুমাবৃত নহে। পুঁজিপতি বা ব্যবসায়ী বলিয়া যাঁহারা সমাজে গণ্য ও প্রতিষ্ঠাপন্ন, লভ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহাদের কারবার। শিল্পীর সাধনাপ্রসূত দান তাঁহাদের নিকট পণ্য মাত্র। ব্যবসায়ী-সুলভ দৃষ্টিতে এই পণ্য যাচাই করিয়া লভ্য নির্দ্ধারণেই তাঁহারা অভ্যস্ত। শিল্পীর সৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়া আয়ের পথ সুপ্রশস্ত করিবার দিকে তাঁহাদের ধী-শক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি যতখানি স্ফুট ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে, সেই নয়নানন্দদায়ক সৃজনীশক্তির পশ্চাতে অভাব ও দৈন্যের অন্ধকার কি ভাবে পুঞ্জীভূত—সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ততখানি ক্ষীণ এবং চিত্তবৃত্তিও নিরুৎসাহ হইয়া থাকে। সুতরাং শিল্পী নরেনের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তাহার সৃজনীশক্তির যোগ্য মর্য্যাদা দিবে—এমন হৃদয়বান শিল্প-ব্যবসায়ী এ-দেশে কোথায়? কাজেই মাসের পর মাস হরপ্রসাদের নিকট নরেনের দেনা বাড়িতে থাকে, এবং তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধের সেকালের উদার মনটিও অতিরিক্ত পরিমাণে কৃপণ হইয়া পড়ায় তিনিও পাওনাদারের পর্য্যায়ে উঠিয়া তরুণ শিল্পীর অন্তরে একটা আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছেন।

এই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পাশের ফ্লাটের তরুণী ছাত্রী মালা ঝোড়ো বাতাসের মত এক এক দিন তাহার ষ্টুডিওর মধ্যে ঢুকিয়া তাহার অভাবগ্রস্ত মনোরাজ্যটিও বুঝি ওলটপালট করিয়া দিয়া যায়। নরেনের অত্যন্ত সুন্দর চেহারা এবং তাহার বৃত্তি মালার মনে একটু হিল্লোল তুলিতেই সে নিজে নরেনের ষ্টুডিওতে একদিন হঠাৎ আসে এবং গায়ে পড়িয়া আলাপ করে। নরেন তাহাকে দেখিয়া প্রথমটায়

একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়ে, মালার প্রশ্নের উত্তর যোগাইতে জিহ্বা বুঝি তাহার স্তব্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ক্রমে বয়সের ধর্ম্ম এবং সঙ্গের প্রভাব সকল বাধাই ভাঙ্গিয়া দেয়। রীতিমত ঘামিয়া উঠিলেও নরেন প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে এবং সে-ভাব কাটাইয়া প্রতিবেশিনী এই প্রগতিশীলা তরুণীটির সহিত আলাপ করিতে থাকে। এ-ব্যাপারে তাহার বৃত্তিটাই তাহাকে প্রচুর সাহায্য করে। মালার প্রশ্নের উত্তরে ষ্টুডিও ও পেইন্টিং সম্বন্ধে এমন অনেক কিছুই তাহাকে বলিতে বা বুঝাইয়া দিতে হয়—যাহা এই তরুণী শ্রোত্রীটির নিকট একেবারে অভিনব।

কিন্তু নরেনের আর্থিক অবস্থা ও সঙ্গতির অভাব এই তরুণ-তরুণীর সচ্ছন্দ আলাপের মধ্যে অন্তরায় হইয়া উঠে। ইন্দিরার ইচ্ছা নয় যে, তাঁহার কন্যা এরূপ একজন অসহায় অপদার্থ যুবার সঙ্গে মেলামেশা করে, কথা বার্ত্তা কহে। যে অর্থহীন, বড়লোকের ছেলে নয়, বড় রকমের কোন উপার্জ্জন করে না, চেহারায় হাজার চটক থাকিলেও তাঁহার বিচারে সে লোক অপদার্থ ছাড়া কিছুই নয়।

তাই নরেনের সম্পর্কে মা নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া মেয়েকে বলেন: যখন তখন ঐ হতচ্ছাড়াটার ঘরে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা কইতে তোর লজ্জা করে না মালা?

মুখ ঝাপটা দিয়া মালা বলিল: তোমারই বা ওর ওপরে এত রাগ কেন, শুনি? দুটো কথা কয়েছি, তাতে হয়েছে কি? দিব্যি ছবি আঁকে, তাই দেখি।

—ছাই আঁকে! তবু যদি পয়সা আনবার থাকত মুরদ। পরের

বাড়ীতে প'ড়ে প'ড়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে দুটি বেলা কাঁড়ি গিলছে, একটি পয়সাও দেবার নাম নেই, ও আবার মানুষ? দূর—দূর!

শিল্পী মানুষটির সুন্দর চেহারা ও নিরীহ স্বভাব মালার মনের উপর যতটুকু দাগ টানিয়াছিল, মায়ের মুখে তাহার অক্ষমতার কথাটা উঠিতেই বুঝি সে জোর করিয়া সে দাগটি মুছিয়া দিতে সচেষ্ট হইল। অর্থহীনের প্রতি বরাবরই মালারও মর্ম্মান্তিক বিরাগ। কিছুদিন সে নরেনের ঘরের পানে ফিরিয়াও তাকাইল না। কিন্তু এজন্য নরেন যে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং ছবি আঁকিতে বসিয়া তুলিটি হাতে চাপিয়া সে ঘরের বাহিরে কোন পরিচিত পদশব্দ শুনিবার জন্য কানদুটি পাতিয়া আছে—তাহার দিক দিয়া এমন কোন নিদর্শনও পাওয়া গেল না। দিবসের অধিকাংশ সময়ই নরেন তাহার নিজস্ব ঘরখানির মধ্যে চিত্র-সংক্রান্ত কোন না কোন কার্য্যে নিশ্চেষ্টভাবেই লিপ্ত থাকে! কেবল সপ্তাহের মধ্যে কয়েকটি দিন অপরাহ্ণের দিকে ঘণ্টা তিনেকের জন্য ঘরখানি বন্ধ করিয়া তাহাকে বাহিরে যাইতে হয় সমাপ্ত কাজ ও তাহার পারিশ্রমিক আদান-প্রদানের জন্য। ইহা ভিন্ন সহরের কোন আকর্ষণ, এমন কি বাসার সন্নিহিত নবরচিত কৃত্রিম লেকের প্রলোভন পর্য্যন্ত এই কর্ম্মযোগী তরুণ যুবকটিকে কিছুমাত্র প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। প্রস্তুত করা ছবির সহিত অর্থপ্রাপ্তির প্রচুর আশা লইয়া সে বাহির হইলেও অধিকাংশদিনই রিক্ত হস্তে তাহাকে ফিরিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও অবসাদে তাহার চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছ এমন কিছু লক্ষণও সচরাচর পাওয়া যাইত না। আশাভঙ্গের দৌর্ব্বল্যটুকু নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য সে ফিরিয়াই নবীন উৎসাহে নূতনতর কোন

সৃষ্টিব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিত। ইহারই মধ্যে ফুরসৎ একটু মিলিলেই তাহার ফাঁকে হরপ্রসাদের মুখখানি তাহার চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিত এবং বৃদ্ধের সে-দিনকার তাগিদের একটা আশাপ্রদ উত্তরও তাহাকে মনে মনে তৈয়ারী করিয়া রাখিতে হইত।

সেদিন একটু বেলাবেলিই নরেন তাহার বাসায় ফিরিয়াছিল—দুই তিনটি স্থানে অর্থপ্রাপ্তি সম্বন্ধে হতাশ হইয়াই ফিরিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় মনের বিকারটুকু নব-সৃষ্টির আনন্দে মুছিয়া ফেলিবার জন্য অন্যান্য দিনের মত তুলি চালাইতে কোনরূপ ব্যতিক্রমও ঘটে নাই। এমন সময় মালা ঝড়ের বেগে ঘরখানির মধ্যে ঢুকিয়া কহিল: একটা নতুন খবর শুনেছেন ?

নরেনের মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। হাতখানি তুলিয়া এবং চোখ দুটি মেলিয়া জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে সে মালার পানে তাকাইয়া রহিল।

মালা বলিল: আপনার গৃহস্বামী ত তল্পী-তল্পা বেঁধে বোম্বাই চললেন, এখন আপনার অবস্থা কি হবে ?

এরূপ সংবাদ শুনিবার জন্য নরেন প্রস্তুত ছিলনা। গৃহস্বামীর যে ইতিমধ্যে বোম্বাই যাইবার কোনরূপ সম্ভাবনা আছে, তাহাও কোন দিন সে শুনে নাই। তাই বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করিতে হইল তাহাকে: তাই নাকি ? কিন্তু কিছু শুনিনি ত!

মালা: শুনবেন কি করে,—বেলা ঠিক চারটের সময় 'তার' এসেছে, আপনি তখন বেরিয়েছিলেন।

নরেন: সেখানকার খবর সব ভাল ত ?

মালা: ও! আপনি দেখছি এখনো পঁচিশ বছর পেছিয়ে

আছেন—টেলিগ্রাম এলেই বুঝি ভেবে নিতে হবে সেটা কোন দুঃসংবাদের বাহন হয়ে এসেছে !

নরেন : দেখুন, জীবনে একখানি টেলিগ্রামই পাই, আর সেটা এমন একটা সাংঘাতিক সংবাদ আনে······

মালা : আপনার গৃহস্বামীর বিকেলের টেলিগ্রাম খানি কিন্তু কোন সাংঘাতিক সংবাদ আনেনি, হারানো একটা সম্পত্তি পাওয়া যাচ্ছে কিনা, তাই তার তদ্বিরের জন্যে সেখানে যাবার নেমন্তন্ন এনেছে। জলেই জল বাধে বুঝলেন ?

জলে কি ভাবে জল বাধে, তাহা না বুঝিলেও এটুকু বুঝিতে নরেনের বিলম্ব হইল না যে, তাহার অন্নজলের পাট এ-বাড়ী হইতে উঠিয়াছে, এবং কয়েক মাসের পাওনা টাকা দাখিল করিবার জন্য এখনই কড়া তাগিদ আসিবে।

নরেনকে চিন্তিত দেখিয়া মালা কহিল : বুড়ো এখন আপনাকে নিয়ে ভারি ভাবনায় পড়েছে। তখন বলছিল—ছেলেটাই দেখছি ভারি মুস্কিলে পড়বে।

নরেন উৎকর্ণ হইয়া রহিল—পাওনা টাকাগুলির সম্বন্ধেও কোন সংবাদ মেয়েটির মুখ দিয়া বাহির হয় কিনা তাহা শুনিবার জন্য। কিন্তু মালা কথাটার মোড় ফিরাইয়া কহিল : আর শুনেছেন, ওদিকের খালি ফ্লাটটাও ভাড়া হয়ে গেল !

শুষ্ককণ্ঠে নরেন জিজ্ঞাসা করিল : এবার কে ভাড়া নিলেন ?

মালা কহিল : এক সাহেব, অবশ্য বাঙ্গালী সাহেব ; 'খুব নাকি বড়লোক, দু-তিনটে কার্নিভালের মালিক।

শুষ্ক হাসিয়া নরেন কহিল : আপনি দেখছি অনেক খবরই রাখেন, কিছুই বাদ যায় না।

মুখখানা লাল করিয়া মালা উত্তর দিল : বাঁচবার মতন বাঁচতে হলে দুনিয়ার সমস্ত খবরই রাখতে হয়—কুনো বেড়ালের মত ঘরের কোনে বসে থাকাটা গৌরবের নয়!—কথাগুলি এক নিশ্বাসে শেষ করিয়াই ঝড়ের বেগে সে বাহির হইয়া গেল।

নরেন বুঝিল, এখান হইতে এখন তাহাকে আস্তানা তুলিয়া পুনরায় অন্যত্র কোথাও গিয়া আস্তানা পাতিতে হইবে—'পুনর্মুষিকোভব' গল্পের মত তাহার অবস্থা আর কি! কিন্তু এখানকার দেনা সে কি করিয়া শোধ করিবে, ইহাই এখন কঠিন সমস্যা।

এই সমস্যাটা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল বাহির হইতে গৃহস্বামীর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর অবলম্বন করিয়া : নরেন, ফিরেছ নাকি হে?

স্বরের সঙ্গেই নরেন সচকিত হইয়া উঠিল এবং হাতের কাজ ফেলিয়া শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উত্তর দিল : আজ্ঞে—হ্যাঁ।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামী বলিলেন : আজ যে বেলাবেলিই ফিরেছ দেখছি।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নরেন বলিল : আজ আর বেশী ভোগান্তি হয় নি স্যার, প্রথমেই যেখানে যাই—যে-কজনের সঙ্গে দরকার ছিল আজ, তাঁরা ঐখানেই মিলেছিলেন কিনা—তাই সবাই সময় নিলেন। এইটুকুই আমার লাভ, ঘোরাঘুরির অনেক সময় বেঁচে গেল।

—ব'স, কথা আছে তোমার সঙ্গে।—বলিয়াই হরপ্রসাদ তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট চেয়ার খানিতে বসিয়া পড়িলেন, নরেনও তাহার

টুলটির উপর আলগোছে যেন কোন রকমে বসিল, বুকের ভিতরটা তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল।

হরপ্রসাদ বলিলেন: তুমি বেরোবার পরই বোম্বাই থেকে জরুরী একখানা 'তার' আসে। ব্যাপারটা হচ্ছে—প্রায় বছর বারো আগে আমার একটা সেরা সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যায়, সেটি ফিরে পাবার জন্যে চেষ্টার কোন কসুর করিনি, আজ হঠাৎ খবর এসেছে—সেটি ফিরে পাবার সুরাহা নাকি হয়েছে। সেই থেকে মনের অবস্থা যে কি রকম হয়েছে তা মুখে বলবার নয়। তাই কালই আমরা বোম্বাই মেলে রওনা হব ঠিক করে ফেলেছি। এখন ভাবনায় পড়েছি তোমাকে নিয়ে। কেননা, তোমার ব্যাপারটাও ত সেরে ফেলা আবশ্যক। কম্বলখানা ভিজিয়ে তুমি কি রকম ভারি করে ফেলেছ, তা' ত দেখতেই পাচ্ছ! এখন কি করতে চাও বল?

নরেনের মুখখানি নত হইয়া গেল, একটি নিশ্বাস সবেগে ত্যাগ করিয়া সে কহিল: দিতে হবে বৈকি, এবং আমি এ দেনা শোধ করবই। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি যে করব ঠিক করতে পারছি না। আর, আপনারাও যে হঠাৎ চলে যাবেন—তাও ভাবিনি, দিন কতক সময় পেলে……

হরপ্রসাদ: দশবছর সময় পেলেও তুমি কিছুই করে উঠতে পারবে না, আমি তোমাকে চিনে নিয়েছি। তোমার আয়েরও ঠিক নেই, কথারও ঠিক নেই।

নরেন: আপনি এতদিনে তাহলে আমার রোগ ঠিক ধরেছেন সার! এখন আপনিই বলুন ত কি করি? কি উপায়ে আপনার দেনা শোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়—উপস্থিত এই অবস্থায়?

হরপ্রসাদ: উপায় আমি স্থির করেছি শোনো। আমি বেশ বুঝেছি, টাকা তুমি দিতে পারবে না। অথচ আমি টাকাগুলো ছাড়তেও পারি না। তুমি যদি এক কাজ কর, তোমার দেনাও শোধ হয়ে যায়, আর এ বাড়ীতে তোমার থাকাও চলে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে নরেন বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কি উপায় তিনি দেখাইতে চান! তাহার মুখ দিয়া কথা আর ফুটিয়া বাহির হইল না।

ঘরখানির চারিদিকে দেনদার শিল্পীর হাতের সমাপ্ত অসমাপ্ত বিভিন্ন চিত্রগুলির উপর দৃষ্টি সঞ্চারিত করিয়া হরপ্রসাদ সহসা প্রশ্ন করিলেন: পুরানো ছোট কোন ফটো দেখে তুমি বড় অয়েল পেন্টিং করতে পারো?

সোল্লাসে নরেন উত্তর করিল: নিশ্চয়ই; এই ত আমার কাজ সার!

—তাহলে তুমি এই কাজই কর। একখানা পুরানো ফটো আমি তোমাকে দেব, তাই দেখে ফুল সাইজ অয়েল পেন্টিং একখানা তাড়াতাড়ি করে দিতে হবে তোমাকে। পারবে ত?

—ফটোখানা আমাকে দেখাবেন। আমি দেখে……

—আহাহা, দেখে ভাববার মত কিছু নেই হে! কথা হচ্ছে—কাজটা করতে হবে, করা চাইই। জায়গায় জায়গায় একটু আধটু 'ফেন্ট' হয়ত হয়ে থাকবে; তা তাতে কি এমন এসে যাবে আর? তোমাদের ত রঙ গুলে তুলি চালানো কাজ, দেবে ঠিক ঠাক চালিয়ে। আর দেখ, এই বাবদে আমি তোমার দেনার টাকাটা বেবাক রেহাই দিচ্ছি—একটি পয়সাও আর চাইব না; তা ছাড়া, তুমি যেমন আছ

তেমনি থাকবে, এর জন্যে ভাড়া-টাড়া কিছুই দিতে হবে না। একটা ইক্‌মিক্ কুকার কিনে নিয়ো, খাবার বিশেষ কোন কষ্ট বা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে না। কিন্তু বাপু, ফিরে এসে যেন দেখতে পাই, কাজগুলো আমার শেষ করে ফেলেছ—টাকার মত যেন না হয়।

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নরেন গৃহস্বামীর পদধূলি লইয়া কহিল: আজ আমার মাথার ওপর থেকে মস্ত একটা দুশ্চিন্তা নামিয়ে দিলেন সার! আপনি আমাকে বাঁচালেন।

এই সময় উপর হইতে জলযোগ করিবার তাগিদ আসিলে গৃহস্বামী কহিলেন: আজ আর তোমার জলখাবার এঘরে আসবে না, ওপরের ঘরে চলো তুমি, সেখানেই জল-টল খাবে, ফটোখানাও তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

উপরের একখানি ঘরে হরপ্রসাদের নিরুদ্দিষ্টা কন্যা রেণুর একখানি ফটো সাজানো ছিল। জলযোগের পর হরপ্রসাদ নরেনকে সেই ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন: এই ফটোখানিকে বড় করাই তোমার কাজ নরু,—এ-কাজ তুমি এই ঘরে বসেই করবে। আমাদের জিনিস-পত্তর সব দুখানা ঘরে রেখে তালাবন্ধ করে যাচ্ছি। বাকি ঘরগুলো তোমারই জিম্মায় থাকবে। এই ফটোখানাকে তুমি যেন নিচের ঘরে নিয়ে যেয়ো না বাবা, এর যা কিছু কাজ এই ঘরেই চলবে—বুঝেছ?

এই সময় বাহিরে মটরের হর্ণের সঙ্গে চারিদিকে একটা হাঁক-ডাক পড়িয়া গেল। হরপ্রসাদ সচকিত হইয়া বলিলেন: তোমাকে বলতে ভুলে গেছি নরু, পাশের ব্লকটাও ভাড়া হয়ে গেছে। তাঁরাই বোধ হয় লটবহর নিয়ে এলেন। চল, নূতন ভাড়াটে ভদ্রলোকটির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নরেনকে হরপ্রসাদের সহিত বাহিরে যাইতে হইল।

সাহেবী পোষাকে সজ্জিত এক ব্যক্তি ছড়ি হস্তে তখন মোটর হইতে নামিতেছিল। বয়স আন্দাজ বত্রিশ, চেহারা মোটের উপর মন্দ নয়; বেশ ফিটফাট্ এবং সপ্রতিভ প্রকৃতি। নাম অবিনাশ সরকার; কারনিভাল চালাইতে সিদ্ধহস্ত। বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালার বাহিরে নানাস্থানে তাহার কারনিভাল চলিতেছে। যেমন দেদার উপার্জ্জন করে, তেমনই দুই হাতে উড়াইয়া তৃপ্তি পায়।

হরপ্রসাদের মধ্যস্থতায় নরেন বিশ্বাস ও অবিনাশ সরকার পরস্পর পরিচিত হইলে অবিনাশই উপড়পড়া হইয়া করমর্দ্দনে নরেনকে আপ্যায়িত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সগর্ব্বে জানাইয়া দিল: আর্টিষ্ট নিয়েই ত আমার বিজনেস। কত আর্টিষ্ট যে করে খাচ্ছে আমার কারনিভালের দৌলতে তার ঠিক ঠিকানা নেই, দেবেন একখানা পিটীসান, আপনার নামটাও না হয় এনলিষ্ট করে নেব।

নরেন হাসিয়া উত্তর দিল: আপনার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ, তবে আমার কারবার হচ্ছে ওয়েল পেন্টিং নিয়ে, কারনিভালের কাজ করা আমার পোষাবে না।

'ও আই সী'—এই কয়টী ইংরাজী কথা শ্লেষের সুরে বলিয়া সরকার সাহেব সাহেবী কায়দায় তাহার ব্লকের ভিতর চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় ব্লকের বারান্দা হইতে ইন্দিরা মন্তব্য করিলেন: [illegible]ব্য মানুষটী, দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। আসতে না আসতেই পাড়া [illegible]জার, যেন কোথাকার কে রাজা এল!

হরপ্রসাদ হাসিয়া বলিলেন: বটেই ত! সাহেব সেজে এসেছে, হাতে ছড়ি, মাথায় টুপি, দু-তিনখান মোটর, এত লোকজন,—শ্রদ্ধা ত হবারই কথা।

পরদিনই হরপ্রসাদ সস্ত্রীক বোম্বাই রওয়ানা হইলেন। নরেন তাঁহাদিগকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে সঙ্গে চলিল। হাওড়া ষ্টেশনেও হরপ্রসাদ তাহাকে ফটোখানির কাজ তাড়াতাড়ি সারিবার এবং তাঁহার ব্লকের ঘর কয়খানি সতর্কতার সহিত দেখাশুনা করিবার নির্দ্দেশটি স্মরণ করাইয়া দিতে বিস্মৃত হন নাই।

সহরের এক খ্যাতনামা অধ্যাপক নরেনকে কিছু কাজ দিয়াছিলেন। হরপ্রসাদকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া, কাজগুলি লইয়া সে অধ্যাপক মহাশয়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। প্রণষ্টপ্রায় ফটোচিত্র হইতে কয়েকখানি পরিপূর্ণ চিত্র তাহাকে নিজের পরিকল্পনায় আদর্শ বজায় রাখিয়া সম্পূর্ণ করিতে হইয়াছিল। চিত্রগুলি দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় চমৎকৃত! তাঁহার মৃত পিতা, মাতা ও ভগিনীর তিনখানি দুষ্প্রাপ্য ফটোচিত্র এমনভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদের যথাযথ আলেখ্য পাইবার আশা তিনি পরিত্যাগই করিয়াছিলেন। কতিপয় নামজাদা ষ্টুডিও এ কার্য্য গ্রহণে স্বীকৃত হয় নাই। এক বন্ধুর অনুরোধে সন্দিগ্ধচিত্তেই তিনি নরেনের হাতে প্রণষ্টপ্রায় ফটো তিনখানি অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন কল্পনাও করেন নাই যে, এই অখ্যাতনামা তরুণ শিল্পী এত শীঘ্র এমন নিখুঁত ভাবে তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবে! নিরুদ্দিষ্ট প্রিয়জনকে ফিরিয়া পাইলে মনে যেরূপ উল্লাস উপস্থিত হয়, অধ্যাপক সেইরূপ উল্লাসের সহিত নরেনের সম্বর্দ্ধনা করিলেন, প্রশংসা যেন তাঁহার মুখে ধরিতেছিল না।

অনেক বড় লোকের কাজ সে করিয়াছে, বড় বড় কলেজের সম্পর্কেও তাহাকে যাইতে হইয়াছে; সর্ব্বত্রই সে মনোনিবেশের সহিত কাজ করিয়া যায়, ইহাই তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব। কিন্তু কাজ পাইয়া এভাবে তাহার সম্মুখে কেহ কোনদিন এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নাই, কাজের এমন সুখ্যাতিও সে কাহারও মুখে শুনিবার অবকাশ কোনদিন পায় নাই। আজ তাহাকেও চমৎকৃত হইয়া চাহিয়া রহিতে হইল।

শুধু মুখের প্রশংসা নয়,—অধ্যাপক মহাশয় যখন দশ টাকার দশখানি নোট তাহার হাতে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে গুঁজিয়া দিলেন, তখন নরেনের বিস্ময় একেবারে যেন ছাপাইয়া উঠিল!—একশো টাকা! সে যে বিশ টাকার বেশী প্রত্যাশা করে নাই; তাহাও যে আজই সদ্য সদ্য পাইবে সে সম্বন্ধেও তাহার গভীর সংশয় ছিল। অভিভূতের মত সে কহিল—একি সার! দশখানা নোট যে, সবই দশ টাকার!

তাহার বিস্ময় বিহসিত মুখখানির দিকে চাহিয়া অধ্যাপক উত্তর দিলেন: এর বেশী আমার কাছে এখন নেই, থাকলে সবটাই দিতাম। আসছে মাসের ১লা তারিখে এই সময় এস। বাকিটা দেব।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! নরেন গাঢ়স্বরে কহিল: আপনি তাহলে আমার কথা বুঝতে পারেন নি সার! আমি বলছি, আপনি আমাকে অনেক বেশী দিয়েছেন। আমি এত টাকা পাবার প্রত্যাশা নিয়ে আপনার কাজে হাত দিই নি।

বদ্ধদৃষ্টিতে অধ্যাপক তরুণ শিল্পীর দিকে চাহিয়া কহিলেন: তার কারণ তুমি তোমার প্রতিভা ওজন করবার সুযোগ এখনও পাওনি।

আমি বুঝতে পেরেছি, আর্টকে তুমি সাধনা বলেই বরণ করেছ, অর্থ নিয়ে তাই যাচাই করতে শেখনি। কিন্তু এ ঠিক নয়। এতে চলার পথে পদে পদে হোঁচট খেতে হবে। আমি তোমাকে একশো টাকা মাত্র দিয়েছি যে কাজের বিনিময়ে,—তুমি বলছ, বেশী দিয়েছি তার জন্যে। জান, পাঁচটা বড় বড় ষ্টুডিও একাজ নিতে ভরসা করে নি! আর যদি তাদের মধ্যে কেউ এ কাজে হাত দিত কত বিল করত বলতে পার? সাড়ে চারশোর কম নয়। আমি তোমাকে একশো দিয়েছি, পয়লা তারিখে আর একশো দেব। নিজেকে এত সস্তা ক'র না, নিজের ওজন বুঝে দর দিয়ো, নইলে বড় হ'তে পারবে না কোনদিন! হাঁ, ভাল কথা, একদল সাহেব 'গ্র্যাণ্ড হোটেলে' পিকচার একজিবিসান খুলেছে জান ত?

নরেন কহিল: ওসব বড় ব্যাপার; আমাদের জেনে লাভ নেই, সার।

—লাভ নেই কি হে! লাভ হয় ত এই পথেই। আমি একখানা পামফ্লেট ওদের পেয়েছি। তুমি নিয়ে যাও, ওতে সব লেখা আছে। তুমি একখানা ছবি দেবার চেষ্টা কর। আমি তোমার প্রতিভার যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমার বিশ্বাস, তোমার ছবি একটা প্লেস পাবেই। আমেরিকার বিখ্যাত 'ইন্টার ন্যাশান্যাল ফিলিম কোম্পানী' গ্র্যাণ্ড হোটেলে ছবির একটা একজিবিসান খুলেছে। প্রত্যেক প্রভিন্সের সেরা 'বিউটি' সংগ্রহ করা হচ্ছে এদের বিজনেস। দামই বল বা রিওয়ার্ডই বল, মনে হচ্ছে—হাজার পাউণ্ড, প্রায় পনের হাজার টাকা; এ ছাড়া কোন বৈশিষ্ট্য বা অসাধারণত্ব আছে—এমন কোন ছবির জন্যে এরা স্পেস্যাল রিওয়ার্ডও দেবে জানিয়েছে। কখন কোন্

দিক দিয়ে অদৃষ্ট ফেরে কে বলতে পারে? চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? ছবি তৈরী হলে, বরং আমার কাছে এনো, আমি সেখানে পাঠাবার সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে দেব।

পামফ্লেট খানি হাতে লইয়া সেই মহানুভব অধ্যাপককে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইয়া নরেন বিদায় লইল। কাজ করিয়া কাজের এমন উচ্চ পারিশ্রমিক এ-পর্য্যন্ত সে পায় নাই; ইহা তাহার পক্ষে যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই আকাঙ্ক্ষার অতীত। পনের দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া সমাপ্ত কাজের জন্য যেখানে সে দশটী টাকা পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছে, কাজে নানাবিধ ত্রুটি দেখাইয়া কর্ম্মকর্ত্তা সেখানে হয়ত সাত টাকায় রফা করিয়াছেন, তাহাও এক দফায় নয়,—অন্ততঃ সাতদিন হাঁটিয়া সাতটী টাকা আদায় লইতে হইয়াছে। আবার এমন অনেক হৃদয়বানও আছেন, বারবার হাঁটাইয়া চুক্তির অর্দ্ধেকটা দিয়া বাকিটুকু দিবার আর লক্ষণ প্রকাশ করেন না। কত স্থানে এমন কত টাকাই তাহার মারা গিয়াছে। কাজ করিয়া টাকার জন্য প্রার্থী হওয়াই তাহার পক্ষে লজ্জার বিষয়; অথচ তাহার অভাবের অন্ত নাই। একসঙ্গে এতগুলি টাকা পাইয়া সে যেন হাঁফাইয়া উঠিল, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না—কিভাবে টাকাগুলি খরচ করিবে, কি কিনিবে, সহরের কোন্ কোন্ বস্তুগুলি তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ও একেবারে অপরিহার্য্য!

হরপ্রসাদের দেওয়া ছবিগুলির কাজ আরম্ভ করিবার জন্য ধর্ম্মতলা হইতে রং ও ক্যাম্বিশ লাগান ফ্রেম পঁচিশ টাকা খরচ করিয়া প্রথমেই কিনিয়া ফেলিল। তাহার পর কলেজ ষ্ট্রীট হইতে একটি কুকার কেনা হইল। সেই সঙ্গে একটা ষ্টোভও বাদ পড়িল না; এনামেল ও

এলুমিনিয়মের কয়েকখানা তৈজস পত্রও। তখনও পকেটে নোট ও খুচরায় প্রায় পঞ্চাশ টাকা রহিয়াছে! সুতরাং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে লেকরোডে ট্যাক্সী যোগে পাড়ি দিয়া উপার্জ্জিত অর্থগুলিকে সার্থক করিতে তাহার পক্ষে কোনও ত্রুটী হইল না।

(৫)

দোতালার একখানি ঘরে হরপ্রসাদের দেওয়া ছবিখানি লইয়া নরেন তাহার প্রসাধনে ব্রতী হইয়াছে। পাঁচ ছয় বৎসরের এক অপূর্ব্ব বালিকার ছবি। যদিও তাহা মলিন ও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি ছবির মেয়েটির মুখখানি কি চমৎকার! তাহাকে যেন পরিপূর্ণরূপে উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে তাহার আকর্ণ-বিসারী অপূর্ব্ব সুন্দর দুইটি চক্ষু। বালিকার এই অপরূপ আলেখ্যটি তরুণ শিল্পীকে শুধু আকৃষ্ট নয়, অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। অনেক চিত্রের উপর সে তুলিকা চালাইয়াছে, বহু আয়ত নেত্রার আলেখ্য তাহার নেত্র পথে পড়িয়াযাছে, কিন্তু এমন অপূর্ব্ব দুইটি চক্ষু বুঝি সে কোথাও দেখিবার অবকাশ পায় নাই। ছবিখানি তাড়াতাড়ি শেষ করিবার জন্য সে ঠিক সম্মুখেই বিশেষভাবে রাখিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে ইজেল-এ ক্যানভাস লাগাইয়া ব্যাক গ্রাউণ্ডে রং ফলাইতে মনোনিবেশ করিল।

ঘরের বাহিরে দালানটির এক পার্শ্বে নরেন তাহার নূতন কুকার চড়াইয়াছে। তাহার শিল্পী-জীবনে স্বহস্তে রন্ধন এই প্রথম। কুকারের সহিত প্রাপ্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পড়িয়া সে যথাযথ ভাবেই রন্ধনের

আয়োজন করিয়াছে। ভাত, ডাল, ডিম ও তরকারী,—চারিটি বাটি ভরিয়া সিদ্ধ হইতেছিল।

ব্যাক গ্রাউণ্ড শেষ করিয়া নরেন মেয়েটির অপূর্ব্ব মুখখানির কিয়দংশ আঁকিয়াছে, এমন সময় দমকা হাওয়ার মত রুদ্ধ দরজাটি সশব্দে ঠেলিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল—মালা। নিচের দালানে মালাদের ব্লকের দিকের দরজাটি সম্ভবতঃ সে ইচ্ছা করিয়াই বন্ধ করে নাই।

চমকিত নরেনকে কথা কহিবার অবসরটুকু না দিয়াই মালা কলকণ্ঠে কহিল: বাঃ! আপনি ত বেশ লোক মশাই। বুড়ো যেতে না যেতেই তার দোতলার ঘরখানি দখল করে তোড়-জোড় পেতে বসেছেন!

অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে নরেন কহিল: না, না, তা কেন? এ সব তাঁরই তোড়জোড় যে! অয়েল-পেন্টিংখানির বরাত দিয়ে গেছেন, আপনি ত শুনেছেন সে কথা।

—ছবির খুকিটি বুঝি তাঁরই বরাতের নমুনা?

—হাঁ। তাই সব কাজ ফেলে এইটিই আগে ধরব স্থির করেছি।

নাসিকা কুঞ্চিত ও সুন্দর মুখখানি বিকৃত করিয়া মালা কহিল: আহা—কি বিউটি!

মালার কথায় ব্যাথা পাইয়া নরেন কহিল: ছবিখানা ফেন্ট হয়ে গেছে, তাই 'বিউটি' বুঝতে পারেন নি। কিন্তু যাঁর ছবি, তাঁর ওপর কটাক্ষ করলে অবিচার করা হয়। এমন মুখ, এমন চোখ, এমন আশ্চর্য্য ভুরু—হাজারের মধ্যে একজনের থাকে কিনা সন্দেহ!

মুখখানা মচকাইয়া মালা কহিল: তবু যদি থাকত বেঁচে।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নরেন মালার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল: কার কথা বলছেন ?

মালা শ্লেষের সুরে কহিল: যার রূপ সজ্জায় উঠে পড়ে লেগেছেন! বুড়োর ছোট মেয়ে,—আপনি হয়ত ভাবছেন ছেলে বেলার ছবি, এখন তিনি পূর্ণ যুবতী; ছবি তুলে বাহোবা নেবেন,—কিন্তু সে গুড়ে বালি! পটল তুলেছে অনেকদিন।

নরেনের কোমল চিত্তটি ব্যাথায় ভরিয়া গেল। আহা! এমন অপূর্ব্ব কুসুম-কোরকটি অকালে কালের কোলে ঝরিয়া পড়িয়াছে! তাহার অজ্ঞাতে একটি নিশ্বাস দীর্ঘতর হইয়া বাহির হইল।

মুখে দুষ্টুমীর হাসি টানিয়া মালা কহিল: আমি তাহলে রোগ ধরেছিলুম ঠিক বলুন!

আর্ত্তস্বরে নরেন কহিল: আপনি আমাকে অনর্থক আঘাত দিচ্ছেন, রহস্যেরও বোধ হয় একটা সীমা আছে।

মালা কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিল: নিশ্চয়ই; রহস্যের যেমন সীমা আছে, রহস্যের পাত্রও তেমনি বিচার সাপেক্ষ। আপনি হচ্ছেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট, আপনার সঙ্গে রহস্য করবার যোগ্যতা আমার কতটুকু বলুন!

মালার কটাক্ষে নিজেকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া নরেন কহিল: দেখুন, আমি অতি নগন্য চিত্র-শিল্পী, রং তুলি নিয়ে আমার কারবার,—কথা-শিল্পী আমি নই যে, গুছিয়ে কথা বলব। আমার কথায় যদি দোষ ত্রুটি হয়ে থাকে, ক্ষমা করবেন।

মালা তৎক্ষণাৎ ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল: ক্ষেপেছেন আপনি! ঠাট্টা বোঝেন না? আমি এ বাড়ীতে এসে অবধি দেখছি,

বরাবরই আপনার উপর এক তরফা ডিক্রী হচ্ছে, আর আপনি পড়ে পড়ে সহে যাচ্ছেন! তাই ইচ্ছে হল দেখি আপনাকে খোঁচা দিয়ে রাগিয়ে তোলা সম্ভব কিনা!

নরেন প্রশ্ন করিল : কি দেখলেন?

মালা গম্ভীরভাবে উত্তর দিল : একেবারে হোপলেশ! বুঝলুম, এক তরফা ডিক্রী-জারীর যোগ্য পাত্রই আপনি ; পড়ে পড়ে শুধু মার খাবেন বলেই দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয়েছেন!

আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নরেন হাতের তুলিটি প্যালেটের গর্তে গুঁজিয়া নূতন একটি তুলি টানিয়া লইল। মালা বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল : কি হবে এখন,—ঐ মৃতা বালিকাটির রূপসজ্জা?

দৃঢ়স্বরে নরেন কহিল : হাঁ, আমার সমস্ত শক্তি ও সাধনা দিয়ে আমি এই মেয়েটির এমন একখানি ছবি আঁকব, যাতে আমার শিক্ষা হবে সার্থক, আর গৃহস্বামী ফিরে এসে এই ঘরে ঢুকেই স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখবেন—তাঁর কন্যাটি যেন জীবন্ত হয়ে প্রতীক্ষা করছেন এখানে।

চাপা নিশ্বাসের সহিত বিষাদের সুরে মালা কহিল : তাহলে দেখছি আমার কোন আশা নেই এক্ষেত্রে।

অতি বিস্ময়ে দুই চক্ষু তুলিয়া নরেন মালার দিকে চাহিতেই মালা অভিনয়-ভঙ্গিতে কহিল : আমার এ আক্ষেপের অর্থ বোধ হয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি! আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, হাতের সব কাজ ফেলে আপনি সর্বাগ্রে আমার একখানি ছবি আঁকেন। এই প্রস্তাব নিয়েই এসেছিলাম আপনার কাছে। কিন্তু আপনি ত এখন মৃত অশ্বকে দানা খাওয়াতেই ব্যস্ত!

মালার কথায় নরেন যেন উৎসাহিত হইয়া উঠিল; হাতের তুলিটি প্যালেটের মধ্যে রাখিয়া বিস্ময় ও কৌতূহল-বিজড়িত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া কহিলঃ ছবি আঁকাতে চান আমাকে দিয়ে? আপনার? নিজের?

—এটা বুঝি খুবই ধৃষ্টতার কথা আমার পক্ষে?

—আপনার পক্ষে নয়, আমার পক্ষে; শুধু ধৃষ্টতা নয়, একান্ত বিস্ময়ের কথা।

—কেন বলুন ত?

—কোন একটা বিশেষ কারণে কাল রাতে আমার মনে ঠিক এই সঙ্কল্পই হয়েছিল।

—বলেন কি,—একই চিন্তা দুজনের মনে যুগপৎ! তাহলে ত সত্যই বিস্ময়ের কথা। আচ্ছা বলুন ত, সেই বিশেষ কারণটি কি, যার জন্যে আমার ছবি নেবার সঙ্কল্প আপনার মনেও শিহরণ তুলেছিল?—বলুন না…

—খুব ঘটা করে ছবির একটা একজিবিসান খোলা হচ্ছে; আমি তাতে একটা ছবি দেব স্থির করেছি। খবরটা কালই পেয়েছি। কেন বলতে পারি না, হঠাৎ আমার মনে হ'ল আপনাকে আদর্শ করে যদি একখানা ছবি আঁকি, সেটা ব্যর্থ হবে না।

—কি সর্ব্বনাশ! এত বড় কলকাতা সহরের মধ্যে অসংখ্য রূপসী মেয়ে থাকতে আমাকেই আপনি আদর্শ স্থির করলেন?

—দেখুন, আপনার কতকগুলো ভঙ্গিতে এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যেটা আর্টের দিক দিয়ে একেবারে নিখুঁত! আমি সেইগুলো বজায় রেখে একটু নতুনভাবে আপনার ছবি আঁকতুম।

—কিন্তু আপনি নিজে থেকে আমাকে ত কিছুই বলেন নি?

—সাহস পাইনি; যদি আপনি অন্য কিছু মনে করেন এই ভয়ে।

—তাহলে টোপ ফেলবার আগেই মাছ আপনাকে ধরা দিয়েছে বলুন! এখনও ঐ সঙ্কল্প আপনার মনে আছে না কি?

—যদি আপনি অনুগ্রহ করে কথা দেন, তাহলে আজই আমি কাজ আরম্ভ করি; কেননা, সময় খুবই কম,—পনেরো দিনের মধ্যে ছবি সেখানে পাঠাতে হবে।

—এতে কি লাভ বলুন ত?

—লাভ লোকসান হিসেব করে কাজ ত কোনদিন করিনি আমি।

—তা আমি খুব জানি; উদয় অস্ত খেটেই মরেন, পয়সার বেলায় ঢু ঢু; অথচ এইটিই হচ্ছে সব চেয়ে বড় বস্তু।

—আপনি ভুল বুঝেছেন। কাজ করে তার সফলতায় যে আনন্দ, সেইটিই আমার কাছে সব চেয়ে বড় বস্তু—পয়সা নয়।

—হ'তে পারে, পয়সা আপনার কাছে হয়ত হাতের ময়লা, কিন্তু আমার কাছে ওরই সার্থকতা সব চেয়ে বেশী! আপনি লাভ লোকসান না খতিয়েই কাজে নামতে পারেন, কিন্তু আমরা তা পারিনে। কাজেই আপনাকে কথা দেবার আগে আমার জানা দরকার—এ কাজে আমার লাভের পরিমাণ কতটুকু!

—সবটুকুই আপনার প্রাপ্য, আমি তার কোন অংশই চাই না। ছবিখানা বিক্রী হয়ে গেলে সব টাকাই আপনি বুঝে নেবেন।

—আর যদি বিক্রী না হয়,—ধরুন, যদি কেউ না কেনে?

—তাহলে ছবিখানাই আপনি নেবেন, সেইটুকুই আপনার লাভ।

—আর আপনার লভ্যাংশ বুঝি—শুধু যশ?

—লাভ-লোকসান যদি খতান—তা'হলে হয়ত গভীর অপযশ!

—সে আপনি বুঝবেন। আমরা হচ্ছি সুখের কপোতী, নিন্দা-অপযশের ধার ধারি না।—তা'হলে কিভাবে আমার ছবি নিতে চান?

—প্রত্যহ আপনাকে নিয়মিত বসিয়ে সিটিং নেওয়া ত সম্ভবপর হবে না, তাই মনে করেছি, একদিন আপনাকে কষ্ট দিয়ে আমার নিজস্ব পরিকল্পনায় একখানা ফটো তুলে তাকেই আমার সাবজেক্ট করব।

—অর্থাৎ দুধের সাধটুকু ঘোলেই মেটাতে চান! তাহলে ছবি তুলবেন কখন?

—আজ বৈকালে ঠিক চারটেয়।

—এই ঘরেই?

—না,—এ ধরণের ছবি নেওয়ার ভজকট অনেক; বাইরে ছবি নিতে হবে। লেকের শেষ দিকে—যেখানটা খুব নিরিবিলি।

—অসম্ভব। বেলা ঠিক তিনটেয় যে আমার আবার এনগেজমেণ্ট আছে কালীঘাটে। সেখানে আধঘণ্টা থাকতে হবে। দুটো গান গেয়ে তবে ছুটি।

—বেশত ছুটি পেলেই লেকে আসবেন; পনেরো মিনিটও লাগবে না।

—ট্যাক্সি ভাড়া ত লাগবে?

—নিশ্চয়ই, তার ভাড়া আমি এখনই আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।

ঘরের আনলায় নরেনের সার্টটি ঝুলিতেছিল। পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া মালার হাতে দিল। টাকা কয়টি মুষ্টিবদ্ধ

করিয়া মালা হর্ষোৎফুল্ল মুখে প্রশ্ন করিল: তাহলে আপনাকে ঠিক কোথায় পাব ?

নরেন তৎক্ষণাৎ একখানি কাগজে পেন্‌সিল দিয়া নক্সা করিয়া কাগজখানি মালার সম্মুখে ধরিয়া কহিল: এই দেখুন, জায়গাটা আপনাকে চিনিয়ে দিচ্ছি পেন্‌সিল এঁকে—এইটে হচ্ছে লেক; নূতন কাটানো মাটীগুলো বালিয়াড়ির মত উঁচু হয়ে আছে—তারই মাঝখানে এই ফালিটি ঠিক যেন পাহাড়ের উপত্যকা; এদিকটা এখনও গড়ে ওঠেনি বলে বেশ নিরিবিলি। এই চিহ্নিত স্থানটিতে প্রকাণ্ড একটা বটগাছ, এরই তলায় আমি তোড়-জোড় নিয়ে থাকব।

কাগজখানা লইয়া হাসিয়া মালা কহিল: ভাগ্যিস এর ওপর আপনি কবি হননি, তাহলে স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে একটা কবিতাই লিখে ফেলতেন। আচ্ছা, তাহলে এখন চললুম,—হাঁ—ভাল কথা কি কাপড় পরে যাব ?

—আপনার যা খুসী, অবশ্য সিটিং যখন দেবেন, তখন কাপড় আপনাকে বদলাতে হবে। সেই কাপড় আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।

—কাপড়ের ব্যবসাও আপনার আছে নাকি ?

—আমার নেই, তবে যাদের কাজ কর্ম্ম করি তাদের আছে। সাউথ ষ্টোরের ছবির কাজ আমাকে করতে হয়। কাপড় আমি সেখান থেকেই আনব। রূপ তোলার মত রূপসজ্জাও শিল্পীর কাজ।

নরেনকে এই মেয়েটি যতটা অপদার্থ ভাবিয়াছিল, তাহার অল্পকার কথা বার্ত্তায় সে ভাব অনেকটা কাটিয়া গেল; বুঝিল, মানুষটি একেবারে অবহেলার বস্তু নয়, তাহাতে বস্তু কিছু আছেই।

কুকারের ভ্যেপার তখন সশব্দে দালানটিকে গুলজার করিয়া
তুলিয়াছিল। বাহিরে আসিয়াই কলকণ্ঠে মালা কহিল: এখানে
আবার একি কাণ্ড!

দরজার সম্মুখে আসিয়া নরেন কহিল: ইক্-মিক্-কুকার, শিল্পীর
জন্য রন্ধন করছে।

—তা ত দেখতেই পাচ্ছি,—কিন্তু একলাই খাবেন।

—বেশত, আপনিও লেগে পড়ুন।—আনাড়ী আমি, তাহলে ত
বেঁচে যাই।

—রক্ষা করুন মশাই, রন্ধন-কার্য্যে আমি আবার আপনার চেয়েও
বেশী আনাড়ী,—রাঁধুনীর ওপর এ ভার দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত, আমি
এবং আমার 'মাদার' দুজনেই!

—পুরুষদের পক্ষে এটা খুবই চিন্তার কথা, কেন না—রান্নাটাই
মেয়েদের উঁচুদরের কলাবিদ্যা।

—ও! ভালগার!—আপনি দেখছি এখনো সেভেনটিন্থ্ সেঞ্চুরীতে
পেছিয়ে আছেন, তাই আপনার এই পচা অর্থোডক্স মনোবৃত্তি, ছি!

যেমন উদ্দাম বায়ুর মত সে ঘরটির ভিতর ঢুকিয়াছিল, তেমনই
ক্ষিপ্রভাবেই দালান হইতে সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া গেল। নরেন এই
প্রগলভা মেয়েটির সপ্রতিভ চঞ্চল গতির দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া—
ভোজনের উদ্দেশে কুকার লইয়া পড়িল।

(৬)

ঠিক এই সময় বাড়ীর দরজার সম্মুখে একখানা ট্যাক্সী আসিয়া থামিল। মালা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল, পাশের বাড়ীর নূতন ভাড়াটিয়া অবিনাশ সরকার ট্যাক্সী হইতে নামিলেন। তাঁহার হাতে একটি চমৎকার ফুলের তোড়া। প্রবেশ পথে মালার সহিত চোখাচোখী হইবামাত্র সরকার সাহেব সাহেবী কায়দায় টুপি খুলিয়া মাথাটি ঈষৎ নত করিয়া শিষ্টতার পরিচয় দিল, মালাও নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত দুটি তুলিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল: আপনিই বুঝি এ সাইডটা ভাড়া নিয়েছেন?

অভিনেতার ভঙ্গিতে অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করিয়া সরকার সাহেব জানাইল: আপনাদেরই আশ্রিত হয়ে ধন্য হয়েছি। আপনিই বোধ হয় মিস্ রায়! আপনার গানের খ্যাতি শুনে আসছি অনেক দিন থেকেই; কিন্তু চাক্ষুষ দেখছি এই প্রথম! অবশ্য কাল এসেই জানতে পারি—আপনি এই হাউসেরই আদার সাইডে থাকেন।

—এই আশ্চর্য্য খবরটুকু কে আপনাকে জানিয়েছিলেন?

—আপনার মা। বলতে পারি না—শুনে আপনার হিংসে হবে কিনা—এরই মধ্যে তিনি আমারও মা হয়ে গিয়েছেন।

—How interesting! কিন্তু এ ইতিহাস এ পর্য্যন্ত আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত!

—সম্ভবতঃ তিনি অবকাশ পাননি আপনাকে শোনাতে। আপনিও তখন প্রেজেন্ট ছিলেন না।

—বিকেলের দিকে কোনদিনই আমার বাড়ীতে প্রেজেন্ট থাকবার জো নেই! কাল ছিল তিনটে এনগেজমেণ্ট! বলেন কেন!

—আপনার মা আমাকে সে সব বলেছিলেন। অনেক কথাই হয় তাঁর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধে; সে সব শুনে আপনার ওপর শ্রদ্ধা আমার আশ্চর্য্য রকম বেড়ে গিয়েছে।

—মা'র কাণ্ডই ঐ রকম। আমাকে বাড়াতে পারলে আর কিছুই চান না।

—তিনি ত বাড়িয়ে বলেন নি কিছু! আপনার কথা আমি এখানে আসবার আগেই শুনেছি।

—আচ্ছা, আপনার কারনিভালে কি কি 'শো' হয়?

—অনেক কিছুই Splendid performance দেখান হয়; যেমন নাইনটি ফিট উঁচু ল্যাডার থেকে লাফিয়ে ট্যাঙ্কের জলে পড়া, ফায়ারের ভিতর দিয়ে সাইকেল রেস, তলোয়ার খেলা, লক্ষ্যভেদ—এমন কত কি! যাবেন আজ 'ম্যাটিনী শো' দেখতে?

—আপনি যে রকম বর্ণনা করলেন, তাতে দেখবার কৌতূহল হওয়াটাই স্বাভাবিক, তবে কিনা আজ আবার বিকেলে এনগেজমেণ্ট আছে অনেকগুলো। তাই ভাবছি, কি করা যায়…

—সেগুলোকে আজ পিছিয়ে দেওয়া যায় না? মাপ করবেন আজকে আপনাকে এভাবে 'ইনভাইট' করবার বিশেষ কারণ এই যে, বেলজিয়াম থেকে একজোড়া 'বিউটি' বেরিয়েছিল ইণ্ডিয়া টুর করতে; বোধ হয় কাগজে পড়ে থাকবেন; তারাই আজ অ্যাপিয়ার হবে ক্যালকাটায় এই ফার্ষ্ট—আমার কারনিভালে। তাদের নাচ

সত্যই দেখবার জিনিস,—আপনি 'ডীপলী এন্‌জয়' করতে পারবেন এবং খুশী হবেন।

বেলজিয়ামের 'বিউটি'দের নাচের কথায় মালার মন নাচিয়া উঠিল এবং তাহার আবর্ত্তে পড়িয়া কালীঘাটের গানের এনগেজমেণ্ট ও লেকে নরেনকে সিটিং দিবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, সব গেল তলাইয়া। বেচারী শিল্পীর নিকট হইতে এইমাত্র যে পাঁচটি টাকা ট্যাক্সী ভাড়া বাবদ লইয়াছে, সে সম্বন্ধেও কোন অনুভূতিই তাহার চিত্তে বিক্ষোভ তুলিল না।

সলজ্জ মৃদু হাসিয়া মালা কহিল : আপনি যখন এমন করে আমাকে 'রিকোয়েষ্ট' করছেন, তখন অসুবিধা হলেও—আজকের এনগেজমেণ্ট-গুলো 'ক্যানসেল' করা ভিন্ন আর উপায় কি! বেশ, তাই হবে; আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম, মিষ্টার সরকার।

মাথা নত করিয়া সরকার সাহেব সহর্ষে কহিল : ধন্যবাদ! আমিও আপ্যায়িত হলাম। তাহলে আপনি প্রস্তুত থাকবেন, ঠিক চারটের সময় আমার 'কার' আসবে—আমরা একসঙ্গেই যাব।

সহাস্য ভঙ্গিতে সম্মতি জানাইয়া মালা সরকার সাহেবের হাতের সুন্দর তোড়াটির দিকে কটাক্ষপাত করিয়া প্রশ্ন করিল : ওটি সংগ্রহ করলেন কোথা থেকে,—নিউ মার্কেট থেকে নিশ্চয়ই?

সরকার সাহেবের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, ফুলের তোড়াটির উপর তাহার নব-পরিচিতা বান্ধবীর লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ সে সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল : গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়েছিলাম এক সাহেব বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে; তিনি এটি প্রেজেণ্ট করেছেন। এখন আপনি যদি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেন, তাহলে আমি কৃতার্থ হই।

অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সরকার সাহেব হাতের সুন্দর তোড়াটি মালার করকমলে সাহেবী কায়দায় সমর্পণ করিল এবং মালার আরক্ত মুখখানি হইতে মৃদু স্বর বাহির হইল : থ্যাঙ্কস্‌!

(৭)

বালিগঞ্জ লেকের একপ্রান্তে নির্দ্দিষ্ট নির্জ্জন স্থানটিতে ছবি তুলিবার সাজ-সরঞ্জামগুলি সাজাইয়া নরেন মালার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

গাছের তলায় বিছানো গ্রীণ রঙ্গের পুরু সতরঞ্চির উপর বেতের একখানি সুশ্রী টেবিল পড়িয়াছে, তাহার দুই দিকে সামনা সামনি দুইখানি অনুরূপ চেয়ার। নিকটে কালোরঙ্গের ঘেরাটোপ পরিয়া দামী ক্যামেরাটি অবগুণ্ঠনবতী বধূর মত দাঁড়াইয়া আছে। একটু তফাতে গাছটির গুঁড়ি ঘেঁসিয়া অল্প খানিকটা স্থান সবুজ পরদা দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে। উদ্দেশ্য, এই সুরক্ষিত স্থানটুকুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার আজিকার 'মডেল' শ্রীমতী মালা বেশ পরিবর্ত্তন ও প্রসাধন-পর্ব্ব সারিয়া লইবে। সেখানেও বেতের একটি ক্ষুদ্র টিপয় স্থান পাইয়াছে। তাহাতে সাজানো আছে ছোট একখানি আয়না, চিরুণী ব্রস এবং কয়েকটি সেফ্‌টিপিন্‌। নিকটের এক পরিচিত প্রসাধনাগার হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য এগুলি ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে। দোকানের লোকই দ্রব্যগুলি আনিয়া নরেনের নির্দ্দেশমত সাজাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার পর পুনরায় আসিয়া তুলিয়া লইয়া যাইবে।

ভবিষ্যতের চিন্তা এই তরুণ শিল্পীর স্নায়ুপুঞ্জে কোনদিন জট পাকাইবার ফুরসদ পায় নাই সত্য, কিন্তু আজ বুঝি তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ছবি তোলা হইয়া গেলে ঘণ্টাখানেক এই স্থানে বসিয়া মালার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার পরিকল্পনা একটা স্থির করিয়াই সে দোকানের ভৃত্যকে সন্ধ্যার পর সরঞ্জামগুলি লইয়া যাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছিল।

নরেনের ধারণা, দরিদ্র বলিয়া মালা তাহাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু আজ সে এই প্রগতিশীলা মেয়েটিকে দেখাইয়া দিবে যে, দরিদ্র হইলেও রুচির সহিত তাহার শিল্পী-মনের কিরূপ নিবিড়তম পরিচয় রহিয়াছে। মালার প্রকৃতি বুঝিয়াই সে এখানে এতটা আড়ম্বর করিয়া ফেলিয়াছিল। নতুবা 'লেকে' যাহারা ফটো তুলিতে আসে, এত সাজ-সরঞ্জামের কোন প্রয়োজনই হয় না এবং এগুলির অভাবে তাহাদের কোন অসুবিধাও ঘটে না।

ক্যামেরাটি যথাস্থানে রাখিয়া বেতের কেদারাখানিতে বসিয়া মালার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া আছে নরেন। সম্মুখে টেবিলের উপর আধুনিক ডিজাইনের একখানি মেঘবর্ণ রেশমী সাড়ী ও অনুরূপ ব্লাউজ ভাঁজখোলা অবস্থায় রহিয়াছে; মালা আসিয়াই সেই সাড়ী ও ব্লাউজ লইয়া স্ক্রীনের ভিতর ঢুকিবে। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে আসিলে, যে খুঁতটুকু থাকিবে, নরেন তাহা ঠিক করিয়া দিবে।

কিন্তু যাহার ছবি লইবার এবং সেই সূত্রে শিল্পী-মনের রুচিবিলাস দেখাইবার এত আয়োজন ও আকুল প্রতীক্ষা, চারটা বাজিয়া পঁচিশ মিনিট হইয়া গেল, তথাপি তাহার দেখা নাই! নরেনের দুই চক্ষু হাতের ঘড়ী ও অদূরবর্ত্তী পাকা রাস্তাটির উপর পর্য্যায়ক্রমে

ফিরিতেছিল। মটরের হর্ণ শুনিবামাত্র সে সচকিত হইয়া উঠে, কিন্তু বদ্ধদৃষ্টিতে যখন দেখে যে, মটরের গতি হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া পূর্ণগতিতেই ঢাকুরিয়ার পথে চলিয়াছে, কিম্বা মটর সহসা থামিলে, তাহার ভিতর হইতে যে বা যাহারা নামে, তাহাদের কেহই তাহার আকাঙ্ক্ষিত 'মডেল' নহে,—তখন প্রতীক্ষাশীল শিল্পীর উৎসাহ যেন শিথিল হইয়া পড়ে।

এইভাবে আরও কিছুক্ষণ কাটিল,—হাতঘড়ীর কাঁটাটি নিষ্ঠুরের মত সাড়ে চা'রের এলাকাও পার হইয়া গেল। এখন নরেনের ধৈর্য্যের বাঁধন এলাইয়া পড়িল, বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতার সুরে আপন মনেই সে কহিয়া উঠিল : এল না সে,—হোপলেশ্‌!

সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ যেন তাহার অবসন্ন হইয়া পড়িল, মাথাটি টেবিলের দিকে ঝুঁকিয়া আসিল। নানাস্থানে ছুটাছুটি করিয়া ছবি তুলিবার এই উদ্যোগ-পর্ব্বটি শেষ করিতে বেচারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আশাভঙ্গজনিত এই অবাঞ্ছিত মনস্তাপ। টেবিলের উপর ডান হাতখানি পাতিয়া, তাহার উপর অবনত মুখখানি নামাইয়া মুদিত-নেত্রে মনে মনে সে প্রশ্ন করিল—এখন কি করা যায়? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর মিলিল—দোকানদারের লোক লটবহরগুলি লইতে না আসা পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা না করিয়া উপায় নাই।

তাহার চোখ দুটি বুঝি অবসাদে একটু জড়াইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সামনের চেয়ারখানা হঠাৎ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠায় তন্দ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া গেল এবং সবেগে সোজা হইয়া বসিতেই সামনের দৃশ্যটি তাহাকে একেবারে অবাক করিয়া দিল!

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে দেখিল, টেবিলের অপর পার্শ্বে ঠিক

তাহার সম্মুখে যে চেয়ারখানি মালার জন্ত পাতা আছে, তাহা দখল করিয়া বসিয়াছে এক পাগড়ীওয়ালা তরুণ পরদেশী! বিচিত্র তাহার পরিচ্ছদ; পরণে খাঁকী হাফপ্যাণ্ট, গায়ে একটা ময়লা রঙ্গীন জামা, তাহার ছাঁটকাটও অদ্ভুত, গলাবন্ধের আকারে নীলরঙের একখণ্ড রেশমী বস্ত্র পিনৃবদ্ধ হইয়া কণ্ঠ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত আস্তৃত। মাথায় গেরুয়া রঙের এক অতিকায় পাগড়ী—তাহার প্রাচুর্য্যে আগন্তুকের মুখেরও কিয়দংশ ঢাকা পড়িয়াছে। এইরূপ বিসদৃশ পরিচ্ছদের ভিতর দিয়া এই অজাতশ্মশ্রু তরুণ আগন্তুকের স্বাস্থ্যপুষ্ট নিটোল দেহটির এমন এক অপূর্ব্ব লাবণ্য বিচ্ছুরিত হইতেছিল, যাহার বৈশিষ্ট্যময় সৌন্দর্য্য, রূপনিষ্ঠ শিল্পীকে ক্ষণকালের জন্ত তন্ময় করিয়া ফেলিল।

সে ভাব কাটিতেই নরেন রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিল: তুম কোন্ হায়?

অসঙ্কোচ কণ্ঠে আগন্তুক উত্তর দিল: মৈ ইন্সান হুঁ।

মনে মনে হিন্দী তরজমা করিতে করিতে নরেনের বিরক্তির ঝাঁঝ কমিয়া আসিল। পুনরায় প্রশ্ন করিল: তুম হামারা হিঁয়া কেঁও আয়া?

আগন্তুক কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইল না, বরং এই বাঙ্গালী ছেলেটির মুখে এই ভাবে হিন্দী শুনিয়া মুখের হাসি চাপিয়া সেও সমান স্বরে প্রশ্ন করিল: আপ য়ঁহা পূর্জা ওগৈরা লেকর কেঁও আয়ে?

তরুণ পরদেশীর এই স্পর্দ্ধিত আচরণ এবং দৃঢ়স্বরে এরূপ প্রশ্ন আপত্তিকর বুঝিয়াও তাহার বলিবার ভঙ্গি নরেনকে এরূপ মুগ্ধ করিল যে, সে তাহার উত্তর না দিয়া পারিল না; কহিল: হাম্ হিঁয়া ফটো উতারনে আয়া।

—ক্যা, আপ ফোটু উতারতে হৈঁ,—তো হমারী এক উতার দীজীয়ে ন?

দুই দফা হিন্দী কহিয়া বেচারী হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল; এবার কি উত্তর দিবে ভাবিতেছে, এমন সময় টেবিলের উপর রক্ষিত শাড়ী-ব্লাউসের উপর আগন্তুকের দৃষ্টি পড়িল, অমনি সে সাগ্রহে প্রশ্ন করিল: আরে, ইয়ে শাড়ী কিস্‌কী হৈ? শাড়ীওয়ালী কিধর গয়ী?

পরক্ষণেই সে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া একান্ত আগ্রহ সহকারে শাড়ীর উপর হাতখানি রাখিতেই নরেন খপ্ করিয়া শাড়ীখানা টানিয়া লইয়া কহিল: নেই—নেই, ইস্‌মে হাত দেও মৎ। ই শাড়ী এক লেড়কী কো ওয়াস্তে হিয়া হ্যায়, হাম উসিকে ফোটো হিঁয়া লেগা, যব সে হিয়া আ-কর এই শাড়ী পিনেগা।

চীল যেমন অতর্কিতভাবে অসতর্কের হাত হইতে ভক্ষ্য-বস্তু ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লয়, সেইভাবে সহসা শাড়ীখানা বিস্ময়াভিভূত নরেনের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া আগন্তুক তাহার বৃহৎ পাগড়ী সমেত মাথাটি নাড়িয়া কহিল: হাম পহনেঁ তো কেয়া হরজ?

শিল্পীর এবার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, দুই চক্ষু পাকাইয়া, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল: তোমার ত ভারী আস্পর্দ্ধা হ্যায়,—জবরদস্তি করনে আয়া তোম? ছোড় দেও হামারা চীজ, আবি ছোড়ো—

আগন্তুকও তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। নরেনের কথায় কিছুমাত্র ত্রস্ত না হইয়া বেশ সপ্রতিভভাবেই সে কহিল: অ জী, পহননে তো দো, হাম ওহী লেড়কী হো জাতী হৈ।—পরক্ষণেই স্ক্রীন ঘেরা স্থানটি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেই সে দিব্য মেয়েলী সুরে পরিষ্কার বাঙ্গলায়

কহিল: ওমা, গ্রীণরুমের ব্যবস্থাও রয়েছে দেখছি; তবে আর ভাবনা কি! বেশটা তাহলে ঐখানেই বদলানো যাক।

শিল্পী অবাক। এত বড় পাকড়ীধারী জবরদস্ত উর্দ্দুভাষী পরদেশীর মুখে এমন সুন্দর বাঙলা? কথাগুলিও কি চমৎকার, কেমন মধুর! তাহার মুখের রাগ মুখেই মিলাইয়া গেল, কৌতূহলের সুরে জিজ্ঞাসা করিল: তুমি বাঙলা জান?

—বাঙলা না জানলে বাঙলা বলতে পারব কেন?

—তুমি খোঁট্টা, না বাঙালী?

—এতদিন খোঁট্টাই ছিলুম, কিন্তু বাঙলাদেশে বাঙলা মায়ের কোলে এসে আজ আবার বাঙালী হ'তে সাধ হয়েছে।

—তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!

—আপনার বোধশক্তি খুব উঁচুদরের নয় বলেই আমি আপনাকে এত শীঘ্র বিশ্বাস করতে পেরেছি, আর এই জন্য নির্ভয়ে আপনার কাছেই আজ এই প্রথম ধরা দিচ্ছি। মানুষ আমি এই বয়সে অনেক দেখেছি, এক নজরেই মানুষ চেনবার যে-শক্তি ভগবান আমাকে দিয়েছেন তাতেই আমার ধারণা হয়েছে, আপনার কাছ থেকে আমার কোনও ক্ষতি হবার ভয় ত নেই, বরং উপকার প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

কথাগুলি এমন মিষ্ট ও সহজ করিয়া সে বলিল যে, নরেন বিমূঢ় না হইয়া পারিল না। অনুরূপ স্বরে নরেনও কহিল: সে ভরসা যদি তোমার থাকে, তাহলে আমাকে সন্দেহের মধ্যে না রেখে তোমার যা বলবার, স্বচ্ছন্দে জানাতে পার।

আগন্তুক বলিল: বুঝিছি, এই বিশ্রী পোষাকটি আপনার

চোখে পীড়া দিচ্ছে। আর, আমিও ব্যস্ত হয়ে উঠেছি এটা ছাড়বার জন্যে কেন জানেন—এটা হচ্ছে আবার ছদ্মবেশ।

—ছদ্মবেশ!

—হ্যাঁ, আমি একটা 'গ্যাঙে'র সংশ্রবে ছিলুম। দলের সবাই ধরা পড়েছে, আমি একাই য়্যাবস্কনডেট্ টু হাইড! সরে পড়েছি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে, বুঝতে পারছেন ত আমার অবস্থা! আমি শুধু সখের ছদ্মবেশী নই—পলাতক ছদ্মবেশী।

কি সর্ব্বনাশ! কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে একেবারে বিষধর সাপ! একে ছদ্মবেশী, তাহার উপর কিনা পলাতক—ফেরারী আসামী! কথার মধ্যে আবার ইংরাজী বুকনী ছাড়ে! কি কুক্ষণেই মালার সহিত আজ সে এনগেজমেণ্ট করিয়াছিল, তাহার জন্যই ত এই দুর্ভোগ! কিন্তু ইতিমধ্যেই ছেলেটির সুন্দর আকৃতি, কথা বলিবার ভঙ্গি, সারল্য এবং সাহস নরেনের শিল্পী-মনটিকে এরূপ অভিভূত করিয়াছে যে, তাহার মুখে শেষের সাংঘাতিক কথাগুলি শুনিয়াও সে কঠিন হইতে পারিল না, বরং মুখখানা তুলিয়া প্রশ্ন করিল: পুলিশ তা হ'লে তোমাকে ফলো করেছে বল?

দিব্য সপ্রতিভ কণ্ঠে উৎসাহের সুরে ছদ্মবেশী কহিল: নিশ্চয়ই, আমি যেমন গা ঢাকা দিয়ে নিরাপদ আশ্রয় অন্বেষণ করছি, তাঁরাও তেমনি অনুগত জনের মতন আমার অনুসরণ করছেন বৈ কি!

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এই অদ্ভুত ছদ্মবেশীর আপাদমস্তক আর একবার দেখিয়া লইয়া নরেন কহিল: অথচ তোমাকে দেখছি বিলক্ষণ নিশ্চিন্ত, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই!

ছদ্মবেশী এবার সহাস্যে উত্তর করিল: এ সব ব্যাপারে

ঘাবড়ালেই মুস্কিল, মাথা খেলিয়ে পা ফেলতে হয়। পালাবার সময় কিন্তু ঠিক এই পোষাক আমার ছিল না। তখন প'রেছিলুম দশহাতি একখানা ধুতি, এখন সেটি পাগড়ী হয়ে মাথায় উঠেছে, আর এই প্যান্ট ছিল ধুতির নিচে। এখন চিনবে হঠাৎ কে বলুন ?

—কিন্তু পুলিস যদি ফলো ক'রে এখানেই এসে পড়ে ?

—পুলিশের আশাটা আশ্চর্য্য নয় মোটেই,—কিন্তু তার আগেই এ ভোলও আমাকে বদলাতে হবে। আসন্ন বিপদের মুখ থেকে বিপন্নকে রক্ষা করবার ক্ষমতা রয়েছে এইখানেই আপনার হাতে। আপনি যে তা বুঝতে পারেন নি, এমন বোধ হয় না।

—তোমার মতলবটি বুঝতে পেরেছি! এখানে এসেই এই সব তোড়জোড় নিয়ে আমাকে দেখেই নিজের মুক্তির পথ স্থির করে ফেলেছ—পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে।

—পুলিশ আমাকে তাড়া করেছে, আর আমি তাদের লক্ষ্য থেকে নিজেকে লুকুতে ব্যগ্র, এই সংবাদটুকুর ওপর নির্ভর করে এখনই আপনি আমার বিচার করতে ব্যস্ত হবেন না যেন। কেন আমি এই অবস্থায় এসে পড়েছি—পুলিশ আমার পিছনে ছুটছে, তার পিছনের বৃত্তান্তটুকু জানবার সমস্ত কৌতূহল যদি আপনি দমন করতে পারেন, তা হলে আমাকে আশ্রয় দিন। অন্যথায় আমাকে নিষ্কৃতির অন্য উপায় দেখতে হবে।

—দেখ, কৌতূহলকে আমি বড় একটা প্রশ্রয় দিই না। আর, দুঃসাহসী বলে আমার সুখ্যাতি না থাকলেও দুঃখ বা বিপদকে খুব ভীতির চক্ষে দেখি—এমন অপবাদ আমার শত্রুরাও দেবে না। তোমার সম্বন্ধে নিজের মনেই আমি স্থির করেছি যে, তোমাকে

সাহায্য করা উচিত এবং তার জন্য ভগবান আমাকেই উপলক্ষ করেছেন। বেশ, ঐ স্ক্রীনটি তুলে ভিতরে যাও, কাপড় জামা ত আগেই গুছিয়ে নিয়েছ, তাড়াতাড়ি এখনি ড্রেসটা বদলে এসো, আমি ক্যামেরা ঠিক করছি। আমার পক্ষ থেকে তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নেই, এবং কোন প্রশ্নই আমার তরফ থেকে তোমার সম্বন্ধে উঠবে না, জেনো।

—ধন্যবাদ!

স্ক্রীনটি তুলিয়া সে ভিতরে অদৃশ্য হইল। নরেনের মনে অনেক চিন্তা উঠিয়া সংশয়ের দোলা দিতে লাগিল। একি অদ্ভুত ছেলে এতটুকু ভয়ডর ওর মনে নেই! একেবারে বেপরোয়া! কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে কে জানে। ভাল কথা—এনার্কিষ্ট নয় ত? আজকাল এই বয়সের ছেলেরাও রিভলবার লইয়া……নরেনের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, মাথা তাহার ঘুরিয়া গেল; কিয়দ্দূরে লেকের প্রকাশ্য স্থানগুলি ব্যাপিয়া যে সকল নরনারী বিচরণ করিতেছিল, তাহার মনে হইল, তাহারা যেন আর দূরে নাই, এই পরিত্যক্ত স্থানটিও যেন বহুজনে ভরিয়া গিয়াছে, আশেপাশের গাছগুলি যেন লাল পাগড়ী পরিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং লেকের সমস্ত লোক এই নির্জ্জন স্থানটিতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাহার নিগ্রহ দেখিতেছে।

—আমি ত রেডী, কিন্তু আপনি দেখছি ঠায় ঠিক তেমনি বসে!

চিন্তার জাল সহসা ছিন্ন হইতেই সচকিতে সোজা হইয়া বসিয়া নরেন যাহা দেখিল, তাহাতে সমস্ত দুশ্চিন্তা তাহার সেই মুহূর্ত্তেই লুপ্ত হইয়া গেল। একি অপূর্ব্ব মনোমোহিনী মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে! কে বলিবে কয়েক মিনিট পূর্ব্বে এই মূর্ত্তিই প্যান্ট-পাগড়ীর আবরণে

তাহাকে সমস্যায় ফেলিয়াছিল। ক্ষণকালের মধ্যেই একি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! অগ্নিশিখার মত তাহার প্রখর রূপ যেন জ্বলিতেছে, আর ফুটন্ত গোলাপের মত অপরূপ মুখখানি যেন হাসিয়া লুটাপুটি খাইতেছে। অতিশয় সুশ্রী ভুরু দুটি যেন কোন দক্ষ শিল্পী নিপুন তুলিকায় গাঢ় কালী দিয়া আঁকিয়া দিয়াছে। দীর্ঘায়ত দুই চক্ষুর প্রভাও অতুলনীয়। পরিধেয় বস্ত্রখানির অঞ্চলটি পিঠের উপর দিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে,—অমার্জ্জিত রুক্ষ কুন্তলগুলি মুখের দুই পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া আগুলফ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হাতে গাছ কয়েক সুশ্রী চুড়ি, গলায় একছড়া সরু হার দুলিতেছে। অন্য অলঙ্কারের বাহুল্য নাই। এই সাধারণ সজ্জায় কি চমৎকার তাহাকে মানাইয়াছে,—দাঁড়াইবার ভঙ্গিটুকুও কি সুন্দর!

শিল্প-বিদ্যালয়ের বার্ষিকোৎসবে ছাত্রসমাজ নাট্যাভিনয়ে ব্রতী হইলে নরেন স্বহস্তে নারী-ভূমিকার অভিনেতৃ-ছাত্রগণকে এমন নিপুনভাবে সাজাইয়া দিত যে, অপরূপ রূপসজ্জার উৎকর্ষে তাহাদিগকে নারী বলিয়া ভ্রম হইত। কিন্তু আজ এই ছদ্মবেশী বালকটিকে অল্প-সময়ের মধ্যে নিজের চেষ্টায় এমন নিখুঁতভাবে আধুনিকা তরুণী সাজিয়া বাহির হইতে দেখিয়া সে চমৎকৃত হইল।

অপর কেহ হইলে নির্নিমেষ নেত্রে দীর্ঘকাল হয়ত এই অপূর্ব্ব রূপের দিকে চাহিয়া থাকিত,—কিন্তু নরেন সত্যকারের শিল্পী, তাহার 'মডেল'টির অতুলনীয় রূপ-ভঙ্গি আদর্শ গ্রহণের এই অপ্রত্যাশিত ক্ষণটি সে পরিহার করিতে পারিল না, হঠাৎ সুপ্তিভঙ্গের মত সচকিত হইয়া ক্যামেরার দিকে ছুটিয়া গিয়া হাতের কাজ করিতে করিতে সে হাঁকিল: ঠিক অমনি দাঁড়িয়ে থাক, যেমন আছ।

নরেনের দুই চক্ষু ক্রমশঃ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—ইণ্টার ন্যাশনাল পিকচার একজিবিসানের চিত্র প্রতিযোগিতার উন্মাদনাময় বিজ্ঞপ্তির স্মৃতি তাহাকে উত্তেজিত করিয়া দিল—এই আশ্চর্য্য ছদ্মবেশীর রূপাতিশয্য, চমৎকার রূপসজ্জা এবং দাঁড়াইবার অপূর্ব্ব ভঙ্গি! মুহূর্ত্ত-মধ্যে প্রস্তুত হইয়া সে হাঁকিল: রেডী!

হাতের কাজটুকু সারা হইতেই কানে তাহার বাজিল—যুগপৎ কয়েক জোড়া জুতার মচমচ শব্দ; চক্ষু তুলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল—লাল পাগড়ীধারী দুইজন পুলিশ প্রহরী এবং টুপী পরা এক বাঙ্গালী অফিসার তাহাদের পার্শ্বেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পুলিশ সমাগমে লেকের এই পরিত্যক্ত নির্জ্জন অংশটি ক্ষণকালের মধ্যেই জনাকীর্ণ হইয়া গেল। জনতার তখন কৌতূহলের অন্ত নাই, লেকের এক প্রান্তে বালিয়াড়ির আড়ালে এভাবে তোড়জোড় পাতিয়া ফটো তোলার ব্যাপারে পুলিশ কোন নূতন রকম শিকারের সন্ধান পাইয়াছে ভাবিয়া, বহু সংখ্যক চক্ষুই সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল,—না জানি, কি চমৎপ্রদ রহস্যই এই মুহূর্ত্তে প্রকাশ পাইবে!

কাহারও মুখে কথা নাই, ছদ্মবেশীর মুখেই প্রথম কথা শোনা গেল। নরেনের দিকে চাহিয়া বিরক্তির স্বরে সে কহিল: কাজের দফা হ'ল গয়া! পরক্ষণে আঁচলটি মাথার উপর তুলিয়া দিয়া অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সে তাহার নির্দ্দিষ্ট বেতের চেয়ারটির উপর চাপিয়া বসিল। স্ক্রীনের ভিতরে প্রসাধন পর্ব্ব সারিয়া সে যখন বাহিরে আসে, মাথার পাগড়ীটি খুলিয়া ভাঁজ করিয়া আসনের মত বেতের চেয়ারখানির বসিবার স্থানে আস্তৃত করিয়াছিল,—নরেন তাহার এই কার্য্যটুকু লক্ষ্য করে নাই,

ছেলেটির নিখুঁত নারী-সজ্জার সৌন্দর্য্য তাহাকে তখন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

মহিলাটিকে সহসা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া আসন গ্রহণ করিতে দেখিয়া পুলিশ অফিসারটি আস্তে আস্তে তাহার পাশ কাটাইয়া স্ক্রীনখানি সরাইয়া ভিতরে ঢুকিলেন। নরেনের বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সে ছদ্মবেশীর পানে চাহিতেই দেখিল, তাহার উজ্জ্বল দুই চক্ষু অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া তাহারই মুখখানির উপর পড়িয়াছে। তাহাতে আতঙ্কের চিহ্নমাত্রও নাই! পরক্ষণেই বাহিরে আসিয়া পুলিশ অফিসার নরেনের দিকে চাহিয়া ভদ্রভাবে কহিলেন: কিছু মনে করবেন না। একটা তদন্ত ব্যাপারে আপনার কাজে একটু বিঘ্ন ঘটিয়ে গেলাম।

কম্পিত কণ্ঠে নরেন উত্তর দিল: ধন্যবাদ!

ছদ্মবেশী এই অবসরে তাহার অবগুণ্ঠন একটু তুলিয়া এবং সন্নিহিত জনতার উদ্দেশে কটাক্ষ করিয়া কহিল: আপনার চেয়ে বেশী অসুবিধা ঘটাচ্ছেন ওঁরাই!

সেই মুহূর্ত্তে পুলিশ অফিসার জনতার উদ্দেশ্যে রূঢ়স্বরে হাঁকিলেন: কি দেখছ তোমরা এখানে? যাও এখান থেকে সকলে…ননসেন্স!

জনতা তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইয়া গেল: জনতার ভিতর হইতে একটা ডেঁপো ছেলের ব্যঙ্গস্বর শুধু শোনা গেল; আমরা ত খেলছিলুম ও-ধারে, আপনারাই আনলেন টেনে।

এই অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নরেনকে একই ভাবে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ছদ্মবেশী মুচকি হাসিয়া প্রশ্ন

হরিল: আপনি বুঝি মনে মনে ঠিক দিয়ে রেখেছিলেন, ছাড়া পোষাক পাগড়ী আমি আপনার গ্রীণরুমেই ফেলে রেখে এসেছি?

মৃদুস্বরে নরেন কহিল: হ্যাঁ, খুবই উদ্বিগ্ন ছিলুম। কোথায় সেগুলো লুকালো?

মুখে এক ঝলক হাসি আনিয়া ছদ্মবেশী উত্তর করিল: সে পোষাক বুঝি ছেড়েছি মনে করেছেন! তারা যথাস্থানে যথাযথ ভাবেই আছে। সেগুলোর ওপরেই আপনার সাড়ী ব্লাউজ চড়িয়েছি, আর—পাগড়ীটি পাট করে এইখানে কেমন পেতে বসেছি দেখুন না! যত ভয় ছিল আমার এই ধুতিখানাকে নিয়েই; কেন না—ওরা খুঁজছে ধুতি-পরা একটি ভদ্র-ডাকাতকে!

মৃদু হাসিয়া নরেন বলিল: আমি কিন্তু হলফ করে বলতে পারি—সে ডাকাতকে ওরা কস্মিনকালেও খুঁজে পাবে না।

স্থির দৃষ্টিতে বক্তার মুখের পানে চাহিয়া ছদ্মবেশী জিজ্ঞাসা করিল: কেন বলুন ত?

নরেন বলিল: কারণ হচ্ছে বহুরূপী বিদ্যায় ডাকাতটির বাহাদুরী। ধুতি-পরা জাঁহাবাজ ছেলে খাঁকি প্যাণ্ট পরে মাথায়-পাগড়ি 'ও' হয়ে এল লেকে; এখানে আর্টিষ্ট নরেন বিশ্বাস যেন তার জন্যে সব সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী হয়ে বসেছিল। বুদ্ধির জোরে তাকে মাত ক'রে আর এক দফা ভোল বদলে, সেই—বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে—গোছের হ'য়ে সব ঢেকে দিল। ওদিক দিয়ে এখন আর কোন ভয় নেই।

—কোন্ দিক দিয়ে ভয় আছে মনে করেন?

—কথামালার এক চক্ষু হরিণের গল্প পড়নি? যেদিকে তার চক্ষু

পড়ে নি, সেইদিক থেকেই বিপদ এসেছিল। আমার ভাবনা হচ্ছে—প্যাণ্ট পরে আর মাথায়-পাগড়ী 'ও' হয়ে ছেলেটি যখন আসে, কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি। কিন্তু এখন পুলিশের দয়াতে জানাজানি হয়ে গেছে—একটি আপ-টু-ডেট মেয়ে এখানে ফটো তোলাতে এসেছে। আবার ঘণ্টাখানেক পরে এই সব ভাড়া করা সাজ-সরঞ্জাম মায়—ঐ সাড়ী ব্লাউস পর্য্যন্ত নিতে যখন লোক আসবে—তখন আমাদের অবস্থা কি হবে?

নরেনের কথায় ছদ্মবেশীর মুখে আশঙ্কার কোন রেখাই ফুটিতে দেখা গেল না, বরং মুখখানা হাসিতে ভরাইয়া সে কহিল: এরই আশঙ্কা করছেন আপনি? আমার মনে কিন্তু এর চেয়েও বড় রকমের একটা আশঙ্কার কথা উঠেছিল।

অবাক হইয়া নরেন জিজ্ঞাসা করিল: সেটা কি?

—যে মেয়েটির ফটো তুলবেন ব'লে এত ঘটা করে সাজ-সরঞ্জাম মায় সাড়ী ব্লাউজ পর্য্যন্ত সাজিয়ে রেখেছিলেন—তিনি যদি এসে পড়েন, আর এই নতুন চীজটিকে দেখে কৈফিয়ৎ চান।—কথাগুলি এক নিশ্বাসে শেষ করিয়াই সে শিল্পীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

তাহার এই সন্দিগ্ধ স্বর নরেনকে যেন সহসা সঙ্কুচিত করিয়া দিল। সে বুঝিল, ছেলেটি সব দিক দিয়াই অসাধারণ। সংলাপের মধ্যে এক সময় অসতর্ক মুহূর্ত্তে এখানকার উদ্যোগ-পর্ব্বের পূর্ব্বাভাসটুকু অতি সংক্ষেপেই তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই অদ্ভুত ছেলেটি যে সঙ্গে সঙ্গেই সেটি মনের মধ্যে টুকিয়া লইয়াছে, তাহা নরেন ভাবে নাই। তাহার এই আশঙ্কাটিও যে অমূলক নয়, এবং ইতিমধ্যে মালা এখানে আসিয়া পড়িলে একটা বিশ্রী পরিস্থিতির যে

উদ্ভব হইত, নরেনের চিত্ত তাহাতে সায় না দিয়া পারিল না। কিন্তু সে সম্ভাবনা যে আর নাই—মালার আসিবার সময় অনেক আগেই অতিবাহিত হইয়াছে, এই ধারণাই দৃঢ় হইয়া তাহাকে নিশ্চিন্ত করিল, এবং সেও দৃঢ়স্বরে জানাইয়া দিল: না, সেজন্যে আমি কিছুমাত্র শঙ্কিত নই। সে এলেও ধন্যবাদ দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ত।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া ছদ্মবেশী প্রশ্ন করিল: পারতেন তাঁকে ফেরাতে? বলুন না—সত্যিই পারতেন? এখনও যদি আসেন—ফিরিয়ে দিতে পারবেন আপনি?

নরেনের মনের প্রচ্ছন্ন বিক্ষোভ এবার স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিল, কঠিন কণ্ঠে এবার তাহাকে বলিতে হইল: কেন পারব না? তার সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছিল, ঠিক চারটের সময় এখানে এসে সেটিং দেবে। তার জন্যে আমি টাকা পর্য্যন্ত আগাম দিয়েছি। সে যদি চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে, আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না কেন?

মৃদু হাসিয়া ছদ্মবেশী উত্তর করিল: এইটুকু সময়ের মধ্যে আপনার মনের যে পরিচয়টুকু পেয়েছি, তাতে জোর করে বলতে পারি—আপনি কখন অত কঠিন হতে পারেন না। থাক্ গে, এ আশঙ্কা যখন আপনার মনে আমল পেল না, আপনার আশঙ্কাকেও আমি আমল দেব না।

রহস্যভরে নরেন কহিল: আমার আশঙ্কাকে আমল না দেওয়ার সোজা মানে হচ্ছে তাকে এড়িয়ে যাওয়া; অর্থাৎ, জিনিসগুলোর মালিক আসবার আগেই তাদের শাড়ী-ব্লাউস পরা অবস্থাতেই সরে পড়া—এই ত?

মুখের হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইয়া ছদ্মবেশী উত্তর দিল: নিষ্কৃতির পক্ষে এটা খুব সহজ উপায়ই ছিল, কিন্তু তাহলে যে আপনাকে

বিপাকে ফেলা হয়। এত বড় বেইমানীর কাজ ত আমার ধাতে পোষাবে না, বিশ্বাস মশাই!

বিশ্বাস মশাই! সর্ব্বনাশ, তাহার পদবীর সন্ধান কি করিয়া এ ছোকরা পাইল? বিস্ময়ের সুরে নরেন প্রশ্ন করিল: আমার পদবী যে বিশ্বাস, কি করে তুমি জানলে?

আবার সেই অপূর্ব্ব হাসির আলো ফুটাইয়া ছদ্মবেশী কহিল: কেন, একটু আগেই ত কথার মধ্যে নিজেই ওটা আপনি শুনিয়াছেন, এমন কি নাম পর্য্যন্ত; ভেবে দেখুন বরং।

বিস্ময়ে নরেন স্তব্ধভাবে এই অদ্ভুত মূর্ত্তিটির পানে চাহিয়া রহিল।

ছদ্মবেশী অপাঙ্গে তাহা লক্ষ্য করিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিল: এমনি আমার ধাতু যে, চোখে যা পড়ে, কিম্বা কানে যা ঢোকে, আপনার ঐ কলটির মত আমার মনের ক্যামেরায় হুবহু ছকে ওঠে। আমার এই বয়সে—সজ্ঞান অবস্থা থেকে অন্ততঃ এগারো বছরের এত সব ঘটনার ছবি এইখানে জমা হয়ে আছে যে গুণে শেষ করা যায় না—ইচ্ছা করে আপনাকে দিয়ে সে গুলো আঁকাই। ও-মা, কথায় কথায় আসল কথাটাই ভুলে গেছি। আচ্ছা বলুন ত, যে দোকান থেকে এই সাড়ী-ব্লাউস এনেছেন, তাঁরা কি শুধু ভাড়াই দেন—বিক্রী করেন না?

নরেন বলিল: কেন করবেন না? এ দুটো জিনিস দেবার সময় বিক্রীর কথাও তাঁরা তুলেছিলেন। বলছিলেন যে, 'মাড়ি' লাগানো মাল অনেকদিন পড়ে থাকায় দু-এক জায়গায় একটু একটু ফেন্ট হয়ে গেছে। যিনি পরবেন, যদি পছন্দ তাঁর হয়, আসল দাম থেকে দশ টাকা কমিয়ে বেচতে পারেন।

—এর আসল দাম কত ওঁরা বলেছেন ?

—পঞ্চাশ টাকা, শাড়ী আর ব্লাউস দুটোয় কিন্তু চল্লিশ টাকায় বেচতে চান।

—তাহলে চল্লিশটি টাকা দিতে পারলে এ দুটো আর ফেরৎ দেবার হাঙ্গামা থাকে না, এই ত ?

—হ্যাঁ। কিন্তু এসব কথা কেন ?

হাসিমুখে ছদ্মবেশী কহিল : আপনার আশঙ্কাটুকু ভেঙ্গে দেবার জন্য। তাহলে আমাকে আর একবার আপনার ঐ স্ক্রীন-ঘেরা গ্রীন রুমটির ভিতরে সেধুঁতে হবে। কারণ, শাড়ীর নিচে যে প্যাণ্টটি সায়ার মত পরে আছি, তার পকেটে খান কতক নোট আছে। এখন ভাবছি, ভাগ্যিস ও গুলোকে সঙ্গ ছাড়া করিনি·········

এই সময় একটা দমকা বাতাসে ছদ্মবেশীর মাথার কতকগুলি চূর্ণ-কুন্তল মুখমণ্ডলে পড়িয়া তাহার মুখের কথা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সুডোল হাতখানি তুলিয়া চুলগুলি সরাইবার কৌশলটুকু শিল্পীর দৃষ্টিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করিয়া দিল যাহা কোন পুরুষের পক্ষে সুলভ নহে। সঙ্গে সঙ্গে সে অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল : এ কি হ'ল !—ও-রকম চুল তোমার মাথায় কি করে এল ?

হাসিমুখেই ছদ্মবেশী বলিল : চুলে হাত পড়তেই বুঝি চুলগুলি এতক্ষণে নজরে পড়ল ? কিন্তু চুল ত আমার সঙ্গেই ছিল।

কণ্ঠে জোর দিয়া নরেন কহিল : কিন্তু ও ত পরচুল নয়—দিব্যি মাথা থেকে গজিয়েছে দেখছি।

—ঠিকই দেখেছেন। কিন্তু পরচুলের কথা তুললেন কেন বলুন ত ?

—তুমিই ত বললে সঙ্গে ছিল।

—তাতে কি বুঝালো যে চুলগুলো আমি পুঁটুলি বেঁধে সঙ্গে এনেছিলুম! সঙ্গে ছিল মানে—যথাস্থানে অর্থাৎ মাথায় ছিল—পাগড়ীর ভিতরে।

—পুরুষ মানুষের এত লম্বা চুল হয়?

—কেন হবে না? প্রথম সাক্ষী ত আমি—সামনেই বসে আছি। আরও দু চারটে নমুনা দেখাতে পারি। তা-ছাড়া খবরের কাগজে 'চুল-বনাম-চোরে'র খবর পড়েন নি?

—চুল-বনাম-চোর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! ভারি মজার খবর। এক ভদ্রলোক সখ করে মাথায় মেয়েদের মতন লম্বা চুল রেখেছিলেন বলে স্ত্রী প্রায়ই খোঁটা দিতেন। এখন হয়েছে কি, রাত্তিরে স্বামি-স্ত্রী খাটে শুয়ে পাশাপাশি ঘুমুচ্ছেন, এমন সময় সিঁদ কেটে ঘরে চোর ঢুকে স্ত্রীর গলা থেকে সোণার দামী হার ছড়াটি খুলে নেবার জন্যে চুপি চুপি মাথার কাছে এসে বসে। ভদ্রলোক মাথার চুল এলিয়ে শুতেন। চোর সেই চুল স্ত্রীলোকের চুল মনে করে তারই ওপর হাত চালিয়ে গলার হার খুঁজতেই স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাঁর চীৎকারে চোরও ধরা পড়ে। আদালতে বেচারা চোর স্পষ্টই বলে—কে জানত, পুরুষ মানুষ অমন লম্বা চুল রাখে. চুলের জন্যেই আমি ধরা পড়ে গেলুম।—এর পরও কি আপনি বলবেন, লম্বা চুল শুধু মেয়েদেরই এক চেটে?

এই সরস প্রসঙ্গ শুনিয়া শিল্পীর মুখেও হাসির রেখা ফুটিল। মৃদু হাসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল: আর গয়না—এগুলো কোথা থেকে এল?

ছদ্মবেশী অসঙ্কোচেই কথাটির উত্তর দিল: এগুলো অবশ্য অঙ্গ থেকেই গজায় নি, সঙ্গেই ছিল। অর্থাৎ শাড়ী যখন মাথায় ওঠে

(প)াগড়ী হয়ে, ঝুটো গয়না গুলো তখন প্যাণ্টের পকেটেই সেঁধিয়ে-ছিল। সন্দেহ আপনার কাটল, না আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবেন?

গম্ভীর মুখে নরেন কহিল: আমি এখন হাঁপিয়ে উঠেছি, আর কিছু জানতে চাই না, ইচ্ছাও নেই। এখন তোমার কি ইচ্ছা তাই বল।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ছদ্মবেশী কহিল: আমার কি ইচ্ছা সেটা বলবার আগে আপনার কাছ থেকে এই কথাটি শুধু জানতে চাই—আমার অতীত সম্বন্ধে কোন কৌতূহল কি আপনার মনে উঠছে না?

দৃঢ়স্বরে নরেন উত্তর দিল: না। তোমার অতীতকে চাপা দিয়ে বর্ত্তমানকে নিষ্কণ্টক করাই আমার অভিপ্রায়। অর্থাৎ, আজকের সঙ্কট মুহূর্ত্তে রক্ষকের যে দায়িত্ব বাধ্য হয়েই নিতে হয়েছে আমাকে, শেষ পর্যন্ত তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বীকার করতে আমার পক্ষ থেকে কিছু মাত্র দ্বিধা উঠবে না। অবশ্য তোমাকেও পিছনের পদচিহ্ণগুলো সব মুছে ফেলতে হবে।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ছদ্মবেশী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর বেতের টেবিল খানির পাশ কাটাইয়া একেবারে নরেনের পাশে আসিয়া স্বরে জোর দিয়া বলিয়া উঠিল: এত বড় কথার পর আর ত ধরা না দিয়ে থাকা যায় না বিশ্বাস মশাই। বেশ, এখন একবার শিল্পীর দৃষ্টিতে ভাল করে আমাকে দেখুন ত, দেখে কি মনে হয় সেটাও বলুন। অতীতটা আপনার কাছে চেপে রাখলেও বর্ত্তমানের সম্বন্ধে এভাবে আপনাকে আড়ালে রাখতে আমার প্রাণ সত্যি হাঁপিয়ে উঠছে।

কথাগুলি বলিতে বলিতে এমন অপরূপ ভঙ্গিতে গ্রীবাটি তুলিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কমনীয় দেহটি লীলায়িত করিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে সস্মিতাননে সে দাঁড়াইল যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে বুঝি দক্ষ ভাস্কর-শিল্পীর নির্ম্মিত এক অপূর্ব্ব মর্ম্মরমূর্ত্তি। মন্ত্রমুগ্ধবৎ নরেন সম্মুখের সেই অপরূপ মূর্ত্তির পানে কিছুক্ষণ বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল। যে সন্দেহের চাঞ্চল্য তাহার রুদ্ধ অন্তরদ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত দিতেছিল, তাহাই কি নির্ঘাত বাস্তব হইয়া তাহাকে হতবুদ্ধি করিয়া দিল! আশ্চর্য্য, তাহার শিল্পী-সুলভ দৃষ্টির আবেদনকে এতক্ষণ সে কোন্ যুক্তিতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল? মনের যে দুর্ব্বলতা এখন লজ্জার রূপ ধরিয়া তাহাকে পীড়া দিতেছে, তাহাকে লুকাইয়া রাখিবার স্থান কি কোথাও সে খুঁজিয়া পাইবে?

সুপ্তোত্থিতের মত সোজা হইয়া বসিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে লজ্জা-বিজড়িত স্বরে নরেন বলিল: মনের সন্দেহ যদি আগেই জোর করে প্রকাশ করতুম, তাহলে আপনি এভাবে নিজেকে প্রকাশ করে আমাকে লজ্জা দিতে পারতেন না। বসুন আপনি।

লীলায়িত ভঙ্গিতেই ছদ্মবেশী তাহার চেয়ারখানিতে বসিল এবং পরক্ষণে মুখখানি তুলিয়া কহিল: আপনার এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই, আমার সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টিতে যে সন্দেহ ফুটে উঠেছিল, সেটা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু বলুন ত, সম্বোধনটাকে হঠাৎ উত্তম পুরুষে তুললেন কেন? পরিবর্ত্তন যে-দিক দিয়েই হোক, বয়সের দিক দিয়ে ত কিছু বদলায় নি! তবে?

নরেন ঘামিয়া উঠিয়াছিল, পকেট হইতে রুমালখানি বাহির করিয়া মুখের ঘাম মুছিয়া উত্তর দিল: আপনি ত অনেক কিছুই জানেন, তাহলে একথাও স্বীকার করবেন নিশ্চয়—সতেরো আঠারো বছরের কোন ছেলেকে আমরা যে চোখে দেখতে অভ্যস্ত, সেই বয়সের কোন মহিলা আমাদের সংশ্রবে এলে অনেকখানি বেশী সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে আমাদের শিক্ষিত মন যেন বাধ্য এবং দেখেও থাকি। সুতরাং লজ্জা পাওয়াটা আমার পক্ষে স্বাভাবিক।